# إدارة التوحش

# The Management of Savagery

## নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা

সবচেয়ে কঠিন ও বিপজ্জনক এক পরিস্থিতি , যা উম্মাহর উপর দিয়ে অতিবাহিত হবে

শাইখ আবু বকর নাজী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

# মুখবন্ধ

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এবং তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবীদের প্রতি এবং কেয়ামত পর্যন্ত ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে যারাই তাঁর অনুসরণ করবেন তাঁদের সবার প্রতি , বিশেষ করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার মহান লক্ষ্যে নিজের জান -মালসহ সব কিছু উৎসর্গকারী মুজাহিদীনের প্রতি।

একবিংশ শতাব্দীর গ্লোবাল জিহাদের তাত্ত্বিক ও অপারেশনাল কাঠামোর পিছনে এ যাবৎ কালে যত বই বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে দুটির অবদান অনস্বীকার্য , যার একটি - শাইখ আবু মুস 'আব আস সুরী (রাহি .) রচিত ১৬০০ পৃষ্ঠার ‘দাওয়াতুল মুকাওয়ামা বা (The Golobal Islamic Resistance Call)’ এবং অপরটি শাইখ নাজী (রাহি .) বিরচিত বক্ষ্যমাণ এই গ্রন্থ - إدارة التوحش অর্থাৎ ' নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা ' বা The Management of Savagery (দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ স্যাভেজারী ) যা কুফফার বিশ্বও নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে ও মানে। বলাই বাহুল্য বই দুটি চাক্ষুস জিহাদের ময়দান থেকে উঠে আসা হীরকতুল্য সব অভিজ্ঞতার আলোকে গ্লোবাল জিহাদের স্ট্রাটেজি (strategy) ও দিকনির্দেশনা (Directives) সম্বলিত অনবদ্য দুটি অবশ্য পাঠ্য।

শাইখ আবু বকর নাজী (রাহি )'র এই বইটি উচ্চ মানের আরবিতে লিখিত ১১২ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থকর্ম , যা ২০০৪ সালে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি ও নিউইয়র্কের ওয়েস্ট পয়েন্ট এর আমেরিকান মিলিটারি একাডেমীর The Combating Terrorism Center (CTC) এর তত্ত্বাবধানে উইলিয়াম ম্যাককান্টস কর্তৃক ইংলিশে অনুবাদ করা হয়। তারা হয়ত জিহাদকে বুঝতে ও হত্যা করতেই এই অনুবাদ করেছিল আল্লাহু আলাম , পক্ষান্তরে যা অন্য ভাষাভাষীদের মাঝে জিহাদকে ছড়িয়ে দিতেই সাহায্য করেছে - সুবহানাল্লাহ ! যা হোক, কিছুটা অতৃপ্তি নিয়ে হলেও আম বাংলা ভাষাভাষী মুজাহিদদের নিকট সে ইংলিশটিই অনেকদিন যাবত পঠন-পাঠন হয়ে আসছিল। সরাসরি আরবি থেকে বাংলা করে ও তাহকীক করে বিস্তৃত আঙ্গিকে পাঠ দান এর সুযোগ হয়ে উঠিছিল না - নানান কারণেই। তদুপরি অনুবাদকর্মটি করতে কেবল আধুনিক আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য থাকাই যথেষ্ট ছিল না বরং গ্লোবাল জিহাদ , জিহাদের মানহাজ , শরীয়া , সিয়াসাত (ইসলামী রাজনীতি ) ও সামরিক জ্ঞানের উপরও যুগপৎ জ্ঞান থাকা জরুরী ছিল অথবা আলাদা আলাদা এসকল জ্ঞান ওয়ালা কয়েকটি মাথা একত্রে বসে কাজ করা জরুরী ছিল। এদিকে উচ্চমানের আধুনিক আরবি থেকে অনুদিত হওয়ায় ইংলিশ অনুবাদটিও তেমন সহজপাঠ্য হয়নি , যার ফলে গ্লোবাল জিহাদ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী বাংলা ভাষা -ভাষী ভাই -বোনদের নিকট এর একটি সঠিক ও সহজবোধ্য বাংলা সংস্করণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পরে , বা বলা যায় অনুবাদ হতে যত বিলম্ব হয়েছে আম ভাবে বাংলাভাষী উম্মাহ 'র ক্ষতি যেন ততই বেড়ে গিয়েছে।

২০১৩-১৪ সালের দিকে আমাদের কয়েকজন ভাই বইটির ইংরেজি সংস্করণ থেকে ‘অরাজকতা ব্যবস্থাপনা ’ নামে সর্বপ্রথম এর একটি বাংলা সংস্করণ উপহার দেন। আলহামদুলিল্লাহ সেখানে মূল বইয়ের শেষের সাতটি প্রবন্ধ ছাড়া পুরো বইয়ের অনুবাদ এসে যায়। এটিকে বলা যায় বইটির বাংলা ১ম সংস্করণ। আলহামদুলিল্লাহ , শূন্য ঘরের আঁধার বাতির মত এটি মোটামুটি বেশ কাজ চালিয়ে নেয়ার মত হয়েছিল , তবে অনুবাদ ততটা সহজ ও সাবলীল না হওয়ায় পূর্বের মতই অভিজ্ঞ কোন ভাইয়ের দরসে বসে বোঝা ছাড়া সাধারণ ভাইদের জন্য নিজে নিজে পড়ে বোঝার ক্ষেত্রে তখনো এটি বেশ অধোরাই রয়ে যায়। অর্থাৎ , ঝরঝরে, সহজ ও নিজে নিজে পড়ে বোঝার মত একটি বাংলা অনুবাদের তৃষ্ণা তখনো অনুভূত হতে থাকে।

এ প্রয়োজন মিটানোর জন্য ২০১৮ সালে পরিচালিত একটি দাওরায় অংশগ্রহণকারী কিছু ভাই দাওরা পরিচালনাকারী মাসউল ভাইয়ের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে বইটির নতুন আরেকটি

বাংলা সংস্করণ আমাদেরকে উপহার দেন। যদিও পুরো বইয়ের অনুবাদ সম্পন্ন ছিল না। এটি ছিল বইটির বাংলা ২য় সংস্করণ । এ সংস্করণটি প্রথমটির তুলনায় কিছুটা সুখপাঠ্য হয়েছিল ঠিকই তবে যেহেতু এটিও বইটির মূল ভাষা আরবি থেকে অনূদিত হয়নি তাই এর কোন কোন জায়গায় অস্পষ্টতা থেকেই যায়। তাছাড়া পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে কোন কোন ক্ষেত্রে অনুবাদক ভাইদেরকে কথা বেশ দীর্ঘ করতে হয়, কোথাও আবার একাধিক বন্ধনীর মাধ্যমে ব্যাখ্যা মূলক শব্দ বা বাক্যাংশও আনতে হয়, যা মূল আরবি থেকে অনুবাদ করা হলে হয়তো প্রয়োজন পড়ত না - আল্লাহু আলাম। যার ফলে কাঙ্ক্ষিত সেই বাংলার তৃষ্ণা শেষ 'হইতে নিয়াও হয়নি শেষ' ...

অবশেষে ২০১৯ সালে পরিচালিত একটি দাওরায় আমাদের কয়েকজন আলেম ভাইয়ের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ কাজটি সম্পন্ন করান আলহামদুলিল্লাহ। এ সময় মূল আরবি থেকে পুরো বইটির অনুবাদ সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে এ কাজটিকে আল কায়েদা ইন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট-বাংলাদেশ শাখার (AQIS–BD) ফিকরি সেলের (গবেষণা শাখার) কাজের আওতায় এনে ভাষা, শরীয়া, সিয়াসাত, ভূ-রাজনীতি ও সামরিক জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন বেশ কয়েকজন ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে আরও পরিমার্জিত ও পরিশীলিত করে প্রকাশ করার প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়। আলহামদুলিল্লাহ এটিই এখন আপনাদের খেদমতে পেশ করছি। এটিকে বইটির বাংলা ৩য় সংস্করণ বলা যায়।

৩য় সংস্করণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আলেম ভাইদের কয়েকটি কথা নিম্নে উল্লেখ করছি,

''এটি যেহেতু গ্লোবাল জিহাদের স্ট্রাটেজি বোঝার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ, তাই অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা গ্রন্থটির মূল ভাব ধরে রাখার জন্য (মূল) আরবির সাথে মিল রক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। এ কারণে কোথাও যদি পাঠকের কাছে এর ভাষাগত সৌন্দর্য খানিকটা ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় বা বিষয়বস্তু বোঝার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা অনুভূত হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট জায়গার মূল আরবিটি একটু দেখে নেয়ার অনুরোধ থাকবে।

মূল বইয়ে কোনো কোনো আলোচনা বেশ দীর্ঘ, পুরো এক পৃষ্ঠা, কোথাও বা দেড়-দু পৃষ্ঠা ব্যাপী। এসকল জায়গায় আলোচনাকে সহজবোধ্য করার জন্য সম্পাদনা পর্ষদ কর্তৃক ছোট ছোট শিরোনাম দেয়া হয়েছে এবং এ জাতীয় শিরোনামগুলোকে মূল লেখকের দেয়া শিরোনামগুলো থেকে আলাদা করার জন্য তৃতীয় বন্ধনী [-] দিয়ে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে।

পাঠক যেন প্রথম নজরেই গ্রন্থটির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন এবং এর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুক্তাগুলো খুব সহজেই কুড়িয়ে নিতে পারেন এ উদ্দেশ্যে মূল বইয়ের শেষে পুরো বইয়ে আলোচিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর একটি বিস্তারিত সূচীপত্র সংযোজন করা হয়েছে (যা মূল আরবি বইয়ে ছিল না)। সূচীপত্রটি দেখলে যে কোন পাঠক বইটি সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা লাভ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ''।

- মাশাআল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, ভাইরা কত উত্তম পন্থায়ই না তাদের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন!

বইটিতে গ্লোবাল জিহাদের প্রেক্ষাপটে সীসাঢালা প্রাচীরের মত এক উম্মাহ কিভাবে বিশ্বব্যাপী তিন ধাপের জিহাদী গেরিলা যুদ্ধ কৌশল প্রয়োগ করে সাপের মাথা আমেরিকা

ও এর দোসর সরকারদের শক্তিকে ক্রমাগত নিঃশেষ করে খিলাফাহ আলা মিনহাজুন নুবুয়াহ 'র দিকে এগিয়ে যেতে পারে তারই নীল নকশা প্রণীত হয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এসংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী বাংলা ভাষাভাষী ভাই -বোনদের হাতে এই অমূল্য গ্রন্থটির একটি সহজ ও সঠিকতম বাংলা সংস্করণ তুলে দেওয়ার। বইটিকে নির্ভুল ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করতে আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি , তারপরও আমরা যেহেতু মানুষ তাই কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। সুহৃদ পাঠকের এমন কিছু নজরে এলে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দেয়ার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

পরিশেষে , ফরিয়াদ , আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমাদের এ ক্ষুদ্র খেদমতটি কবুল করে নেন, 'খিলাফাহ আলা মিনহাজুন নুবুয়াহ ' কে বুলন্দ করে দেন এবং মূল্যবান এ গ্রন্থটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ভাইকে তাদের কাঙ্ক্ষিত শহীদি মৃত্যু পর্যন্ত সীরাতে মুস্তাকীমের ওপর অবিচল রাখেন। আমীন।

ওয়া আখিরু দা 'ওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

/

ফিকরি সেল (Fikri Cell)

আল কায়েদা ইন ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট - বাংলাদেশ শাখা (AQIS-BD)

মূল সূচীপত্র

[তৃতীয় বন্ধনীস্থঃ শব্দ বা বাক্যাংশ ও ছোট ছোট শিরোনাম সমূহ অনুবাদক বা সম্পাদনা পর্ষদ কর্তৃক সংযোজিত ]

সূচনা (প্রেক্ষাপট)

প্রাথমিক কিছু কথাঃ

‘সাইকস-পিকট’ এর যুগ থেকে বিশ্ব যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে

অতীকল্পিত ক্ষমতাঃ বল্গাহীন সামরিক শক্তি ও ভয়ঙ্কর মিথ্যা [মিডিয়া] প্রচারণাকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাধর হয়ে ওঠা পরাশক্তি

১ম অধ্যায়ঃ নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা ও ইতিহাস থেকে তার উদাহরণ

২য় অধ্যায়ঃ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপায়

৩য় অধ্যায়ঃ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ও পলিসি, যা অনুসরণ করলে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সহজ হয় এবং [আল্লাহর ইচ্ছায়] সাধারণভাবে ‘তটস্থঃকরণ ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ পর্বের লক্ষ্যগুলো পূরণের পাশাপাশি বিশেষভাবে ‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা’ পর্বের লক্ষ্যগুলোও পূরণ হয়

১ম পরিচ্ছেদঃ নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনায় প্রভূত দক্ষতা অর্জন

২য় পরিচ্ছেদঃ কে নেতৃত্ব দিবেন? কে ব্যবস্থাপনা করবেন? এবং কে প্রশাসনিক মৌলিক সিদ্ধান্তগুলো অনুমোদন করবেন?

৩য় পরিচ্ছেদঃ পরিক্ষীত ও সফল প্রমাণিত সামরিক কৌশলসমূহের ব্যবহার।

৪র্থ পরিচ্ছেদঃ কঠোরতার ও নির্মমতার যথাযথ ব্যবহার

৫ম পরিচ্ছেদঃ ক্ষমতা অর্জন

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ শত্রু ও তাদের সহগামীদের রাজনৈতিক চাল সঠিক ভাবে বোঝা এবং শরিয়া রাজনীতি (সিয়াসত) অনুসারে সেগুলো মোকাবেলার পদক্ষেপ নেয়া

৭ম পরিচ্ছেদঃ মেরুকরণ

৮ম পরিচ্ছেদঃ সম্বন্ধ স্থাপন ও রক্ষা-না-রক্ষার মূলনীতি (Rules of Affiliation)

৯ম পরিচ্ছেদঃ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণঃ নজরদারী করা, অনুপ্রবেশ বা গুপ্তচরবৃত্তি করা ও এ সংক্রান্ত সমস্যা এবং শত্রুপক্ষের গুপ্তচর থেকে বেঁচে থাকা

১০ম পরিচ্ছেদঃ আন্দোলন পরিস্থিতির মাঝেও সঠিক জ্ঞানচর্চা ও দীক্ষা অব্যাহত রাখাতে হবে, যেমনটা ছিল ইসলামের প্রথম যুগে

৪র্থ অধ্যায়ঃ খুবই জটিল কিছু সমস্যা ও বাধা, যার সম্মুখীন আমরা হবো এবং সেগুলো থেকে উত্তরণের উপায়ঃ

১ম সমস্যঃ সত্যিকার মুমিনদের (মুজাহিদদের) সংখ্যা ক্রমশ কমে যাওয়া

২য় সমস্যঃ ব্যবস্থাপনা কর্মে নিয়োজিত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের স্বল্পতা

৩য় সমস্যাঃ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সদস্যদের পূর্ব সম্পর্ক, বিশেষকরে ভিন্ন ধারার ইসলামী দলগুলোর সাথে থাকা পূর্ব সম্পর্ক

৪র্থ সমস্যাঃ অনুপ্রবেশ ও গুপ্তচরবৃত্তি

৫ম সমস্যাঃ কিছু সদস্য বা কিছু গ্রুপ কিংবা সম্পূর্ণ একটি অঞ্চল আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে জিহাদী তানজিমকে পরিত্যাগ করা বা এর বিরুদ্ধে বিপ্লব করা। (আমরা কিভাবে বিষয়টি বুঝবো এবং তা মোকাবেলা করবো?)

৬ষ্ঠ সমস্যাঃ মাত্রাতিরিক্ত জোশ ও এর সাথে জড়িত সমস্যাবলী (যেমন: অতি উৎসাহী হয়ে তড়িঘড়ি করে অপারেশন চালানো বা বোকামী করা বা সীমালঙ্ঘন করা)

উপসংহারঃ

৫ম অধ্যায়ঃ গুরুত্বপূর্ণ প্রাসংগিক কিছু প্রবন্ধ

১ম প্রবন্ধঃ ধৈর্য্যের লড়াই

২য় প্রবন্ধঃ দাওয়ার ক্ষেত্রে মানব মনের চাওয়া বনাম আল্লাহর নীতি

৩য় প্রবন্ধঃ যুদ্ধের অগ্নি পরীক্ষায় মুখোমুখি দু‘পক্ষ

৪র্থ প্রবন্ধঃ ‘প্রকৃতির স্বাভাবিক নীতি’ যা মুমিন, কাফের উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য

৫ম প্রবন্ধঃ আমাদের পথ পুরো বিশ্ববাসীর জন্য রহমত

৬ষ্ঠ প্রবন্ধঃ পরিভাষার ফিতনা- ‘কল্যাণ বা অকল্যাণ’ পরিভাষার ফেতনার একটি নমুনা

৭ম প্রবন্ধঃ সম্পদের মাধ্যমে মেরুকরণ

বিস্তারিত সূচীপত্র

(অনুবাদক ও সম্পাদনা পর্ষদ কর্তৃক সংযুক্ত)

সূচনা (প্রেক্ষাপট) ৪

সাহওয়া সালাফী ধারা ৪

মুসলিম ব্রাদারহুড বা ইখওয়ানের ধারা ৫

জিহাদী সালাফী ধারা ৫

তুরাবির ইখওয়ানের ধারা ৫

জাতীয়তাবাদী জিহাদী ধারা ৬

প্রাথমিক কিছু কথাঃ

‘সাইকস-পিকট’ এর যুগ থেকে বিশ্ব যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে ৭

শক্তি বা ক্ষমতার দুটি ধরণ ৮

জনগণের শক্তি ৯

প্রতিরক্ষা বাহিনীর শক্তি ৯

অতীকল্পিত ক্ষমতাঃ বল্গাহীন সামরিক শক্তি ও ভয়ঙ্কর মিথ্যা [মিডিয়া] প্রচারণাকে
কেন্দ্র করে ক্ষমতাধর হয়ে ওঠা পরাশক্তি

সামাজিক সৌহার্দ্য ১১

আল্লাহর অলংঘনীয় ফায়সালা ১১

আফগান যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ১২

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.র ভবিষ্যদ্বাণী ১২

রাশিয়া থেকে আমেরিকা ১৩

দুটি কারণে আমেরিকাকে পরাজিত করা আরও সহজ ১৪

সারকথা ১৪

যে সব লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমেরিকার বিরুদ্ধে অপারেশন চালাতে হবে ১৪

১ম অধ্যায়ঃ নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা ও ইতিহাস থেকে তার উদাহরণ ১৫

‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা’ মিশনের কাঙ্খিত আদর্শ রূপরেখা ১৬

নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক কিছু উদাহরণ ১৭

সাইয়িদ আহমদ শহীদ রহ.র আন্দোলন ১৯

কুফফার কর্তৃক নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা ১৯

নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার সমসাময়িক কিছু উদাহরণ ২০

অনৈসলামিক সংগঠনের নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার সমসাময়িক কিছু উদাহরণ ২০

২য় অধ্যায়ঃ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপায় ২১

অগ্রগণ্য রাষ্ট্রসমূহের ধাপ ২১

অবশিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের ধাপ ২১

অগ্রগণ্য হিসাবে চিহ্নিত রাষ্ট্রসমূহ ২২

জরুরী জ্ঞাতব্য: অঞ্চল বলে কোথায় কি উদ্দেশ্য? ২২

দেশ বাছাইকরণে বিবেচ্য বিষয়াদি ২৩

‘তটস্থঃকরণ ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ’ পর্বের মূল লক্ষ্যসমূহ ২৪

‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা’ পর্বের মূল লক্ষ্যসমূহ ২৫

ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার কর্ম-পরিকল্পনা ও তৎপরতা ২৭

যে টার্গেটগুলোতে আমাদের বেশি মনোযোগ দেয়া উচিত এবং তার কারণসমূহ ২৯

নির্দিষ্ট কিছু পয়েন্টের মাধ্যমে উপরোল্লিখিত পরিকল্পনাটির সহজীকরণ ৩১

৩য় অধ্যায়ঃ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ও পলিসি, যা অনুসরণ করলে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সহজ হয় এবং আল্লাহর ইচ্ছায় সাধারণভাবে ‘তটস্থঃকরণ ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ’ পর্বের লক্ষ্যগুলো পূরণের পাশাপাশি বিশেষভাবে ‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা’ পর্বের লক্ষ্যগুলোও পূরণ হয়। ৩৩

১ম পরিচ্ছেদঃ নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনায় প্রভূত দক্ষতা অর্জন ৩৩

২য় পরিচ্ছেদঃ নেতৃত্ব কে দেবে? ব্যবস্থাপনা কে করবে? প্রশাসনিক মৌলিক
সিদ্ধান্তগুলো কে অনুমোদন করবে? ৩৫

উচ্চতর প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক
৩৫

কিছু উদাহরণ ৩৬

৩য় পরিচ্ছেদঃ পরিক্ষিত ও সফল প্রমাণিত সামরিক কৌশলসমূহের ব্যবহার ৩৯

১ম মূলনীতিঃ যদি নিয়মতান্ত্রিক সেনাবাহিনী এক জায়গায় জড়ো হয়ে থাকে তাহলে
নিয়ন্ত্রণ হারায়, এর বিপরীতে যদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তবে কার্যকারিতা হারায় ৩৯

২য় মূলনীতিঃ অপারেশনের হার কি ঊর্ধ্বমুখী, নাকি ফিক্সড, নাকি উঠানামা করে?
যুদ্ধের ধাপগুলোতে আমাদের অপারেশনের হার কখনও কখনও এই তিন ধরনেরই হয়ে থাকে ৪০

৩য় মূলনীতিঃ ‘নিজের সবটুকু শক্তি দিয়ে প্রচন্ডভাবে শত্রুর সবচেয়ে দূর্বল
পয়েন্টে আঘাত করো’ ৪১

ছোট অপারেশন পরিকল্পনার সময় এই মূলনীতি প্রয়োগের একটি উদাহরণ ৪১

৪র্থ মূলনীতি ‘সামরিক দিকে দিয়ে প্রচন্ড শক্তিশালী শত্রুকে পরাজিত করার সবচেয়ে
কার্যকর উপায় হল, ক্রমান্বয়ে তার সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ক্ষয় করে ফেলা’ ৪২

৪র্থ পরিচ্ছেদঃ কঠোরতা ও নির্মমতার যথাযথ ব্যবহার ৪৩

ইতিহাস থেকে কিছু উদাহরণ ৪৪

সাহাবায়ে কেরাম রাযি.র কঠোরতা ৪৫

হযরত আবু বকর রাযি.র কঠোরতা ৪৬

পাওনা পরিশোধের নীতি ৪৬

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৪৭

৫ম পরিচ্ছেদঃ ক্ষমতা অর্জন ৪৯

ইতিহাস থেকে কিছু উদাহরণ ৪৯

একটি মূলনীতি ৫০

অর্জিত ক্ষমতার প্রকৃত শক্তি-সামর্থ্যকে অনুমান করা জরুরি ৫১

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ শত্রু ও তাদের সহগামীদের রাজনৈতিক চাল সঠিকভাবে বোঝা এবং শরিয়া
রাজনীতি (সিয়াসত) অনুসারে সেগুলো মোকাবেলায় পদক্ষেপ নেয়া ৫৩

রাজনীতি বোঝা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৫৩

রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো সামরিক নেতৃত্ব থেকে আসবে ৫৪

শত্রুর রাজনৈতিক কিছু কলা-কৌশল ৫৪

কিছু নামধারী ইসলামী আন্দোলনের রাজনীতি ৫৬

তাদের বিপরীতে আমাদের করণীয় ৫৬

ইবনুল কাইয়্যিম রহ.র উক্তি ও একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ৫৭

ইসলামী রাজনীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক ৫৮

সামরিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপের একটি প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ ৬০

মিশরের ‘আল জামাআতুল ইসলামিয়্যাহ’র ব্যর্থতার কারণ ৬১

পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দু‘টি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ৬১

প্রথম পদক্ষেপ ৬১

উক্ত বিবৃতিতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলো থাকা উচিত ৬২

দ্বিতীয় পদক্ষেপ: ৬৩

এ অপারেশনের মাধ্যমে আমাদের মূল লক্ষ্য ৬৩

গোলযোগ পরিস্থিতি তৈরি করে ‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা’র দিকে আগানোই আমাদের মূল
লক্ষ্য ৬৪

উদ্বেগ-উৎকন্ঠা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে ৬৫

এক আফগান কমান্ডারের মনোবল ৬৫

৭ম পরিচ্ছেদঃ মেরুকরণ ৬৬

মেরুকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য ৬৬

লেলিহান যুদ্ধই পারে সর্বাধিক মেরুকরণ ঘটাতে ৬৬

তরুণ প্রজন্মকে দলে ভিড়াতে হবে ৬৭

‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার’ ধাপে মেরুকরণ এক ভিন্ন ধরণের গুরুত্ব বহন করে ৬৮

সারকথা ৬৮

ঈমানী অবস্থার উৎকর্ষসাধন ৬৮

সরাসরি আলোচনা ৬৮

ক্ষমা ৬৯

অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে মনোরঞ্জন ৬৯

৮ম পরিচ্ছেদঃ সংযুক্তকরণের নিয়মাবলী (Rules of Affiliation) ৭১

সংযুক্তকরণের একটি মূলনীতি ৭২

৯ম পরিচ্ছেদঃ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা ও গোয়েন্দা ছড়িয়ে দেয়া এবং সব ধরণের
প্রতিপক্ষ ও বিরোধীপক্ষের মাঝে ছিদ্র করা তথা গুপ্তচর ঢুকিয়ে দেয়া ৭৩

• কিছু সমস্যা ৭৪
• যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে ৭৫
• কাজ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে উঠলে ৭৫
• ইসলামী দলগুলোতে গুপ্তচরবৃত্তি ৭৫

- শত্রুর গুপ্তচরবৃত্তি থেকে বাঁচতে হলে করণীয় ৭৬
-

১০ম পরিচ্ছেদঃ আন্দোলন পরিস্থিতির মাঝেও সঠিক জ্ঞানচর্চা ও দীক্ষা অব্যাহত রাখতে হবে , যেমনটা ছিল ইসলামের প্রথম যুগে ৭৬

- তরবিয়ত তথা দীক্ষা প্রদানের বিভিন্ন পদ্ধতি ৭৬
- التربية بالموعظة - উপদেশের মাধ্যমে তরবিয়ত ৭৬
- التربية بالعادة - অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে তরবিয়ত ৭৭
- التربية بالطاعة - নেক আমলের মাধ্যমে তরবিয়ত ৭৭
- التربية بالقدوة - অনুসরনীয় ব্যক্তিদের মাধ্যমে তরবিয়ত ৭৭
- একটি আজব সংশয় ৭৮
- التربية بالأحداث - কঠিন পরিস্থিতির মাধ্যমে তরবিয়ত ৭৮
- আদর্শ মুসলিম ব্যক্তিত্ব গঠনের দুটি পদ্ধতি ৭৮
- শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ ‘র অনন্য বাণী ৮০
- কঠিন সিদ্ধান্ত বলে কী উদ্দেশ্য ৮২
- যুদ্ধ এমনই হয় ৮৩
- জ্ঞানগত উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রেও যুদ্ধ পরিস্থিতির বিরাট অবদান রয়েছে ৮৩
- যুবকরা দলে দলে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিবে ৮৪
- তরবিয়ত বিষয়ক কিছু গ্রন্থ ৮৪
- তৃতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্টে কয়েকটি কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ৮৫
-
- ৪র্থ অধ্যায়ঃ খুবই জটিল কিছু সমস্যা ও বাধা , যার সম্মুখীন আমরা হবো এবং ওগুলো থেকে উত্তরণের উপায় ৮৬

১ম সমস্যঃ সত্যিকার মুমিনদের (মুজাহিদদের ) সংখ্যা ক্রমশ কমে যাওয়া ৮৭

২য় সমস্যঃ ব্যবস্থাপনা কর্মে নিয়োজিত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের স্বল্পতা ৮৮

- প্রশাসনিক কাজগুলো আমরা কিভাবে আঞ্জাম দিবো ৮৮
- একটি সুন্দর সমাধান ৮৮
- যোগ্য নেতৃত্ব এভাবেই তৈরি হয় ৮৯
- ৩য় সমস্যাঃ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সদস্যদের পূর্ব সম্পর্ক , বিশেষকরে ভিন্ন ধারার ইসলামী দলগুলোর সাথে থাকা পূর্ব সম্পর্ক ৯০
- ৪র্থ সমস্যাঃ অনুপ্রবেশ ও গুপ্তচরবৃত্তি ৯২
- শত্রুর বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে গ্রেফতার হলে করণীয় ৯৩

৫ম সমস্যাঃ কিছু সদস্য বা কিছু গ্রুপ কিংবা সম্পূর্ণ একটি অঞ্চল আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে জিহাদী তানজিমকে পরিত্যাগ করা বা এর বিরুদ্ধে বিপ্লব করা ৯৪

- আমাদের যা করণীয় ৯৬

৬ষ্ঠ সমস্যাঃ মাত্রাতিরিক্ত জোশ ও এর সাথে জড়িত সমস্যাবলী , যেমন: অতি উৎসাহী হয়ে তড়িঘড়ি করে অপারেশন চালানো বা বোকামী করা বা সীমালঙ্ঘন করা ৯৮

- সীমালঙ্ঘন ৯৯
- বোকামি ৯৯
- সারকথা ১০০

উপসংহারঃ এর চেয়ে সহজ আর কোন সমাধান আছে কি?

• একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ১০১
• মূল উদ্দেশ্য ১০২
• সমাধানের পদ্ধতি হিসাবে সামরিক অভ্যুত্থান ১০৭
• যারা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পক্ষে তাদের আলোচনায় ফিরে আসি ১১১
• নখ-দন্ত অপসারণ নীতি ১১২
•

• ৫ম অধ্যায়ঃ গুরুত্বপূর্ণ প্রাসংগিক কিছু প্রবন্ধ
• ১ম প্রবন্ধঃ ধৈর্য্যের লড়াই ১১৪
• যুদ্ধাভিলাসী মনোভাবে ধ্বস ১১৫
• একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ১১৫
• শত্রুদের একটি নিকৃষ্ট পরিকল্পনা ১১৬
• শত্রুদের আরেকটি কৌশল ১১৬
• এ বক্তব্যের সারাংশ ১১৮
• মূল আলোচনায় ফিরে আসি ১১৮
• গ্রেফতার এড়ানোর জন্য আমাদেরকে যা যা করতে হবে ১১৯
• বস্তুবাদী বিশ্বাসের লড়াই ১২০
• সারকথা ১২০
•

• ২য় প্রবন্ধঃ দাওয়ার ক্ষেত্রে মানব মনের চাওয়া বনাম আল্লাহর নীতি ১২১
• একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ১২৫
• সারকথা ১২৬
•

• ৩য় প্রবন্ধঃ যুদ্ধের অগ্নি পরীক্ষায় মুখোমুখি দু‘পক্ষ ১২৭

এ প্রবন্ধে যা বলতে চেয়েছি ১৩৫

৪র্থ প্রবন্ধঃ ‘প্রকৃতির স্বাভাবিক নীতি’ যা মুমিন, কাফের উভয়ের ক্ষেত্রেই
প্রযোজ্য ১৩৬

৫ম প্রবন্ধঃ আমাদের পথ পুরো বিশ্ববাসীর জন্য রহমত ১৪৬

বেশকিছু প্রশ্ন, যেগুলোর উত্তর খুঁজতে গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন ১৪৭

শাস্তিযোগ্য কিছু গোষ্ঠীর উপর মুসলমানদের যেই তরবারিগুলো মানবতার জন্য রহমত
বয়ে এনেছিল ১৫১

জিহাদী কর্মকান্ডের বিরোধী গোষ্ঠী ১৫৩

ইহুদি ও খ্রিস্টান ১৫৩

মুরতাদ গোষ্ঠী ১৫৩

শান্তিপ্রিয় বিভ্রান্ত ইসলামী দল ১৫৩

জিহাদের বিধান দিয়েছেন কয়েকটি উদ্দেশ্যে ১৫৪

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ১৫৫

[illegible]- ‘[illegible]-[illegible]’ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**[illegible] ([illegible])**

[illegible]’[illegible], [illegible]

[illegible], ~~[illegible],~~ [illegible], [illegible]

মাধ্যমে তারা (মুসলিম) লাঞ্ছনার জীবন থেকে বের করে হেদায়েত ও মুক্তির পথে মানবতার নেতৃত্বের আসনে ফিরিয়ে আনতে চান, পাশাপাশি অন্যান্য কিছু ইসলামী দল সমূহের কার্যক্রমের সাথে তাদের কার্যক্রমের তুলনামূলক বিশ্লেষণও করা হয়েছে। মূলত বাকি সেই ইসলামী দলগুলোর কার্যক্রম আমাদের মুসলিম যুবসমাজকে খানিকটা বিভ্রান্তিতেই ফেলেছে বলা যায়।

হ্যাঁ, যুব সমাজের অনেকে তাদের কাজের সাথে সঙ্গতি রেখে কিংবা খেয়াল খুশি ও আরাম আয়েশের সাথে মিল করে যে যার মত কখনো এ পথ, কখনো সে পথ গ্রহণ করেছে নিয়েছে। কেউ কেউ আবার কোন একটি সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন কার্যক্রম দেখে বিভ্রান্তিতে পড়েছে, যে সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হয়ত - অন্তত সচেতন লোকদের দৃষ্টিতে - কোরআন-সুন্নাহই দিয়ে রেখেছে ইতিমধ্যে।

পূর্ববর্তী ওই রচনা থেকে কিছু কথা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরছি,

বর্তমান সময়ের ইসলামী আন্দোলনের ধারাগুলোর মধ্যে কেবল পাঁচটি ধারার লিখিত কার্ রয়েছে। আমি দাওয়াত ও তাবলীগের ধারা, আত্মশুদ্ধি কেন্দ্রিক সালাফী ধারা বা সুফী সালাফী ধারা এবং শাসক শ্রেণীর তত্বাবধানে চলা সালাফী ধারা- এগুলোর কথা বলছি না। বরং এর বাইরে আরও এমন পাঁচটি ধারা রয়েছে যাদের লিখিত কার্যক্রম রয়েছে এবং যেগুলো তাদের ব্যবহারিক বাস্তবতার দরুন আলোচনা-পর্যালোচনার দাবি রাখে। ধারাগুলো হল,

১। জিহাদী সালাফী ধারা।

২। সাহওয়া সালাফী ধারা। যার প্রতিনিধিত্ব করেন শাইখ সালমান আল আওদা এবং শাইখ সাফার আল-হাওয়ালী।

৩। মুসলিম ব্রাদারহুড বা ইখওয়ানের ধারা। (আন্তর্জাতিক সংগঠন, যাকে অন্যান্য সংগঠনের মূল বলা যায়)

৪। তুরাবির ইখওয়ানের ধারা।

৫। জাতীয়তাবাদী জিহাদী ধারা (যেমন: হামাস, মোরো লিবারেশন ফ্রন্ট ইত্যাদি)

[সাহওয়া সালাফী ধারা]

ওপরের পাঁচটি ধারার মধ্যে ‘সাহওয়া সালাফী’ ধারার কার্যক্রম বিশেষ করে তার সর্বশেষ রূপরেখা অনুযায়ী (অর্থাৎ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মাধ্যমে আন্দোলনকে অগ্রসর করার নীতি অনুযায়ী) আন্তর্জাতিক সংগঠন ইখওয়ান তথা ব্রাদারহুডের আন্দোলনের সাথে অনেকখানি সাদৃশ্যপূর্ণ; এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা হুবহু একই রকম। তবে আল্লাহর ইচ্ছায় আমি স্পষ্ট করব যে, এই আন্দোলন হাজার বছর ধরে চেষ্টা করলেও তার প্রাথমিক ধাপই পার করতে পারবে না। কারণ, এই আন্দোলন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মনীতিকে (যা শরিয়ার সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণও বটে) বহুলাংশে উপেক্ষা করেছে। যার ফলে আন্দোলনটি একটি দুষ্টচক্রের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। ফলে তারা কুফফার ও তাগুত শক্তি এবং সুযোগ সদ্ধানী মুনাফিকদের খেলার পুতুলে পরিণত হয়। যদিও ইখওয়ানের তুলনায় সাহওয়া সালাফিজমের ধারা তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নের চেষ্টা বেশি করে, অন্ততঃ কাগজে কলমে তাই প্রতীয়মান।

[মুসলিম ব্রাদারহুড বা ইখওয়ানের ধারা]

মুসলিম ব্রাদারহুড বা ইখওয়ানের আন্দোলনের ব্যাপারটি হলো, তারা তাদের বিদআতি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বা বলতে পারো, ধর্মনিরপেক্ষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নিজেদের ধারাকে তাত্ত্বিকভাবে লিপিবদ্ধ করে। আর সাংগঠনিক নীতিমালার ভিত্তিতে গড়া বাজে কার্যক্রমগুলো চমকপ্রদ শ্লোগান ও লিখিত তাত্ত্বিক মানহাজের মাধ্যমে মুসলিম যুবকদের মাঝে চালিয়ে দিতে চায়। এমনকি [الجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا] অর্থাৎ 'জিহাদই আমাদের পথ এবং আল্লাহর পথে মৃত্যুই আমাদের সর্বোচ্চ কামনা' অথবা 'আমাদের আন্দোলন একটি সালাফি আন্দোলন' বা 'আমাদের আন্দোলন একটি সূফীবাদী আন্দোলন'- এ ধরণের শ্লোগান দিতেও তাদের কোনো বাধা নেই। [কিন্তু এগুলোর ভ্রান্তি আসলে সহজেই বোধগম্য] এগুলো তাদের বক্তব্য থেকে স্পষ্টই বুঝা যায়।

**[**জিহাদী সালাফী ধারা**]**

আর জিহাদী সালাফী ধারাটির ব্যাপার হলো, আমার ধারনা এটি শরয়ী নীতি এবং প্রকৃতির স্বাভাবিক নীতির সমন্বয়ে গঠিত একটি কার্যকর পদ্ধতি এবং পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা। যদিও এই পদ্ধতিটি আল্লাহ প্রদত্ত পদ্ধতি, তথাপি এর বাস্তবায়নকারীরাও তো 'মানুষ'। অন্যান্য মানুষের মতো তাদের মাঝেও সীমাবদ্ধতা আছে, আছে অপূর্ণাঙ্গতা। তাই তাদের থেকেও কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে, যেমনটা ইসলামের প্রথম যুগেও হয়েছিল। বরং বর্তমানে আরও বেশি হতে পারে, যেহেতু তাঁরা ছিলেন নিঃসন্দেহে ইসলামের শ্রেষ্ঠ যুগের মানুষ। ব্যাপারটি বুঝতে আপনি শাইখ ওমর মাহমুদ আবু ওমর এর 'المثالية والواقعية' [idealism and realism] নামক প্রবন্ধটি পড়তে পারেন (আল্লাহ তাঁকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করুন)।

আমি বলি, যদিও তাদের কার্যক্রমগুলো কিছু কিছু ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে গেছে, যেগুলো মূলত অলংঘনীয় তাকদিরেরই অংশ, যা কোনো ভাবেই পরিবর্তন হওয়ার নয়; তবে তাদের কার্যক্রমের ধাপগুলো শরীয়া নীতি ও প্রকৃতির স্বাভাবিক নীতির আলোকে সংকলিত হয়েই পথ চলছিল পরিচালিত হচ্ছিল বলা যায় বরং আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের এমন কিছু ঐশী তত্ত্বাবধান ও কৃপা অর্জিত হয়েছিল যার মাধ্যমে তারা কিছু [গুরুত্বপূর্ণ] ধাপও পার করেছেন। তাদের ও তাদের শত্রুদের মধ্যকার সংঘাত যে নবী-রসূল ও কাফেরদের মধ্যকার সংঘাতেরই অনুরূপ তা কেউই অস্বীকার করবে না। কেউ মানুক বা না মানুক, এটাই সত্যি যে, এই সংঘাত পূর্ব থেকে চলে আসা ওই সংঘাতেরই একটি ধারাবাহিকতা।

**[**তুরাবির ইখওয়ানের ধারা**]**

তুরাবির ইখওয়ানের ধারা [যাকে মূল সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুডের একটি ভগ্নাংশ বলা চলে], এই ধারা প্রকৃতির স্বাভাবিক নীতি থেকে ততটুকুই গ্রহণ করেছে যতটুকু ওমর আল বশীর ও তুরাবি কর্তৃক একটি রাষ্ট্র (সুদান) প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন ছিল। [যদিও তাদের উভয়ের মাঝে পারস্পরিক দূরত্বের বিষয়টি এখন আর গোপন নয়।] তবে এ ধারাটি শরিয়তের কিছু বিধানের প্রতি অবহেলা এবং কিছু বিধানকে বিকৃত করার কারণে এ রাষ্ট্রকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করেছে; যেখানে ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে ধর্ম ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এর ব্যাখ্যা দিতে গেলে এবং এদের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করতে গেলে আলোচনা দীর্ঘ হবে।

**[**জাতীয়তাবাদী জিহাদী ধারা**]**

জাতীয়তাবাদী জিহাদী ধারা (যেমন, ফিলিস্তিনের 'হামাস' ও 'আল-জিহাদুল ইসলামী' সংগঠন) তাদের বিষয়টি হলো, পূর্বের চারটি ধারার কর্মকান্ডের সাথে তুলনা করে আপনি যদি এ ধারা সম্পর্কে আপনার জানা তথ্যগুলো পর্যালোচনা করেন তাহলে নিজে নিজেই এদের কার্যক্রম সম্পর্কে আঁচ করতে পারবেন। সংক্ষেপে বললে, জিহাদি সালাফিজমের

ধারার সাথে এই ধারার কিছু মিল রয়েছে, কিন্তু এই ধারা রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায় মূল ব্রাদারহুড এবং তুরাবির ব্রাদারহুডের মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। উপরন্তু এটি তার অনুসারীদের মাঝে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার সঠিক পদ্ধতিটি ছড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলে এর ভাগ্যে দুটি পরিণতির কোন একটির আশংকা করি। হয় এর কষ্টার্জিত ফলটুকু (এর যোদ্ধাদের কুরবানি ও ত্যাগ) পরিশেষে বিনষ্ট হবে এবং ওই সেক্যুলার-ধর্মহীন মুরতাদ ও জাতীয়তাবাদীদের হাতেই গিয়ে পড়বে, না হয় তা ওমর আল-বশীর ও তুরাবীর প্রতিষ্ঠিত সুদানের মতোই একটি রাষ্ট্রে পরিণত হবে। এর ব্যাখ্যা দিতে আলোচনা দীর্ঘ হবে।

[পূর্ববর্তী একটি রচনার থেকে নেয়া উদ্ধৃতিতাংশ এখানেই শেষ]

আমি আমার ওই রচনায় ইঙ্গিত দিয়েছিলাম যে, আমি একটি গবেষণার প্রায় শেষ প্রান্তে, যেখানে আমি পূর্বের পূর্বোল্লিখিত ধারাগুলোর জট খুলে দিবো এবং তাওহীদ ও জিহাদী মানহাজীদের কার্যক্রমের একটা সামগ্রিক [একত্রীকৃত] পরিকল্পনা তুলে ধরবো, যেগুলো দীর্ঘদিন ধরে তাদের বিভিন্ন গবেষণাকর্ম ও লেখা-লেখির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, যা এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা জানেন। একইভাবে আমি অন্যান্য ধারাগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কেও আলোচনা করবো। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাকে ইখলাস ও ইনসাফ দান করেন এবং সব ধরণের ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষা করেন।

‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা- কালের কঠিনতম যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে উম্মাহ অতিবাহিত হবে

এই শিরোনামে বক্ষমান এই গবেষণা প্রবন্ধটি মূলত ব্যাপক কিছু পরিকল্পনার নাম, যদিও এ গবেষণায় এগুলো বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়নি। কেননা বিস্তারিত আলোচনা করা হয় সাধারণত দু‘টি গ্রুপকে লক্ষ্য করে। এক. এ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ তাদেরকে লক্ষ্য করে। দুই. মাঠ পর্যায়ে যারা চলমান নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা অঞ্চলের নেতৃত্বে থাকবেন তাদেরকে লক্ষ্য করে। (আর এ দুটি গ্রুপ এখানে আমার উদ্দেশ্য নয়)

তবে কোথাও যদি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়ে থাকে তাহলে সেটা হয়তো গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে বা উদাহরণ হিসেবে চিন্তা শক্তিকে শানিত করার জন্য।

‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা’ হচ্ছে আগত সেই ধাপ যার মধ্য দিয়ে উম্মাহ শীঘ্রই অতিক্রম করবে এবং এই ধাপটিকে সবচেয়ে কঠিন ও বিপজ্জনক ধাপ হিসেবে গণ্য করা হয়। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা যদি এই নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনায় সফল হতে পারি তবে এই ধাপ হবে খিলাফত পতনের পর তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে সেতুর মতো। আর যদি ব্যর্থ হই -আল্লাহর কাছে এর থেকে পানাহ চাই- তাহলে এর অর্থ এই নয় যে, ওখানেই সবকিছুর পরিসমাপ্তি ঘটে যাবে বরং এই ব্যর্থতা আরোও বেশি নৈরাজ্যের দিকে নিয়ে যাবে।

ব্যর্থতার ফলস্বরূপ যদি নৈরাজ্য আরও বৃদ্ধি পায়, তাহলে এটা যে উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতি বা নব্বইয়ের দশক ও তদপূর্ববর্তী পরিস্থিতির চেয়েও খারাপ এমন কিন্তু নয়। বরং এ জাতীয় নৈরাজ্য (খারাপ) পরিস্থিতির মধ্যে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিটিও কুফরের অধীনে [ থেকে বাসকৃত] স্থিতিশীল [কোন ভালো] পরিস্থিতির চেয়ে অনেক হালকা।

প্রাথমিক কিছু কথা

‘সাইক্স-পিকট’ [1] এর যুগ থেকে বিশ্ব যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে

বিগত শতাব্দীগুলোর দিকে, এমনকি বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, যখনই কোন বৃহৎ রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে- এমনকি ছোট কোন রাষ্ট্রেরও পতন হয়েছে, হোক তা ইসলামিক কিংবা অনৈসলামিক, তখন যতদিন পর্যন্ত না ক্ষমতা, ভূমি ও অঞ্চলসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দিক থেকে পূর্বের রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যের অনুরূপ অন্য কোনো রাষ্ট্র সৃষ্টি না হয়েছে ততদিন পর্যন্ত এদের শাসন-নিয়ন্ত্রণহীন বিশৃংখল ভূমি ও অঞ্চলসমূহের পরিবর্তন ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়া, প্রচলিত মানব-রচিত ‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার’ মধ্য দিয়েই গেছে।

[বিগত ১৯২৪ সালে] যখন ইসলামী খিলাফতের পতন হয় তখন কিছু কিছু এলাকাতে কিছু নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল কিন্তু সাইক্স-পিকট চুক্তি কার্যকর হওয়ার ফলে খুব দ্রুতই ওসব এলাকাতে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। তখন খিলাফতের অধীনে থাকা রাষ্ট্রগুলোর বিভক্তি এবং ঔপনিবেশিক দখলদার রাষ্ট্রগুলোর ফিরে যাওয়া এমনভাবে হয়েছিল যে, খিলাফার অধীনে থাকা সুবিশাল অঞ্চল ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছোট-বড় বিভিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হয়, যেগুলো হয়তো সামরিক সরকার দ্বারা শাসিত হতে থাকে বা সামরিক শক্তি সমর্থিত বেসামরিক (সিভিল) সরকার দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। আর এধরনের বেসামরিক সরকারগুলোর পক্ষে রাষ্ট্র-শাসন অব্যাহত রাখতে পারাটা নির্ভর করতো তাদের সাথে তাদের সামরিক শক্তিসমূহের সম্পর্কের দৃঢ়তা এবং একইভাবে সামরিক শক্তিগুলোর পক্ষে একে রাষ্ট্র আকারে টিকিয়ে রাখার সামর্থের উপর, চাই তা তাদের নিজস্ব সামরিক বাহিনী বা পুলিশ বাহিনীর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে হোক কিংবা কোনো বহিঃশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় হোক।

কীভাবে এ রাষ্ট্রগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ সরকারগুলো রাষ্ট্রের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তা নিয়ে এখানে আমরা আলোচনা করব না, চাই তারা দখলদার সাম্রাজ্যবাদীদের উপর বিজয় লাভ করার মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করুক কিংবা গোপনে সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে আঁতাত করে তারা চলে যাওয়ার সময় দোসর হিসাবে তাদের নিয়োগ দিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে লাভ করুক কিংবা এ দুটোর মিশ্রণে লাভ করুক।

এ রাষ্ট্রগুলো প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হোক কিংবা গোপন আঁতাতের ভিত্তিতে পূর্বের দখলদার সাম্রাজ্যবাদীদের দোসর হোক, তারা সকলেই একটা পর্যায়ে এসে বৈশ্বিক ক্ষমতা বলয়ের কোন একটি কক্ষপথে আবর্তিত হতে শুরু করে, যে বলয়গুলো মূলতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব-রাজনীতি প্রসূত। এই বৈশ্বিক ক্ষমতা বলয়ের বাহ্যিক রূপটি হল জাতিসংঘ এবং এর ভিতরের আসল রূপটি হল এমন দুটি মেরু বা পরাশক্তি (অর্থাৎ আমেরিকা-USA, রাশিয়া-USSR[2]) যাদের অধীনে থাকতো বড় বড় মিত্র রাষ্ট্রগুলোর সমন্বিত সামরিক জোট, আর এই দুই মেরুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো অপেক্ষাকৃত কম শক্তি সম্পন্ন আরও অনেকগুলো গোলাম (স্যাটেলাইট) রাষ্ট্র।

কোন একটি পরাশক্তি তার অধীনে থাকা গোলাম রাষ্ট্র থেকে অর্থনৈতিকভাবে ও সামরিকভাবে লাভবান হতো, বিনিময়ে সে গোলাম রাষ্ট্রের সরকারগুলোকে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থন দিত। কিন্তু এ সাহায্যের পরিমাণ এবং তা কারা ভোগ করবে তা নির্ধারিত হত গোলাম রাষ্ট্রটির অধিবাসীদের ধর্মীয় অবস্থার উপর ভিত্তি করে, বিশেষ করে যে সব দেশের অধিবাসীরা মুসলিম সে সব দেশে এই সাহায্যের পরিমাণ হত একেবারেই সীমিত এবং তার বেশিরভাগই যেত তাদের গোলামী করা ক্ষমতাসীন সরকারের ক্ষমতাবানদের পকেটে কিংবা সামরিক বাহিনীর কমাণ্ডারদের পকেটে।

এর কিছুদিন পর কিছু কিছু সরকারের পতন ঘটে এবং তাদের স্থলে অন্যরা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পতনের কারণ ছিল, হয়তো তার প্রভু পরাশক্তি তাকে ত্যাগ করেছে অথবা তার পতন ঠেকানোর সামর্থ ওই পরাশক্তির ছিল না অথবা অন্য পরাশক্তির সমর্থন নিয়ে ভিন্ন কোনো গ্রুপ ওই সরকারের ভিতরে ফাটল সৃষ্টি করেছে এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নিয়মে

(অর্থাৎ কোনো পরাশক্তির পৃষ্টপোষকতা ছাড়াই) ওই সরকারকে উৎখাত করে তাদের স্থান দখল করেছে।

এই সরকারগুলোর যারাই স্থিতিশীলতা অর্জন করেছিল তারাই নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধকে রাষ্ট্রের সমাজব্যবস্থার উপর চাপিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছে। আর নতুন পরাশক্তির বলয়ে এসে থাকলে কিংবা আগের সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা যেই পরাশক্তি করতো সেই পরাশক্তির সাথে সম্পর্ক ধরে রেখে থাকলে এই সরকারগুলো নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধের মাঝে সেই পরাশক্তির চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধের মিশ্রন ঘটিয়ে এক মিশ্রিত সংস্কৃতি সমাজের উপর চাপিয়ে দিত। আবার এই মিশ্রিত সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য খানিকটা [ধর্মীয়] পবিত্র বিষয়ও জুড়ে দিত, যেগুলোকে বিবেকবান ব্যক্তি মাত্রই প্রত্যাখ্যান করে গেছেন।

এই সরকারগুলো তাদের শাসনাধীন সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় আক্বীদা-বিশ্বাসের বিরোধিতা করতে শুরু করে এবং কালের পরিক্রমায় ধীরে ধীরে তারা এমন নীচু পর্যায়ে নেমে আসে যে, রাষ্ট্রের সম্পদ লুটপাট করে বিনষ্ট করতে থাকে, ফলে লোকজনের মাঝে অন্যায়-অবিচার-দুর্বৃত্তি-অপরাধ বিস্তার লাভ করে।

[শক্তি বা ক্ষমতার দুটি ধরণ]

দুনিয়ার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে আমরা দেখতে পাই যে, সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে উঠা শাসনব্যবস্থাকে যেসব শক্তি পুনরুদ্ধার করতে পারে, এমনকি তা যদি সঠিক ইসলামী বিশ্বাসের ভিত্তিতে না হয়ে শুধুই জুলুম প্রতিহত করে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতেও হয় – যা মুমিন কাফের সকলের কাছেই একটি সমাদৃত সমবিদিত বিষয় সেক্ষেত্রে এমন শক্তি বা ক্ষমতার ধরণ হল দুটি।

[জনগণের শক্তি]

এক। জনগণের শক্তি বা ক্ষমতা। এই শক্তিকে অত্যন্ত চতুরতার সাথে, হাজারো ছল চাতুরির মাধ্যমে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে ব্যস্ত রাখা হয়েছে। যেমন, জীবিকা নির্বাহের তাগিদে দুনিয়াবী কাজ-কর্মে ব্যস্ত রাখা কিংবা জীবনে সফলতার স্বর্ণশিখরে আরোহণ করতে হবে, এরূপ ধ্যান ধারনা মন মগজে ঢুকিয়ে দিয়ে এ লক্ষ্য পূরণের পিছনে লাগিয়ে দেয়া, সম্পদ অর্জনের স্পৃহা জাগিয়ে দেয়া, [সিনেমা, ছবি, মডেলিং ইত্যাদির মাধ্যমে] মানুষের যৌন আকাংখাকে জাগিয়ে তোলা ইত্যাদি নানান উপায়ে এই শক্তিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে ব্যস্ত রাখা হয়েছে এবং এই শক্তির যে একটা অন্তঃর্নিহিত কার্যকারীতা আছে সেটাই ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেন জনসাধারনের এই অপ্রতিরোধ্য শক্তিটি কখনোই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। তাছাড়া মিডিয়ার মাধ্যমে নানামুখী ভয়াবহ মিথ্যা প্রচারণা, [মূল ইসলামকে বাদ দিয়ে] বিভিন্ন ভ্রান্ত মতাদর্শ যেমন সুফিবাদ, মুর্জিয়াবাদ, জড়তাবাদ[3] ইত্যাদি সমাজের সকল ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টিতো রয়েছেই। অপরদিকে গাফলত ও উদাসীনতা ভেঙ্গে যারাই জেগে ওঠে তাদেরকে সেনাবাহিনী, পুলিশ ইত্যাদি ব্যবহার করে কঠোরভাবে দমন করা হয়। এসব সেনাবাহিনী ও পুলিশ এ কাজকেই তাদের মূল দায়িত্ব মনে করে থাকে, যে দায়িত্ব পালনের জন্য তারা অর্থকড়ি, উপঢৌকন ইত্যাদি লাভ করছে। সুতরাং তাদের লক্ষ্যই হলো, যে কোনো মূল্যে এসব সরকারকে সুরক্ষা দিয়ে যাওয়া কিংবা রাষ্ট্র দুই মেরুর (পরাশক্তির) কোনো একটিকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকলে তা নির্বিঘ্নে চলতে দেয়ার সুযোগ করে দেওয়া।

[প্রতিরক্ষা বাহিনীর শক্তি]

দুই। দ্বিতীয় যে শক্তিটি -আংশিক ভাবে হলেও দুনিয়ার স্বাভাবিক নিয়মের সাথে মিল রেখে- সমাজের হারানো মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও ন্যায়বিচারকে পুনরুদ্ধার করতে পারে সেটি হল প্রতিরক্ষা বাহিনীর শক্তি। গোলাম সরকারগুলো তাদের লুন্ঠিত অর্থ-সম্পদ হাত খুলে এদের পিছনে ব্যয় করে এবং এদেরকে কিনে ফেলে, যেন তারা এই কাজে আগ্রহী না হয়ে ওঠে বরং উল্টো তাদেরই মদদ দেয়।

কিন্তু শয়তান ও তার দোসররা নাক ছিঁটকালেও দেখা যায় যে, কিছু সংখ্যক জ্ঞানী-গুনী সেনা সদস্য অন্যায়ের বিরোধিতা করেন এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে চান। তারা তাদের যতটুকু সামর্থ আছে, সেটুকু দিয়েই [ভগ্ন সমাজের] এ করুণ বাস্তবতা তাদের [ঈমানী] বিশ্বাস কাঠামোর আদলে পাল্টে দিতে চান। [কিন্তু হায়!] সেখানে দ্বিতীয় আর একদল দুর্নীতি পরায়ণ লোক থাকে যারা এসব মূল্যবোধ বা ঈমানী বিশ্বাসের কোনো ধার ধারে না [এবং এধরনের অভ্যুত্থানে মোটেই আগ্রহী হয় না]। এমতাবস্থায় দু‘পক্ষের ভিন্নতা সত্ত্বেও কোনো ভাবে যদি ওই সৎ চিন্তাশীল সেনা সদস্যরা সকলের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার জন্য কোনো শক্তিশালী পরিকল্পনা করে (এবং রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয়), তখন ওই দুই পরাশক্তি বা তাদের কোনো একটি জাতিসংঘের ব্যানারে ছলে বলে কৌশলে কিংবা শক্তি প্রয়োগ করে অথবা চাপ প্রয়োগ করে বা একত্রে সবগুলো প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে যে করেই হোক নতুন সরকারকে তাদের কোন একটি পরাশক্তির ক্ষমতা বলয়ে আবর্তিত হতে উঠে পড়ে লেগে যায়। এমতাবস্থায় গুনী-মানি [ও যোগ্যতা সম্পন্ন-Qualified and Capable] সেই ব্যাক্তিটি যিনি [সমাজ বদলের অনেক আশা বুকে নিয়ে, অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা পেড়িয়ে] ক্ষমতায় আসেন, তিনিও বাধ্য হন তার আগের সরকারের মতই গোলামী করতে, নিকট অতীতে যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো ওমর আল-বাশির এর সুদান।[4]

এসব কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাহিনীর গুনী-মানি [Qualified and Capable Officer] অফিসারদের ধ্যান-ধারণার পরিসমাপ্তি ঘটে। ফলে সরকার পরিবর্তনের চিন্তা থেকে তারা সরে আসেন ও বাস্তবতাকে মেনে নেন এবং মনের কষ্ট মনে রেখে নিজেকে গুটিয়ে রাখেন। আর তাদের মধ্যে যারা সত্যিকারের সৎ, তারা সামরিক চাকরি থেকে ইস্তফা নিয়ে নেয়। কারণ, তা না হলে তারাও দ্রুতই ওই সব শ্লোগানের অতল গহবরে হারিয়ে যাবে যে সব শ্লোগানের ভাষা ও দর্শন হল, ‘ধর্ম-টর্ম বলতে কিছু নেই বা ‘ভালোর কোনও অস্তিত্ব নেই, ন্যায় বিচার বলতে কিছু নেই’ [সহজ ভাষায় বললে, খাও দাও ফুর্তি কর, সরকারকে সাপোর্ট কর]। এমনই ছিল খিলাফাহ বিলুপ্তির পর সার্বিক রাষ্ট্রীয় অবস্থা!

অতীকল্পিত ক্ষমতাঃ বল্গাহীন সামরিক শক্তি ও ভয়ঙ্কর মিথ্যা [মিডিয়া] প্রচারণাকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাধর হয়ে ওঠা পরাশক্তি

দুই পরাশক্তি তাদের ‘কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার’ মাধ্যমে বিশ্ব বিন্যাসের [ক্ষমতা বলয়ের] উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে থাকে। ‘কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা’ বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে, সেই সুবিশাল সামরিক শক্তি যা পরাশক্তির কেন্দ্র থেকে শুরু করে আত্মসমর্পণকারী রাষ্ট্রসমূহের সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রাথমিকভাবে ‘ছোট রাষ্ট্রগুলোর আত্মসমর্পণ’ বলতে যা বুঝায় তা হলো, এই রাষ্ট্রগুলো কেন্দ্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে, রাষ্ট্রীয় বড় বড় ঝামেলায় তাদেরকে শালিস মানবে এবং তাদের স্বার্থ রক্ষায় দায়বদ্ধ থাকবে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তাআলা এই দুই পরাশক্তিকে [আমেরিকা এবং রাশিয়াকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন, তা মানুষের বিবেচনা অনুযায়ী সুবিশাল। কিন্তু বাস্তবে কেউ

একটু গভীর ভাবে সাধারণ মানবীয় বুদ্ধিমত্তা নিয়ে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, এই পরাশক্তিগুলো [আমেরিকা বা রাশিয়া] তাদের নিজ রাষ্ট্রের কেন্দ্রে বসে দূরবর্তী কোনো রাষ্ট্রের যেমন, মিশর বা ইয়েমেনের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, যতক্ষণ না ওরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় পরাশক্তিগুলোর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এটি সত্য যে, পরাশক্তিগুলোর ক্ষমতা বিশাল, তদুপরি তারা আঞ্চলিকভাবে ক্ষমতাধর মুসলিম সরকারগুলোর কাছ থেকেও সমর্থন আদায় করতে চেষ্টা করে, যারা বাকি ইসলামী বিশ্বের উপর ক্ষমতা খাটায়। যাই হোক, এত কিছুও তাদের জন্য যথেষ্ট হয় না। ফলশ্রুতিতে পাশাপাশি তারা মিডিয়ার মাধ্যমে ভয়াবহ মিথ্যা প্রচারণার আশ্রয় নেয় এবং নিজেদেরকে বিশ্ববাসীর সামনে এমন ভাবে চিত্রায়িত করে, যেন তারা অপ্রতিরোদ্ধ ও তাদের শক্তি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত এবং বিশ্বের যে কোনো ভূ-খন্ডে এমনকি আসমানেও তাদের ক্ষমতা চলে, যেন সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতার মতোই তাদের ক্ষমতা।

কিন্তু মজার ব্যাপার হল, এই দুই পরাশক্তি মিডিয়ার ভয়াবহ মিথ্যা প্রচারণাকে একসময় নিজেরাও বিশ্বাস করে বসে, তারা ভাবতে শুরু করে সত্যিই বুঝি তারা এমন শক্তির অধিকারী, যারা বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে যে কোনো স্থানকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। যা মূলত স্রষ্টা সুলভ ক্ষমতার বৈশিষ্ট! সুতরাং ‘বিশ্বময় ক্ষমতার মালিক’ এ মর্মে তাদের প্রতারনাপূর্ণ প্রচারণা তো আছেই, তদুপরি লোকেরা যে শুধুই ভয়ের কারণে বশ্যতা স্বীকার করে এমন নয় বরং তারা তাদেরকে ভালোও বাসে। কারণ, তারা মিডিয়ার মাধ্যমে লোকদেরকে [মানবাধিকারের নামে] স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, সাম্য ও আরও নানান শ্লোগান শুনিয়ে থাকে।

যখন বড় বা ছোট যে কোন রাষ্ট্র তাদের এই মিথ্যা কাল্পনিক শক্তির সামনে বশ্যতা স্বীকার করে এবং এর উপর ভিত্তি করেই যখন সেই পরাশক্তি উক্ত রাষ্ট্রের উপর হস্তক্ষেপ করতে থাকে, ঠিক তখন থেকেই সেই পরাশক্তির পতন শুরু হয়। আমেরিকান লেখক পল কেনেডি ঠিক যেমনটি বলেছেন, ‘আমেরিকা যদি তার সামরিক শক্তি ব্যবহারে অতি প্রসারতা ঘটায় এবং কৌশলগত ভাবে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ছড়িয়ে পড়ে তবে এটাই তার পতন ডেকে আনবে’।

[সামাজিক সৌহার্দ্য]

তেমনিভাবে এই পরাশক্তি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রে সেখানকার সামাজিক সৌহার্দ্য ও একাত্মতা বজায় থাকার মাধ্যমে এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক পরিমন্ডলে সৌহার্দ্য বজায় থাকার মাধ্যমে পরিপুষ্ট হয়। যদি সামাজিক ঐক্য এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক পরিমন্ডলে সৌহার্দ্য বজায় না থাকে তাহলে এই সুবিশাল ক্ষমতার [তথা অস্ত্র, প্রযুক্তি, সৈন্য সামন্তের] কোনো মূল্যই থাকে না। বরং সমাজের সৌহার্দ্যপূর্ণ কাঠামো ভেঙ্গে পড়লে এই বিশাল ক্ষমতাই তাদের জন্যে কাল হয়ে দাঁড়ায়।

সামাজিক সৌহার্দ্য বিনাশকারী উপাদান অনেক, যেগুলোকে সংক্ষেপে ‘সভ্যতা বিনাশী উপাদান’ বলা যেতে পারে। যেমন, ধর্মীয় অবক্ষয়, নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক বৈষম্য, বিত্ত-বৈভব, আত্মকেন্দ্রিকতা, পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দকে প্রাধান্য দেয়া, সব কিছুর উপর দুনিয়াকে ভালোবাসা ইত্যাদি। যখন কোনো পরাশক্তির অভ্যন্তরে সভ্যতা বিনাশী এই উপাদানগুলো ব্যাপক আকারে দেখা দেয় এবং ওগুলোর একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে তখন ওই পরাশক্তির পতনের গতিও বেড়ে যায়। এই উপাদানগুলো কখনো খুব চাঙ্গাভাবে থাকে, আবার কখনো এমন দূর্বলভাবে থাকে যা ক্রিয়াশীল হতে আরেকটি ‘সাহায্যকারী উপাদান’ এর দরকার হয়। এগুলো পাওয়া গেলে ওই পরাশক্তি ও তার কেন্দ্রীয় ক্ষমতার পতন ঘটতে থাকে, সে যত বড় সামরিক শক্তিধরই হোক না কেন। কেননা যেমনটি আমরা বলেছি যে, সুবিশাল সামরিক ক্ষমতা ও ভয়াবহ মিথ্যা প্রচারণার জোরে অর্জিত তাদের ‘কেন্দ্রীয়-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা’ কেবল তখনই কার্যকর হতে পারে যখন [কেন্দ্র রাষ্ট্রের] ‘সামাজিক সৌহার্দ্য ও একাত্মতা’ বজায় থাকবে।

[আল্লাহর অলংঘনীয় ফায়সালা]

কেমন হবে যদি সেই ‘সাহায্যকারী উপাদান’টি হয় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অলংঘনীয় ফায়সালা যা এই তিন অক্ষের [সুবিশাল সামরিক ক্ষমতা, ভয়াবহ মিথ্যা প্রচারণা এবং সভ্যতা বিনাশকারী উপাদান] উপর ক্রিয়াশীল হবে? তখন তা সভ্যতা বিনাশকারী দূর্বল উপাদানগুলোকে শুধু যে চাঙ্গা করবে তাই নয়, বরং শত্রুর সুবিশাল সামরিক শক্তির মোকাবিলা করে তাকে নিঃশেষ করে ছাড়বে। ফলে এই মোকাবিলা ও নিঃশেষকরণ- তিন অক্ষের একটি অর্থাৎ তাদের মিডিয়া ভিত্তিক যে ভয়াবহ মিথ্যা প্রচারণা ছিল, তার উপর প্রভাব ফেলতে শুরু করবে। এতে করে পরাশক্তির গায়ে লেগে থাকা অদম্য -অপ্রতিরোধ্যতার আবরণ -যার দরুন তার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না বলে মনে হত - খসে পড়তে শুরু করবে।

ঠিক এমনটাই ঘটেছিল কমিউনিস্ট পরাশক্তি [রাশিয়ার] ক্ষেত্রে, যখন তাকে সরাসরি সামরিক মোকাবিলায় সম্পৃক্ত করা হয়েছিল এমন এক প্রতিপক্ষের [আফগানদের] সাথে যার ক্ষমতা ছিল তার তুলনায় বহু গুণ কম, বরং বলা যায় তারা তুলনাযোগ্যও ছিল না। কিন্তু [আশ্চর্য্যের ব্যাপার হল] সেই দুর্বল শক্তিটিই তাকে সামরিক দিক দিয়ে নিঃশেষ করে বিজয়ী হয় এবং তার চেয়ে বড় কথা হল, ওই পরাশক্তির মূল ভূখন্ডে সভ্যতা ও সংষ্কৃতি বিনাশকারী উপাদানগুলো সক্রিয় হয়ে উঠে। সে উপাদানগুলো ছিল নিম্নরূপ:

• নাস্তিকতা বনাম আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস [আফগান মুজাহিদদের] ,
• দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং দুনিয়াবী বিনোদন ও বিত্ত-বৈভবের প্রতি
ভালোবাসা, আর অপরদিকে এমনকিছু মানুষ যাদের হারাবার কিছু নেই [আফগান মুজাহিদদের] ,
• চারিত্রিক অবক্ষয় - যার ছোট্ট পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল যখন যুদ্ধ শেষে রাশিয়ান
অফিসার ও সৈন্যরা তাদের ঘরে ফিরে গিয়ে দেখতে পায় যে, তাদের স্ত্রীরা অন্য পুরুষদের থেকে সন্তান নিয়েছে অথবা অন্য কারো সাথে পরকীয়ায় লিপ্ত।
• [ অর্থনৈতিক সংকট] - সামাজিক অনাচার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যখন যুদ্ধের কারণে
অর্থনৈতিক অবস্থা অবনতির দিকে চলে যায়। যখন সম্পদ কমে আসে এবং অর্থনৈতিক
সঙ্কট দেখা দেয় তখন বড় বড় চোর প্রকাশ পেতে শুরু করে, বিশেষ করে যখন যথাযথ
হিসাব নেওয়া শুরু হয়।

উপরন্তু আর লক্ষ্যণীয় যে, যুদ্ধের কারণে অথবা সরাসরি অর্থনীতিকে লক্ষ্য করে হানা আঘাতসমূহের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সঙ্কট হল, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিনাশকারী উপাদানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর ফলে বিলাসিতা ও বিনোদন – যার প্রতি ওই সমাজের মানুষগুলো মুখিয়ে থাকে- হুমকির মুখে পড়ে। ফলে অর্থনৈতিক দূর্বলতার কারণে যখন এই জিনিসগুলো দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠে তখন ওগুলোর জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। একইভাবে অর্থনৈতিক দূর্বলতার কারণে সামাজিক অনাচার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, যেগুলো হয়তো যুদ্ধকে উস্কে দেয় বা সেই রাষ্ট্রে রাজনৈতিক গোলযোগের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে অনৈক্য সৃষ্টি করে।

[আফগান যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া]

একইভাবে এই দূর্বল শক্তিটি [আফগান শক্তিটি] সোভিয়েত কক্ষপথে থাকা এশিয়া ও ইউরোপের দেশগুলোর সাধারণ জনগণের অন্তর থেকে রাশিয়ান সেনাবাহিনীর উপর থাকা উচ্চধারনা অপসারনের মাধ্যমে প্রতারনাপূর্ণ প্রচার মাধ্যমের উপরও প্রতিক্রিয়া ফেলে। ফলশ্রুতিতে একের পর এক [তাবেদার রাষ্ট্রগুলো] ছুটে যেতে শুরু করে ও [তার অধীনে থাকা রাষ্ট্রগুলো] তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে।

এই দুর্বল শক্তিটি মুসলিম উম্মাহ’র সাথে সংশ্লিষ্ট চতুর্থ আরও একটি বিশেষ অক্ষের উপর ক্রিয়াশীল হয়েছিল। আর তা ছিল গোটা মুসলিম উম্মাহর অন্তরে ঈমান ও জিহাদের পুনঃজাগরণ, যেই মুসলিম উম্মাহ দীর্ঘ দিন ধরে এই পরাশক্তির অবকাঠামোর অধীনে নতিস্বীকার করে রয়েছিল। কিন্তু তারা যখন তাদেরই পাশে থাকা দরিদ্র আফগানদের মাধ্যমে জিহাদের উদাহরণ দেখতে পেল, যারা কিনা গোটা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক অস্ত্রের অধিকারী এবং সবচেয়ে হিংস্র সেনাবাহিনীর মোকাবেলায় অটল ও অবিচল থাকতে সক্ষম হয়েছিল [তখনই তাদের মাঝে পুনঃজাগরণ হয়। বলা যায় তারা যেন নিজেদের হুঁশ ফিরে পায়] এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, পরবর্তীতে এমন এমন ভূমিতেও জিহাদ শুরু হয়েছিল যেগুলোর নাম অধিকাংশ মুসলমানরা জানতই না, যেমন-চেচনিয়া, তাজিকিস্তান ইত্যাদি।

[শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.র ভবিষ্যদ্বাণী]

এ যাবৎ আমি যা কিছু লিখলাম তা [কোন গালগল্প নয় বরং সবই] বাস্তব ঘটনা। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, সঠিক ইলম ও অন্তঃর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য এ কথা বুঝা এখন একদম সহজ হয়ে গেছে যে, কেউ যদি হিম্মত করে যুদ্ধের ময়দানে নেমে যায় তাহলে আল্লাহ তাআ’লা তার উপর কীভাবে সাহায্য নাযিল করেন। উদাহরণ স্বরূপ, সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ (আমরা তাঁর সম্পর্কে এমনই ধারনা করি) রহ. সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ব্যাপারে পর্যালোচনা করেছিলেন এবং পতনের কিছু সূত্র বা কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন, যেগুলো তাকে ধীরে ধীরে পতনের দিকে নিয়ে যাবে। যদিও সুনির্দিষ্টভাবে বা বিস্তারিত ভাবে পতনের সময়টা তিনি বলতে পারেননি। একই সময়ে শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.ও (যিনি আল্লাহর ইচ্ছায় সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের আগেই শাহাদাত বরণ করেছিলেন) একটি পর্যালোচনা করেছিলেন, যেখানে তিনি এই বিরাট সাম্রাজ্যের পতনের কথা বলেছিলেন এবং এর প্রজাতন্ত্রগুলো বিভক্ত হয়ে কিছু কিছু প্রজাতন্ত্রে ইসলামী জিহাদী আন্দোলনের গোড়াপত্তন হবে, এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

অতি আশ্চর্যের বিষয় হল, এই বিশ্লেষণটি তিনি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি রাশিয়ান সেনাবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা হিসেব করেছিলেন যা ছিল ওই সময় বিশ্বের সবচেয়ে তুখোড় যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত একটি আর্মি, যা আমেরিকান আর্মির চেয়েও আকারে বড় ও নিষ্ঠুর ছিল এবং যে বাহিনীটি যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং সৈন্য হারানোর পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার সবচেয়ে বেশি সক্ষমতা রাখতো। আরও আশ্চর্যের বিষয় হল, শাইখের পর্যালোচনাটি আফগানিস্তান থেকে রুশ সেনাদের প্রত্যাহারের উপর ভিত্তি করেও ছিল না, [যদিও এটা তাঁর কামনা ছিল], বরং তিনি মনে করেছিলেন, মুজাহিদদের চাপে রাশিয়া আরও বেশি সংখ্যক সৈন্য আফগানিস্তানের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে আসবে, যা তাদের রিজার্ভ সৈন্য সংখ্যা কমিয়ে দেবে আর এই চাপ ও সৈন্য হ্রাস রাশিয়ার ভেঙ্গে যাওয়াকে ত্বরান্বিত করবে। বিশেষ করে ইসলামী প্রজাতন্ত্রগুলোর জনগণ তখন আফগান ঘটনাটিকে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে একটি কার্যকরী কৌশল (মডেল) হিসাবে দেখবে। তিনি যা যা বলেছিলেন তা প্রায় সবই বাস্তবে ঘটেছিল। ঠিক যেন সিনেমার মতো!

এ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, আমাদের যুক্তি আর তাত্ত্বিক গবেষণা যাই বলুক না কেন শত্রুর সক্ষমতা ও পরাজয়ের প্রতিশ্রুত সময় শুধুমাত্র তখনই অনুধাবন করা যাবে যখন সরাসরি তার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া হবে।

এখানে আমরা লক্ষ্য করি যে, এই পরাশক্তির [রাশিয়া] পতনের ফলে এর প্রজাতন্ত্রগুলোতে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কিছু সহযোগী উপাদান পাওয়া যাওয়ায় অধিকাংশ রাষ্ট্রেই খুব দ্রুত প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই রাষ্ট্রগুলোকে নৈরাজ্যের ব্যবস্থাপনা ধাপের ভিতর দিয়ে যেতে হয়নি এবং কিছু রাষ্ট্র বর্তমান সময় পর্যন্ত স্থিতিশীলতা অর্জনে [বা ধরে রাখতে] সক্ষম হয়েছে।

চেচনিয়া এবং আফগানিস্তানে (আফগানিস্তান সোভিয়েতের কোন প্রজাতন্ত্র ছিল না) রাষ্ট্র গঠনে নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা সফল হয়েছিল। তবে বর্তমানে এগুলোতে আবার পতন ঘটানো হয়েছে। বরং বলা চলে, তাদেরকে পুনরায় নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার আগের ধাপে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে, যাকে বলা হয় ‘তটস্থঃকরণ ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ’ ধাপ।

আমরা আরও দেখি যে, এই দেশ দুটির ঘটনা প্রবাহ দাগিস্তানের ঘটনা কিংবা ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার কারণে হয়নি। যদিও এই অভিযানগুলো হয়তো সেখানে নৈরাজ্য সৃষ্টির বিষয়টিকে ত্বরান্বিত করেছে। এ সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা বেশ দীর্ঘ, ইতিপূর্বে আফগানিস্তান সম্পর্কিত আলোচনায় কিছুটা ইঙ্গিত করেছি।

[রাশিয়া থেকে আমেরিকা]

এভাবেই সেই পরাশক্তির (রাশিয়া) পতন হল। কিন্তু শয়তানী সভ্যতা অপর পরাশক্তি আমেরিকার মাধ্যমে খুব দ্রুতই পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম হলো এবং বিশ্বব্যাপী তার শাসনকে অব্যাহত রাখলো, ফলে আমেরিকা সাধারণভাবে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র ও সুনির্দিষ্টভাবে এ মহাদেশের রাষ্ট্রগুলোর সাথে মিলে আগে যা দুই পরাশক্তি নিয়ন্ত্রণ করতো সেটা সে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করলো।

কিছু কিছু বিশ্লেষকদের মতে (তারা ধার্মিক হোক বা অধার্মিক) এর ফলে এই পরাশক্তির আনুগত্যে আসা রাষ্ট্রগুলোর সংকট আরো ঘনীভূত হলো। তাদের ধারণা, অবশিষ্ট এই পরাশক্তি (আমেরিকা) আরও দুর্ধর্ষ ও মারমুখী হবে এবং তার ক্ষমতার উপাদানগুলোতে পূর্বের পরাশক্তির চেয়ে আরও ভিন্নতা থাকবে। বিশেষ করে মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের ভয়ঙ্কর মিথ্যা প্রচারণা পূর্বের পরাশক্তির চেয়ে বহুগুণ বেশি হবে।

কিন্তু প্রকৃত ঈমানদার ও জিহাদী ব্যক্তিগণ যাদেরকে আল্লাহ তাআলা [আফগানিস্তানের ময়দানে] কিছু দেখিয়েছেন যা তাঁদের অন্তরে গেঁথে গিয়েছিল তাঁরা বললেন, এখনকার শত্রু বরং (আগের শত্রুর তুলনায়) আরও বেশি দুর্বল ও নগন্য। আল্লাহর ইচ্ছায় একে পরাস্ত করা মোটেই অসম্ভব নয়।

[দুটি কারণে আমেরিকাকে পরাজিত করা আরও সহজ]

[১ম কারণ]

[আফগান জিহাদের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন] এই দলটি সাধারণ মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলতে থাকেন, হে ভাইয়েরা! আমেরিকান সৈন্যদের চেয়ে রাশিয়ান সৈন্যদের হিংস্রতা আরও বহুগুণ বেশি ছিল। যদি আফগানিস্তান ও চেচনিয়ার যুদ্ধের ময়দানে খতম করা রুশ সৈন্য সংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ আমেরিকার সৈন্যকেও খতম করা যায় তাহলে তারা আর কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা পালাতে শুরু করবে। কারণ, আমেরিকা ও পশ্চিমা মিলিটারিদের বর্তমান অবস্থা আগেকার ঔপনিবেশিক যুগের সৈন্যদের মতো নেই। তারা বিলাসী হয়ে গেছে। ফলে দীর্ঘ সময়ের জন্য যুদ্ধের ময়দানের কঠোরতা সহ্য করতে তারা অপারগ। এই কমতি তারা পূরণ করে মিডিয়ার ভয়াবহ মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে।

[২য় কারণ]

হে ভাইয়েরা! সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্র যুদ্ধরত দেশগুলো থেকে অনেকটা কাছাকাছি ছিল। বরং সেসব দেশের অনেকগুলোর সাথে তাদের যৌথ সীমানাও ছিল। যার ফলে বড় কোন খরচ ছাড়াই রসদ, মোটরযান বাহিত সামরিক ইউনিট, সামরিক ট্যাঙ্ক ইত্যাদি খুব সহজেই এসব

[illegible], [illegible], [illegible] [[illegible] ~~[illegible]~~] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible]- [illegible], [illegible]

**[[illegible]]**

[illegible], [illegible],

[illegible]

[illegible] [[illegible]] [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible], [illegible] ‘[illegible]-[illegible]’ [illegible], [[illegible]] [illegible],

[illegible] [[illegible]]

[illegible], [illegible]

জিহাদী জাগরণ আন্দোলনে যোদ্ধা সরবরাহ কখনই বন্ধ হবে না [ইনশাআল্লাহ]। বিশেষত যখন সমাজের অসচেতন জনগোষ্ঠির কাছে –সমাজে যাদের সংখ্যাই বেশি– উম্মাহর শত্রুদের পক্ষে মুরতাদ শাসকদের দালালি করার প্রকৃত চিত্র এমনভাবে ফাস হয়ে যাবে যে, প্রতারণাপূর্ণ কোনো মুখোশই তখন কাজে আসবে না এবং এসব সরকার ও তাদের সহযোগীদের মুসলিম বলে দাবি করার মত কোনো যুক্তিই আর বাকি থাকবে না।

তৃতীয় লক্ষ্য হল, আমেরিকাকে চাপে ফেলে মিডিয়া দ্বারা পরিচালিত মনস্তাত্বিক যুদ্ধ বা প্রক্সি যুদ্ধ ছেড়ে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ করার মাধ্যমে তার কেন্দ্রীয় ক্ষমতার দুর্বলতাকে প্রকাশ করে দেওয়া। এর ফলে দ্বিধাগ্রস্ত সকল শ্রেণি ও গোষ্ঠীর কাছে, এমনকি খোদ আমেরিকার জনগণের কাছেও স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, [দখলকৃত বা হামলাকৃত] প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মূল কেন্দ্রের দূরত্ব (ওখানে) নৈরাজ্য এবং বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ার মূল কারণ।

প্রথম অধ্যায়

নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা ও ইতিহাস থেকে তার উদাহরণ

আমরা উপরে আলোচনা করে এসেছি যে, কেউ যদি বিগত শতাব্দীগুলোর দিকে [বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত] গভীর ভাবে লক্ষ্য করে তাহলে দেখবে যে, যখন কোনো বড় রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যের পতন ঘটে – হোক তা ইসলামিক অথবা অনৈসলামিক- এবং পূর্বের ন্যায় বা এর কাছাকাছি শক্তি অর্জনে ব্যর্থ হয়ে তার ভূমি ও অঞ্চলসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে না পারে, তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই এ রাষ্ট্রের ভূমি ও অঞ্চলগুলো নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার অধীনে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি ধারণ করে। অতএব সংক্ষেপে নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা হল, ‘অস্থিতিশীল বিশৃংখল পরিস্থিতির ব্যবস্থাপনা’।

[কোন অঞ্চলে বা লোকালয়ে যেখানে কৌশলগত দিক থেকে সুবিধা পাওয়া সম্ভব (Strategically and Tactically viable) সেখানে একটি রাজনৈতিক শুন্যতা ও পরে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করা হয়, যেখানে স্বীকৃত বা অস্বীকৃত কোন রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক শাসন কাঠামোর কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকে বা সেটি নিয়ন্ত্রণহীন করে ফেলা যায় ও চরম বিশৃংখলাপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করে বা করানো যায় এবং উক্ত দূর্বল অবস্থাকে যদি সক্ষমতা অনুযায়ী নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে, নিজ দলের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, টেকসই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও পূনর্গঠনের মাধ্যমে, ভবিষ্যতে নিজস্ব মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার অনুকূলে ব্যবহার করা যায় তাহলে এই পুরো কার্যক্রমকে একত্রে‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা’ বলা যায়। অর্থাৎ, প্রথমে নৈরাজ্য তৈরি করে একটি দেশ বা অঞ্চল কে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোগত ভাবে ভেঙ্গে চুরমার করে ( collapse করে) তাকে নিজের মত করে গুছিয়ে নেওয়ার (ম্যানেজ করার) নামই হল ম্যানেজমেন্ট অফ স্যাভেজারি বা ' নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা' । - অনুবাদক]

এর বিস্তারিত সংজ্ঞা ব্যবস্থাপনায় থাকা লোকদের প্রকৃতি ও লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হয়। আমরা যদি এই ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়টি ভেবে দেখি তাহলে দেখবো যে, এই ব্যবস্থাপনার কাজ হলো, নৈরাজ্য অঞ্চলগুলোতে বসবাসকারীদের খাদ্য ও চিকিৎসার চাহিদা পূরণ করা, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সে অঞ্চলে বিচারাচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে সীমান্তকে নিরাপদ রাখা এবং যারাই এই নৈরাজ্যপূর্ন অঞ্চলে অনাচার তৈরির চেষ্টা করবে তাদেরকে প্রতিহত করা, প্রতিরক্ষামূলক টাওয়ার ও অন্যান্য স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি।

ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে জনগণের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের পাশাপাশি কখনো কখনো শিক্ষা ও আরও অন্যান্য সেবা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হতে পারে। কখনো আবার নৈরাজ্যপূর্ন অঞ্চলের পরিধি আরও বিস্তৃত করার জন্য নিরাপত্তা ও সীমান্ত রক্ষার কার্যক্রম করা লাগতে পারে।

কেন আমরা একে ‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা’ বা ‘অস্থিতিশীল বিশৃংখল পরিস্থিতির ব্যবস্থাপনা’ বলছি এবং কেন কেবল ‘বিবাদ মিটিয়ে ফেলা’ বলছি না? কারণ, এটি নিছক কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিবাদ মিটানোর মতো ব্যাপার নয়, আর না এটি কোন আবাসিক এলাকা বা জেলায় প্রতিবেশীদের মধ্যে কোন্দল মিটানোর মতো কোন ব্যাপার, এমনকি এটি সামাজিক পরিসরে দেখা দেয়া কোন বিশৃংখলা বা বিবাদ মিটানোও নয়। বরং এটি এ জাতীয় বিবাদ মিটানোর চাইতে আরও অনেক বেশি ঘোলাটে [একদম নিয়ন্ত্রণহীন একটি] অবস্থা, বিশেষ করে ঐতিহাসিক উদাহরণ ও বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে, যার আলোকে এখানে আমরা আলোচনা করব [ইনশাআল্লাহ]। আমরা সম্পদ, লোভ-লালসা, বিভিন্ন ধরনের প্রভাবক বল ও মানব মনের চরিত্র ও গতি-প্রকৃতির দৃষ্টিকোণ থেকেও নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা আসলে কী? তা নিয়েও আলোকপাত করবো।

কোন একটি গোলযোগপূর্ণ অঞ্চল ব্যবস্থাপনার আওতায় আসার আগ মুহুর্ত পর্যন্ত এমন অবস্থায় থাকে যেমনটি ছিল তালেবান শাসনামলের আগে আফগানিস্তানের অবস্থা। যা প্রাথমিক পর্যায়ে জঙ্গলী আইনের আওতায় থাকে। যার ভালো মানুষগুলো তো বটেই, খারাপদের মাঝে যারা বুদ্ধিমান তারাও উন্মুখ হয়ে থাকে যে, কেউ এসে এই নৈরাজ্য পরিস্থিতির একটা ব্যবস্থা করুক। এসময় তারা ভালো হোক বা মন্দ যে কোন দলকেই মেনে নিতে উদগ্রীব থাকে। তবে মন্দ লোকরা যদি এই ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেয় তাহলে খুবই স্বাভাবিক যে, ওই এলাকাটি আরও বিশৃঙ্খলতার দিকে গড়াবে।

‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা’ মিশনের কাঙ্খিত আদর্শ রূপরেখা

ইতিপূর্বে সাধারণভাবে নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক পর্যায়ের করণীয়গুলো কী কী, তা ব্যাখ্যা করেছিলাম। তবে এখন পরবর্তী প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার কাঙ্খিত আদর্শ রূপটির জন্য করণীয়গুলো কী কী তা পরিষ্কার করতে চাই, যেগুলো শরীয়ার উদ্দেশ্যের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ। করণীয়গুলো নিম্নরূপঃ

১। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা।

২। খাদ্য ও চিকিৎসা সেবার পূর্ণ ব্যবস্থা করা।

৩। প্রতিরক্ষা চৌকি নির্মাণের মাধ্যমে এবং উত্তরোত্তর সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার আওতায় থাকা অঞ্চলকে শত্রুর লুটতরাজ থেকে সুরক্ষিত রাখা।

৪। উক্ত অঞ্চলে বসবাসরত জনগণের মাঝে শরয়ী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

৫। উক্ত অঞ্চলের যুবকদেরকে সব রকমের প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যেন তাদের ঈমানী অবস্থার উন্নতি হয় এবং যুদ্ধ-দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং জিহাদের গুরুত্বের ব্যাপারে সচেতন করে সমাজের সকল স্তরের লোকদের সমন্বয়ে একটি লড়াকু জিহাদি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

৬। দ্বীনি ইলম ও দুনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞান উভয়টিকে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া (বেশি গুরত্বপূর্ণ বিষয়গুলো, অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর আগে ছড়ানো)

৭। গোয়েন্দা ছড়িয়ে দেওয়া এবং একটি ছোটখাট গোয়েন্দা সংস্থা গঠনে তৎপর হওয়া।

৮। কিছু পার্থিব সুবিধা ও অর্থ ব্যয় করার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের অন্তর আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করা। তবে এটি হবে শরয়ী নীতিমালার ভিত্তিতে, যা কমপক্ষে ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সদস্যদের কাছে স্পষ্ট থাকবে।

৯। মুনাফিকদেরকে দলিল-প্রমাণ ও অন্যান্য উপযুক্ত উপায়ে প্রতিহত করা এবং তাদের উপর এতটুকু চাপ প্রয়োগ করা যেন তারা নিজেদের মুনাফিকি এবং তাদের সংশয় উদ্রেককারী মতামতগুলো লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হয় এবং এ উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে যারা গণ্যমান্য তাদের কিছুটা খাতির করা যেন তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

১০। ক্রমাগত উন্নয়ন করতে থাকা, যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্যবস্থাপনার আওতাভূক্ত এলাকার পরিধি সম্প্রসারণ করা, শত্রুকে ঘায়েল করতে আক্রমণ করা, তাদের অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া এবং তাদেরকে সর্বদা আতংকের মধ্যে রেখে আপোস-রফায় আগ্রহী করার মতো যথেষ্ট পরিমাণ সক্ষমতা অর্জিত হয়।

১১। আমাদের ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সাথে যারা পূর্ণ একাত্মতা জানায়নি তাদের মধ্য হতে যাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করা বৈধ তাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করা।

নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক কিছু উদাহরণ

• মদীনায় হিজরতের পর প্রথম কয়েকটি বছর

ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে নৈরাজ্য পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনা করতে হয়েছে। এর প্রথম উদাহরণটি ছিল, মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সূচনা লগ্নে। বাইজ্যান্টাইন ও পারসিয়ান সাম্রাজ্য এবং আরব উপদ্বীপের সীমান্ত সংলগ্ন কিছু বড় ও ছোট রাষ্ট্র ছাড়া বাকি অঞ্চলগুলোতে যেই গোত্রীয় শাসন চলতো তা অনেকটা নৈরাজ্য পরিস্থিতির ব্যবস্থাপনার মতই ছিল। মদীনা যুগের প্রথম পর্যায়ে - অর্থাৎ মদীনা স্থিতিশীল হওয়া এবং রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যাকাত ও জিযিয়া আসা শুরু করা এবং চারপাশের অঞ্চলসমূহের স্বীকৃতি লাভ করা এবং গভর্ণর ও শাসক নিয়োগ দানের পূর্বের সময়টাতে - মদিনা রাষ্ট্রটি নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয়েছে। অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের পূর্বে মদীনায় [আক্ষরিক অর্থে] নৈরাজ্য বা বিশৃংখলা হয়তো ছিল না, কিন্তু মদীনা রাষ্ট্রটি তখন আউস ও খাযরাজ গোত্র দ্বারা শাসিত হচ্ছিল, যা নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা আরোপযোগ্য একটি শাসন ব্যবস্থাই ছিল বটে। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরত করে গেলেন এবং সেখানকার নেতৃত্ববৃন্দ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করল ঠিক তখন মদীনা রাষ্ট্রটি মুসলমানদের দ্বারা যেভাবে পুনর্গঠন হওয়া শুরু হল সেই ব্যবস্থাপনাকে নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার সর্বোত্তম উদাহরণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যার বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

• ইসলামের বাকি সময়ের ইতিহাসে এমন বহু ক্রান্তিকাল পার হয়েছে যখন এক
খিলাফাহ ভেংগে পড়েছে তো আরেক খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে কিংবা আমরা যখন
তাতার এবং ক্রুসেডারদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি। এরূপ সংকটময় সময়গুলোতে এ ধরণের ব্যবস্থাপনা (নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা) সংঘটিত হয়েছে। কখনো দেখা গেছে ক্রমান্বয়ে উন্নতি করতে করতে কোন কোন ‘ব্যবস্থাপনা প্রশাসন’ একটা ছোট্ট রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে, অতঃপর ধীরে ধীরে একসময় খিলাফাহ
প্রতিষ্ঠার জন্য তারা একত্রিত হয়েছে বা অন্যান্য রাষ্ট্র কিংবা খিলাফার পাশে আরও একটি রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য তারা সমবেত হয়েছে। এর সবচেয়ে

পরিষ্কার উদাহরণ হল, ক্রুসেড যুদ্ধগুলোর সময়কার অবস্থা, যেমনটি শাইখ ওমর মাহমুদ আবু ওমর (আল্লাহ তাঁকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করুন) উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন,

“বেশিরভাগ যারাই ওই সময়টা নিয়ে [অর্থাৎ ক্রুসেড যুদ্ধের সময়টা নিয়ে] লেখালেখি করেছেন তারা কতিপয় এমন ব্যক্তিদের কথা তুলে ধরেছেন যারা সেই যুদ্ধে আগে থেকে চলে আসা নানাদিকের বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টাগুলোকে সমন্বিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিলেন। সুতরাং আমরা কোনো লেখককে দেখি তিনি মহান নেতা নূরুদ্দীন যিংকী রহ. বা সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহ.কে কেন্দ্র করে ক্রুসেড যুদ্ধের আলোচনা করেছেন, এবং এভাবে এরূপ আরও অনেকের বীরত্বগাঁথাকে কেন্দ্র করে আলোচনা করেছেন। এর ফলে ইসলামী ইতিহাসের এ অধ্যায়টি পড়তে গিয়ে পাঠক না জেনেই ধরে নেন যে, ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অভিযানগুলো এমন রাষ্ট্রীয়ভাবে সমন্বিত আকারে পরিচালিত হয়েছিল, অথচ এটি পরিষ্কার ভুল।

তবে যেসকল পাঠক গভীর দৃষ্টিতে তখনকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন তিনি দেখবেন যে, সে সময়ে মুসলিমরা ছোট ছোট গ্রুপের মাধ্যমে এবং পৃথক পৃথক বিচ্ছিন্ন সংঘের মাধ্যমে ক্রুসেডারদের মোকাবেলা করেছিল। যেমন, কোথাও হয়তো একটি পরিবারের নিয়ন্ত্রণে একটি দূর্গ ছিল, যাদের নেতৃত্বে কিছু মানুষ একত্রিত হয়েছিল। আবার কোথাও কোনো গ্রামের লোকজন নিজেদের মধ্যকার কোন আলেমকে নিজেদের নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছিল এবং তাঁর সাথে মিলে জিহাদ করেছিল। কোথাও আবার কোনো আলেমের ছাত্ররা তাঁর সাথে মিলে সংঘবদ্ধ হয়েছিল এবং তাকে নেতা মেনে নিয়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিল। (এমন আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে।) সম্ভবত এসব পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্র যে গ্রন্থটি আমাদের সামনে তুলে ধরবে তা আমীর উসামা বিন মুনকিযের ‘আল-ই’তিবার’ গ্রন্থ। এই উসামা ছিলেন শায়জার দূর্গের বাসিন্দা। মুনকিযের বংশধররাই পর্যায়ক্রমে ওই দূর্গের শাসক ছিল। ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় যাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। আর উসামা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সেসব যুদ্ধের একজন প্রত্যক্ষ্যদর্শী সাক্ষী ছিলেন।

আমি পরবর্তী পয়েন্টে যাওয়ার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি। (ক্রুসেড যুদ্ধে) নূরুদ্দীন যিংকী রহ. কিংবা সালাউদ্দীন আইউবী রহ. এর মত বেশিরভাগ বড় বড় নেতাদের ভূমিকা ছিল ছোট ছোট দল ও উপদলগুলোকে একত্রিত করা এবং একটি বৃহৎ দলে পরিণত করা। এরপরও দেখা যায় যে, ক্রুসেড যুদ্ধে ওসব ছোট ছোট দল বা উপদলগুলোই বৃহৎ ভূমিকা রেখেছিল।” [5]

এসব ছোট ছোট দলগুলোর কথা পূর্বে অতিবাহিত বলা হয়েছে, যারা কিছু দূর্গ ও ছোট ছোট শহর নিয়ন্ত্রণ করতো এবং একই সময়ে শত্রুর উপর ‘তটস্থঃকরণ ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণমূলক’ বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করতো।

পাঠক চাইলে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধগুলো নিয়ে লেখা বইগুলোর প্রতিটি লাইন পড়ে দেখুন, আপনি বুঝতে পারবেন, একদল আলেম ও মুজাহিদদের দ্বারা পরিচালিত ‘শত্রুর ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ মূলক’ অভিযানগুলো কীভাবে বৃহৎ যুদ্ধগুলোতে বিজয় অর্জনের দরজা খুলে দিয়েছিল। এ বিজয় কেবল ওই বৃহৎ যুদ্ধগুলোর অবদান ছিল না। বৃহৎ যুদ্ধগুলোতে (যেমন হিত্তীনের যুদ্ধে) বিজয় অর্জন হয়েছিল ওসব ছোট ছোট যুদ্ধের কারণেই, যেগুলোর কথা ইতিহাসে খুব কমই এসেছে। যদিও ওগুলোই ছিল বৃহৎ যুদ্ধে বিজয় অর্জন করার মূল কারণ। [6]

• নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার উদাহরণগুলোর মধ্যে আশ্চর্যজনক একটি উদাহরণ দিয়েছেন শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে মাত্র একশত মুসলিম একটি পার্বত্য এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল, যে এলাকাটির অবস্থান ছিল বর্তমান ইটালী ও ফ্রান্সের মাঝামাঝি। সেখানকার আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চলেও তারা জিযিয়া-করের মতো একটি ব্যবস্থা চালু করতে সক্ষম হয়েছিল। এ নিয়ন্ত্রণ তারা অনেক দিন যাবৎ ধরেও রেখেছিল।

[সাইয়িদ আহমদ শহীদ রহ.র আন্দোলন]

• একইভাবে ইমাম সাইয়্যেদ (আহমদ শহীদ) রহ.র আন্দোলন হিন্দুস্তানের বিভিন্ন এলাকায় নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা করেছিল, বরং ধারাবাহিক অগ্রগতির মাধ্যমে ব্যবস্থাপনাকৃত কয়েকটি অঞ্চলের সমন্বয়ে কিছুকালের জন্য প্রায় একটি
রাষ্ট্র গঠন করে ফেলেছিল। এই আন্দোলন ভারত, কাশ্মীর, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের সুন্নিদের মধ্যে তাওহীদ ও জিহাদের দাওয়াতের নবজাগরণ তৈরি করেছিল। কাঠামোগতভাবে যদিও এই আন্দোলনের সময়কাল বেশ সংক্ষিপ্ত ছিল -মাত্র ঊনিশ শতকের শুরু থেকে নিয়ে তার মাঝামাঝি সময়ের কিছুকাল পর পর্যন্ত টিকে ছিল- তথাপি এর একটি সূদুর প্রসারী প্রভাব ছিল, যা আজ অবধি বিদ্যমান। বরং তৎকালীন সময়ে আল্লাহর সবচেয়ে বড় শত্রু ইংরেজদের বিরুদ্ধে (ইমাম সাইয়িদ রহ.র) নেওয়া একশনগুলোকে বর্তমান কাশ্মীর, ভারত এবং আফগানিস্তানের জিহাদী আন্দোলনগুলোর উৎসাহ-উদ্দীপনার উৎস বিবেচনা করা হয়। তাঁর এ আন্দোলনের প্রভাব এতটাই গভীর ছিল যে, সম্ভবত বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারত থেকে পাকিস্তানের পৃথক হওয়ার ঘটনাও এরই ফসল, যদিও পরবর্তীতে পাকিস্তান সরকারের (যারা এই জিহাদের ফল তুলেছিল) রাজনৈতিক বিচ্যুতি ঘটে। আফগান মুজাহিদীনরা
আজ অবধি ইমামের জীবনী থেকে অনুপ্রেরণা নেন আর নিবেনই না কেন- তিনি যে আফগানিস্তানের পাহাড়গুলোকে চিনতেন আর পাহাড়গুলোও তাঁকে চিনতো, [এতটাই
ময়দান ভিত্তিক বর্নাঢ্য জিহাদী জীবন ছিল তাঁর! ]

[কুফফার কর্তৃক নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা]

উপরোল্লিখিত নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার সবগুলো উদাহরণই হল মুসলিমদের। এছাড়া ইতিহাসে কাফেরদের নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার ডজন ডজন না, বরং শত শত উদাহরণ রয়েছে ইউরোপ, আফ্রিকা এবং অন্যান্য মহাদেশ জুড়ে।

আধুনিক যুগে এসে নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ ধরণের প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে গেছে। বিশেষ করে সাইকস-পিকট (Sykes–Picot) চুক্তি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এর অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন, জাতিসংঘের আবির্ভাব এবং জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলোর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী জাহিলী শক্তি তার নিয়ন্ত্রণকে পাকা- পোক্তকরণ, কাগজের মুদ্রা প্রচলন এবং বদ্ধ সীমানা রেখা যাকে রাষ্ট্র বলা হয়-এসবের কারণে বেশ কঠিন হয়ে গেছে। তারপরও বেশ কিছু নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বিশেষকরে কেন্দ্র বা মূল ভূখণ্ড হতে দূরবর্তী স্থানগুলোতে, যেগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান এ ধরনের ব্যবস্থাপনার জন্য উপযোগী ছিল।

[নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার সমসাময়িক কিছু উদাহরণ]

সমসাময়িক কিছু কিছু গ্রুপের নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার কিছু উদাহরণও রয়েছে, হোক গ্রুপগুলো ইসলামী বা বামপন্থী অথবা অন্য কোন মতাদর্শের। আফগান জিহাদের প্রথম দিকে লড়াইরত গ্রুপগুলো সেখানে নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা করছিল, ইসলামী ব্যবস্থাপনার বাস্তবসম্মত আদর্শিক রূপরেখার সাথে এই ব্যবস্থাপনাগুলোর মিল, অমিল বা বিরোধীতা যা-ই থাকুক না কেন। তেমনিভাবে তালেবানরাও তাঁদের আন্দোলনের প্রথম দিকে ইমারা

প্রতিষ্ঠা করার আগ পর্যন্ত সেখানে নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা করেছিল—আল্লাহ তালেবানদেরকে ক্ষমতার উচ্চাসনে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করুন—।

তেমনিভাবে ফিলিপাইনের আবু সাইয়াফ সংগঠন ও মোরো লিবারেশন ফ্রন্ট, তদ্রুপ নব্বইয়ের দশকে কিছু সময় ধরে চলা আলজেরিয়ার জিহাদী আন্দোলনও নিজ নিজ অঞ্চলে নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা করেছিল (যদিও এদের কারো কারো বিচ্যুতি ঘটেছিল)। তেমনিভাবে সোমালিয়াতে সিয়াদ বারির রাষ্ট্র পতনের পর কিছু ইসলামী গ্রুপ ও অন্যান্য গ্রুপ মিলে নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা করেছিল। তেমনিভাবে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেচনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু সময়ের জন্য [নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা] হয়েছিল।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যনীয়, তা হলো- বর্তমানে ফিলিস্তিনের ‘আল-জিহাদুল ইসলামী’ ও ‘হামাস’ অথবা নব্বইয়ের দশকে মিশরের ‘আল-জামাআতুল ইসলামিয়্যাহ’ বা লিবিয়ার ‘আল-জামাআতুল মুকাতিলাহ’ এবং এ ধরণের আরও অন্যান্য সংগঠনগুলো এখনো পর্যন্ত ‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা’ ধাপটি বাস্তবায়ন করতে পেরেছে বলে আমরা মনে করি না। বরং এসব সংগঠন নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার আগের ধাপেই রয়ে গিয়েছিল। তাদের কেউ কেউ তো আজও সেই ধাপেই রয়ে গেছে। যে ধাপটিকে বলা হয় ‘তটস্থঃকরণ ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ’ ধাপ। সাধারণত ‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা’ ধাপের পূর্বে এই ধাপটি ওই ক্ষেত্রে আসে যখন ‘তটস্থঃকরণ’ ধাপে নিয়োজিত ব্যক্তিদের হিসেব-নিকেশ অনুযায়ী ( তটস্থঃকরণ এর মাধ্যমে) শীঘ্রই নৈরাজ্যপূর্ন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যাবে, আর তখন এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রস্তুতির দরকার হবে, (সাধারণত এমনটাই হয়ে থাকে।) তবে কখনও কখনও কোন কোন গ্রুপ এই হিসেব-নিকেশ না করেই ‘তটস্থঃকরণ ’ পর্বের সূচনা করে ফেলে। কখনও আবার রাষ্ট্রটিকে শুধু দূর্বল করে ফেলার জন্য ‘তটস্থঃকরণ মূলক’ অপারেশন চালাতে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য থাকে, অন্য কোন রাষ্ট্র বা শক্তি এসে দূর্বল হয়ে যাওয়া ওই রাষ্ট্রটিকে দখল করে নিবে এবং কোনরূপ নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে না গিয়েই সেখানে তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে।

সামনের আলোচনায় ‘তটস্থঃকরণ ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ’ ধাপের সংজ্ঞা ও লক্ষ্যগুলো বিশ্লেষণ করা হবে। এটি সেই ধাপ যা আমরা বর্তমানে পার করছি।

[অনৈসলামিক সংগঠনের নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার সমসাময়িক কিছু উদাহরণ]

আমরা এবার সমসাময়িক নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার উদাহরণগুলোর দিকে আবার ফিরে যাই, এবার মূলত অনৈসলামিক আন্দোলনগুলোর উপর মনোযোগ দিব,

• দক্ষিণ সুদানের জন জারঞ্জ আন্দোলন, যা “দ্যা পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্যা লিবারেশন অফ সুদান” নামে পরিচিত।
• মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বামপন্থীদের আন্দোলন। যদিও বামপন্থীরা অপারেশনগত দিক দিয়ে নৈরাজ্যকবলিত এলাকগুলোতে দারুণ সাফল্য অর্জন করেছিল এবং তাদের
কেউ কেউ সেখানে রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল কিন্তু তারা সে
রাষ্ট্রগুলো তাদের অসভ্য রীতিনীতি দ্বারাই শাসন করছিল যা আশেপাশের
অঞ্চলগুলো পছন্দ করেনি। এর ফলে তাদের রাষ্ট্র আরও বিস্তৃত হতে পারেনি।
কেননা চারপাশের রাষ্ট্রগুলোর অধিবাসীরা তাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে ছেড়ে নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনাধীন অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়নি বা কেন্দ্রীয় সরকার
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা রাষ্ট্রও কায়েম করেনি।

এখানে এটুকু জানাই যথেষ্ট যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর তার উপর নির্ভর করে চলা এই আন্দোলনগুলোর অর্থ বরাদ্দ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এসব আন্দোলনের অধিকাংশই ভিন্ন

পথে অর্থ সংগ্রহ করা শুরু করে। তারা অর্থের বিনিময়ে বিদেশীদেরকে বিশাল বিশাল এলাকা দিয়ে দেয়, যেখানে বিদেশীরা রাষ্ট্রীয় আইনের আওতামুক্ত থাকত অথবা বড় বড় মাদক ব্যবসায়ীদেরকে সেসব জায়গা দিয়ে দেয়। বরং তারা নিজেরাই মাদক উৎপন্ন করে তাতে ব্যবসা শুরু করে। একইভাবে তারা স্থানীয় অধিবাসীদের সম্পদ লুট করতো এবং তাদেরকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করত অথবা বন্দী করে মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য রেখে দিত। [লক্ষনীয় বিষয় হল] যদিও যেই নৈরাজ্য কবলিত সমাজের ব্যবস্থাপনা তারা করছিল সেই সমাজে তাদের বিচার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু স্বৈরাচারী নীতি অনুসরণ করার কারণে তাদের মধ্যে মারাত্মকভাবে নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছিল। তবে তাদের অঞ্চলগুলোর প্রতিরক্ষা নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ ভাল ছিল। এমনকি আমেরিকা তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করতে না পেরে ও তাদের উপর ছড়ি ঘুরাতে না পেরে এবং এই অঞ্চলগুলোকে তার কক্ষপথে কিংবা জাতিসংঘের কক্ষপথে আনতে ব্যর্থ হয়ে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। তবে যাই হোক আমরা বিশ্বাস করি, সেখানে যুদ্ধ এমন দুটি গ্রুপের মধ্যে হচ্ছে যাদের মধ্যে কুফর, জুলুম উভয়টিই রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপায়

[বৈশ্বিক জিহাদের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে খিলাফাহ বা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গোটা বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোকে দু’ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে; ১। প্রথম সারি বা অগ্রগণ্য রাষ্ট্রসমূহ। ২। দ্বিতীয় সারি বা অবশিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ। এ দু’ধরনের রাষ্ট্রে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ধাপ আলাদা আলাদা]

অগ্রগণ্য রাষ্ট্রসমূহের ধাপ

অগ্রগণ্য রাষ্ট্রসমূহে প্রথমে আসবে ‘তটস্থঃকরণ ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ’ পর্ব।
তারপর ‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা’ পর্ব। তারপর আসবে ‘ক্ষমতা অর্জন ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা’ পর্ব।

অবশিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের ধাপ

অবশিষ্ট রাষ্ট্রসমূহে প্রথমে আসবে ‘তটস্থঃকরণ ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ’ পর্ব। তারপরই আসবে ‘ক্ষমতা অর্জন ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা’ পর্ব। এ রাষ্ট্রগুলোতে বিজয় ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা বাইরে থেকে আসবে।

[এগুলো হল খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার ধাপ।] পাশাপাশি এটাও লক্ষনীয় যে, ঘটনার পরিক্রমায় কখনও কখনও দ্বিতীয় সারির রাষ্ট্রগুলোও প্রথম সারির রাষ্ট্রগুলোর মতো একই রকম ধাপসমূহের মধ্য দিয়ে যেতে পারে।

অগ্রগণ্য হিসাবে চিহ্নিত রাষ্ট্রসমূহ

ইসলামী নবজাগরণ আন্দোলনের নিকট অতীতে করা গবেষণা ও সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনাপ্রবাহের সাথে সম্পৃক্ত গবেষণা[7] কিছু কিছু রাষ্ট্রকে [বরং সঠিক কথা হলো, কিছু কিছু অঞ্চলকে] চিহ্নিত করেছে, যেসব অঞ্চলের উপর মুজাহিদীনের বিশেষভাবে নজর দেয়া উচিৎ (এবং ওগুলোকেই নিজেদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানানো উচিৎ) যেন তাদের

আক্রমণাত্মক শক্তি বিক্ষিপ্তভাবে এমন রাষ্ট্রের পিছনে ক্ষয় না হয় যেখান থেকে তেমন বড় কোন ফায়েদা আসবে না।

(আলহামদুলিল্লাহ) নীতিমালার আলোকে এমন তাত্ত্বিকভাবে রাষ্ট্রগুলোকে চিহ্নিত করার ফলে স্বভাবতই প্রতিটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের পক্ষে গভীর দৃষ্টিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে। আর তখন এমন দুই বা তিনটি সম্ভাব্য রাষ্ট্রের উপর চূড়ান্ত মনোযোগ দেয়া সম্ভব হবে যেখানকার অধিবাসীদের জন্য আন্দোলনের উপযুক্ততা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এটা অবশ্য মৌলিক কাজ হিসেবে বলা হয়েছে। তাই এখানে এটাও জানিয়ে রাখা উচিত যে, এই গবেষণায় মুসলিম বিশ্বের বাকি রাষ্ট্রগুলোকে কোনভাবেই উপেক্ষা করা হয়নি। বরং শত্রুর মনোযোগ ও শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করা এবং পরবর্তীতে সীমান্তের ওপার থেকে আগত জিহাদের আগাম বার্তা দেয়ার জন্য ওই রাষ্ট্রগুলোতে ‘তটস্থঃকরণ ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণমূলক’ অপারেশনগুলো চলতে থাকবে।

তবে হ্যাঁ, এক্ষেত্রে আমরা এটা বলতে পারি যে, পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে এতে পরিবর্তন করার সুযোগ আছে। ওই গবেষণা সেপ্টেম্বরের সেই যুগান্তকারী ঘটনারও তিন বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে। ওই ঘটনা ও তদপরবর্তী ধারাবাহিক বিভিন্ন ঘটনার আলোকে নেতৃবৃন্দ [তাদের পরিকল্পনায়] কিছু পরিবর্তন এনেছেন এবং অগ্রগণ্য রাষ্ট্রের তালিকা থেকে কিছু কিছু রাষ্ট্র বা অঞ্চলকে বাদ দিয়েছেন। কারণ, সেখানে অবশিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর নিয়মে কাজ করতে হবে। আর তারা দুটো রাষ্ট্রকে অগ্রগণ্য রাষ্ট্রের তালিকায় ঢুকিয়েছেন অথবা বলা যায় আরও দুটো অঞ্চলকে এই তালিকায় যুক্ত করেছেন। সে দুটি হল, বিলাদুল হারামাইন (সৌদি আরব) এবং নাইজেরিয়া। সুতরাং এখন নীতিগতভাবে যেসব রাষ্ট্রকে অগ্রগণ্য রাষ্ট্রের তালিকায় রাখা হয়েছে সেগুলো হল জর্ডান, মাগরিবের দেশগুলো,[8] নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, সৌদি আরব এবং ইয়েমেন।

এটি ছিল (আমাদের নির্ধারিত) মূলনীতির আলোকে তৈরি করা একটি তালিকা।

এখন সর্বাগ্রে এই অগ্রগণ্য অঞ্চলের ভাইদের – যারা আল্লাহর সাথে এবং নিজেদের সাথে কৃত ওয়াদায় সত্য - গভীর দৃষ্টিতে দেখতে হবে যে, এখানে সুপরিকল্পিত তৎপরতা [ফোকাসড মুভমেন্ট] চালানো সম্ভব কি না? এ হলো প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা হলো, আমাদের বাছাই অনুযায়ী এগুলো সবচেয়ে সম্ভাবনাময় রাষ্ট্র। তবে কেবল দুটি বা তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে কোনো সমস্যা নেই, বরং কখনো হয়তো এ পন্থাই উত্তম হবে। ফলে এই দুটি বা তিনটি রাষ্ট্রের জনগণ সুপরিকল্পিতভাবে নিজেদের তৎপরতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, অপরদিকে অগ্রগণ্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যেগুলো বাকি রয়ে গেল সেগুলোতে দ্বিতীয় সারির রাষ্ট্রগুলোর মত কাজ চলতে থাকবে। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে কাজে অবিচল রাখেন এবং হেদায়েতের পথে দৃঢ় মনোবল দান করেন।

জরুরী জ্ঞাতব্য: [অঞ্চল বলে কোথায় কি উদ্দেশ্য?]

উদাহরণত আমি যখন ‘ইয়েমেন অঞ্চল’ বলবো তখন এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত সীমানার ‘ইয়েমেন’ হবে না। (বরং ইয়েমেনসহ আশপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল উদ্দেশ্য হবে।) কারণ, মুজাহিদদের পদচারণা ও আন্দোলন মুক্তভাবে ইয়েমেন, হিজাজ ও ওমানের সীমানার ভেতরে সবখানেই চলছে। অপরদিকে আমি যখন ‘গোলযোগপূর্ণ অঞ্চল’ বলবো তখন এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য পূর্ণাঙ্গ ভূখন্ড হবে না। কেননা সাধারণত গোলযোগপূর্ণ অঞ্চল বা নৈরাজ্যপূর্ন অঞ্চল (পুরো একটি ভূখন্ড হয় না, বরং)

একটি শহর বা জনপদ কিংবা দুটি শহর হয়, আবার কখনও শুধু একটি এলাকা বা বড় কোনো শহরের অংশবিশেষ হয়।

দেশ বাছাইকরণে বিবেচ্য বিষয়াদি

যে দেশগুলোতে গোলযোগপূর্ণ অঞ্চল তৈরি হতে পারে, সেগুলোতে নিচের সবগুলো অথবা কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়,

১। প্রত্যেকটি দেশে ভৌগলিক গভীরতার উপস্থিতি এবং ভূ-প্রকৃতি [যেমন, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, বন-জঙ্গল] নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনাকারীদের জন্য ‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা অঞ্চল’ প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে।

২। যেসব রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন সরকার দুর্বল হয় এবং রাষ্ট্রের আওতাধীন সীমান্তবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়, বরং সীমান্তবর্তী না হয়ে কখনও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও হতে পারে, বিশেষত যেসব অঞ্চল খুব ঘনবসতিপূর্ণ হয়।

৩। এসব অঞ্চলে একটি ইসলামী জিহাদী জোয়ারের উপস্থিতি থাকা।

৪। ওসব অঞ্চলে মানুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য, এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কিছু ভূমিকে অপর কিছু ভূমির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

৫। ওই অঞ্চলের লোকদের হাতে হাতে অস্ত্র থাকা।

সৌভাগ্য যে, আল্লাহর ইচ্ছায় বেশিরভাগ অগ্রগণ্য দেশগুলোই প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকায় হওয়ায় অন্য যে কোন রাষ্ট্রীয় শক্তির জন্য মুসলিম বিশ্বের গভীরে বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়া খুবই দুষ্কর।

আর মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য যেসব অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য হারে জিহাদী জোয়ার তৈরি হয়েছে, -বিশেষ করে সেপ্টেম্বরের সেই যুগান্তকারী হামলা ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলীর পর- সেসব অঞ্চলে যদি অগ্রগণ্য অঞ্চলগুলোর মত তৎপরতা চালানোর জন্য ভৌগলিকভাবে দুর্গম ও গুপ্তাঞ্চল না থাকে, পাশাপাশি সেখানকার কিছু জাতিগোষ্ঠীর স্বভাবজাত দূর্বলতার সুযোগে ক্ষমতাসীন সরকারের শক্তি ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বেড়াজালে তারা যদি আবদ্ধ থাকে, তাহলে সেসব অঞ্চলের ভাইদের জন্য উচিত হবে, ‘তটস্থঃকরণ মূলক’ অপারেশন শুরু করে দেয়া। ইতিমধ্যে তুরস্ক, তিউনিসিয়াসহ আরও অন্যান্য অঞ্চলে তা শুরুও হয়ে গেছে। এ বিষয়ে সামনে আরও বিস্তারিত আসবে।

মূল কথা হল (বিস্তারিত পরে আসবে ইনশাআল্লাহ) মুসলিম বিশ্বের প্রত্যেকটি অঞ্চলে- তা প্রথম সারির [অগ্রগণ্য] হোক কিংবা দ্বিতীয় সারির – বিভিন্ন গ্রুপ ও বিচ্ছিন্ন সেলের মাধ্যমে ‘তটস্থঃকরণ ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণমূলক’ অপারেশন চলতে থাকবে। এর ফলে অগ্রগণ্য অঞ্চলগুলোতে আশানুরূপ নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়বে। যেমনটি আমরা উপরে বলে এসেছি। পক্ষান্তরে অবশিষ্ট অন্যান্য অঞ্চল ও রাষ্ট্রগুলোতে [সরকারের শক্তি ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকার কারণে] বিশৃঙ্খলা ঘটবে না।

অতঃপর (অগ্রগণ্য) নৈরাজ্যপূর্ন অঞ্চলগুলো ধীরে ধীরে ‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা’ পর্বের দিকে এগুবে। অপরদিকে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল ও রাষ্ট্রগুলোতে দুই ধরণের কাজ চলতে থাকবে। এক. তারা অগ্রগণ্য নৈরাজ্যপূর্ন অঞ্চলগুলোর জন্য লজিস্টিক সাপোর্ট পাঠাবে [লজিস্টিক সাপোর্ট বলতে আমি অর্থ, মুজাহিদীনের জন্য নিরাপদ ঘাঁটি, রসদ সংরক্ষণ, প্রচার মাধ্যম ইত্যাদি বুঝাচ্ছি।] দুই. এ

অঞ্চলগুলোতে বাহির থেকে বিজয় আসার আগ পর্যন্ত সরকারগুলোর বিরুদ্ধে ‘তটস্থঃকরণ এবং ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণমূলক’ অপারেশন চালাতে থাকবে।

‘তটস্থঃকরণ ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ’ ধাপের মূল [ তথা প্রথম ধাপের] লক্ষ্যসমূহ

১। শত্রুর শক্তি নিঃশেষ করা এবং যেসকল সরকার তাদের সাথে সহযোগিতা করছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে তাদের প্রচেষ্টাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেওয়া এবং চেষ্টা করা যাতে অভিযানগুলো [এত সুচারুরূপে] পরিচালনা করা যায় যে, শত্রু দম নেওয়ার সময় না পায়, এমনকি সেটি যদি একটি ছোট্ট অভিযানও হয় -তা অগ্রগণ্য রাষ্ট্রে হোক বা দ্বিতীয় সারির কোনো রাষ্ট্রে। হয়তো একটি রডের [লৌহ দন্ডের] আঘাত একটি মাত্র ক্রুসেডারের মাথায়ই পতিত হবে কিন্তু এর ব্যাপ্তি ও তীব্রতা এমন হওয়া চাই যেন তার প্রভাব সুদীর্ঘ সময়ের জন্য থাকে।

২। মান সম্পন্ন অপারেশনের মাধ্যমে নতুন যুবকদেরকে জিহাদের দিকে আকৃষ্ট করা। অপারেশনগুলো চালাতে হবে উপযুক্ত সময় এবং সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। অপারেশগুলো এমন হতে হবে যেন মানুষের নজর কাড়ে। মান সম্পন্ন অপারেশন বলতে আমি যে কোনো মাঝারী ধরণের অপারেশন বুঝাচ্ছি। যেমন- বালি অপারেশন, (রিয়াদের) আল-মুহাইয়া অপারেশন, তিউনিশিয়ার জেরবা অপারেশন, তুরস্ক অপারেশন এবং ইরাকে পরিচালিত বড় বড় অপারেশনগুলো বা এগুলোর মতো কিছু”।

মান সম্পন্ন অপারেশন বলতে আমি ১১ই সেপ্টেম্বরের অপারেশনের মতো কিছু বুঝাচ্ছি না। ওই ধরনের কিছু করতে চাওয়ার অতিমাত্রায় চিন্তা হয়তো ছোট আকারের মান সম্পন্ন অপারেশন পরিচালনায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। যদি এই ধরনের বড় মাপের অপারেশন চালানোর কোন সুযোগ থাকে তবে উত্তম হল, হাই-কমান্ডের মতামত ব্যতীত তাড়াহুড়া করে কাজটি না করা। উপরন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ ধরনের অপারেশনের জন্য সক্ষমতা, আর্থিক সাপোর্ট এবং কভারেজের প্রয়োজন পড়ে, যা হাই-কমান্ড ব্যতীত লাভ করা যায় না।

অপরদিকে বালি, আল-মুহাইয়া কিংবা এরূপ অপারেশনের জন্য হাই-কমান্ডের সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন নেই। যেহেতু এধরনের অপারেশনের অনুমতি পূর্ব থেকেই দেয়া আছে। তবে এধরনের অপারেশনগুলোর হার কমিয়ে আনা যেতে পারে। তবে যা হবে তা যেন বিক্ষিপ্ত এবং পূর্বে বর্ণিত ছোট কিন্তু [মান সম্পন্ন] তীব্র প্রভাব বিস্তারকারী হয়।

এভাবে একটি উপযুক্ত সময় পার হওয়ার পর, ছোট ছোট অপারেশন পরিচালনাকারী মুজাহিদদের উন্নতি সাধনের জন্য মান সম্পন্ন মাঝারী মাপের অপারেশনগুলোর সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। যেন ক্রমান্বয়ে একটা সময়ে ছোট অপারেশনের সমান সংখ্যক মাঝারী ধরনের অপারেশন পরিচালনা করা যায়।

উল্লেখ্য, ছোট ছোট অপারেশন ও ওগুলোর ফলাফলের মান অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে যাচাই করতে হবে। কারণ, অনেক সময় ছোট অপারেশন নানাবিধ ক্ষতি বা জটিলতা বয়ে আনে। কিংবা এর ফলে মান সম্পন্ন মাঝারী মানের অপারেশনের জন্য প্রস্তুতিরত গ্রুপগুলো (এবং তাদের পরিকল্পনা) প্রকাশ পেয়ে যায়।

যদি ছোট অপারেশন পরিচালনাকারীরা একসময় মাঝারী ধরনের অপারেশন পরিচালনায় যথেষ্ট সক্ষমতা লাভ করতে পারে তাহলে তাদের উচিত হবে মাঝারী অপারেশনগুলোই পরিচালনা করা, যদিও একারণে ছোট অপারেশন বাতিল করতে হয়। তবে সার্বিকভাবে উদীয়মান দলগুলোর জন্য মান সম্পন্ন অপারেশন পরিচালনার পর্যায়ে পৌঁছার সবচেয়ে ভালো তরিকা হল, [ক্রমান্বয়ে দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে] প্রথমে পরিমিত সামরিক তৎপরতা ও সাবধানতা অবলম্বন করে ছোট ছোট অপারেশন দিয়ে শুরু করা।

৩। বাছাইকৃত (অগ্রগণ্য) অঞ্চল যেগুলোতে সুপরিকল্পিত তৎপরতা [ফোকাসড মুভমেন্ট] চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সেগুলোকে ক্ষমতাসীন সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে বের করে আনা, হয় অগ্রগণ্য অঞ্চলের সবক’টিকে বা কয়েকটিকে। এরপর ওখানে সৃষ্ট নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কাজ করা।

তবে এখানে লক্ষনীয় যে, আমাদের উদ্দেশ্য হল, রাষ্ট্রগুলোকে মুরতাদ সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা। এই উদ্দেশ্যটিই আমরা জনসমক্ষে প্রচার করবো এবং নিয়তও এটারই করবো। ‘গোলযোগপূর্ণ নৈরাজ্য পরিস্থিতি তৈরি করা’র কথা ঘোষণাও করবো না, আবার এর নিয়তও করবো না। [বলাই বাহুল্য, এই ভাঙ্গন নতুন করে গড়ার লক্ষ্যেই জন্যেই]।

উল্লেখ্য, আমাদের কখনও কখনও আকস্মিকভাবে সীমান্তবর্তী কিছু অঞ্চলে বা দ্বিতীয় সারির অঞ্চলগুলোর একেবারে অভ্যন্তরে অস্থিরতা ও নৈরাজ্য পরিস্থিতি দেখতে হতে পারে, এক্ষেত্রে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। হয়তো সেখানে নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা করার মত যোগ্য ইসলামী সংগঠন আছে বা নেই। যদি না থেকে থাকে তাহলে এসব অঞ্চল খুব শীঘ্রই হয়তো অনৈসলামিক সংগঠনগুলোর হাতে, অথবা ক্ষমতাসীন সরকারের [পতনোত্তর] অবশিষ্ট অংশের হাতে, কিংবা সংঘবদ্ধ কিছু গ্রুপের হাতে পড়ে যাবে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরি। সম্মানিত শাইখ ওমর মাহমুদ আবু ওমর (আল্লাহ তাঁকে বন্দী দশা থেকে মুক্ত করুন) বলেন, “এখানে কিছু জরাজীর্ণ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের গোমরাহীর ব্যাপারে সতর্ক করা উচিত, যারা জাতীয় ঐক্য বা জাতীয় বন্ধন রক্ষার আবশ্যকীয়তার ব্যাপারে শ্লোগান তোলে এবং এর প্রতি সকলকে আহ্বান করে। তাদের এ কথায় কুফুরী জাতীয়তাবাদের গন্ধ তো আছেই, অধিকন্তু তাদের এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, তারা (যুগে যুগে) বিভিন্ন সভ্যতার পতন এবং তার পুনর্গঠনে আল্লাহর চিরাচরিত যে সুন্নাহ চলে আসছে সে ব্যাপারে কোনো ধারণাই রাখে না।” [9]

৪। ‘তটস্থঃকরণ ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ’ পর্বের চতুর্থ লক্ষ্য হলো, ধারাবাহিক অনুশীলন ও অপারেশনের মধ্য দিয়ে তটস্থঃকরণ গ্রুপের [মুজাহিদীনের] উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধন। যেন তারা পরবর্তী ‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা’ পর্বের জন্য মানসিকভাবে ও বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেদেরকে পুরোপুরি প্রস্তুত করে নিতে পারে।

‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা’ [ তথা দ্বিতীয়] ধাপের মূল লক্ষ্যসমূহ

আমরা এখানে ওসব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো বর্ননা করতে পারি, যেগুলো আমরা পূর্বে ‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার আদর্শ রূপরেখায় করণীয়’ শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছি।

১। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা।

২। খাদ্য ও চিকিৎসা সেবার পূর্ণ ব্যবস্থা করা।

৩। প্রতিরক্ষা চৌকি নির্মাণের মাধ্যমে এবং উত্তরোত্তর সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার আওতায় থাকা অঞ্চলকে শত্রুর লুটতরাজ থেকে সুরক্ষিত রাখা।

৪। উক্ত অঞ্চলে বসবাসরত জনগণের মাঝে শরয়ী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

৫। উক্ত অঞ্চলের যুবকদেরকে সব রকমের প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যেন তাদের ঈমানী অবস্থার উন্নতি হয় এবং যুদ্ধ-দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং জিহাদের গুরুত্বের ব্যাপারে

সচেতন করে সমাজের সকল স্তরের লোকদের সমন্বয়ে একটি লড়াকু জিহাদি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

৬। দ্বীনি ইলম ও দুনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞান উভয়টিকে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া (বেশি গুরত্বপূর্ণ বিষয়গুলো, অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর আগে ছড়ানো)

৭। গোয়েন্দা ছড়িয়ে দেওয়া এবং একটি ছোটখাট গোয়েন্দা সংস্থা গঠনে তৎপর হওয়া।

৮। কিছু পার্থিব সুবিধা ও অর্থ ব্যয় করার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের অন্তর আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করা। তবে এটি হবে শরয়ী নীতিমালার ভিত্তিতে, যা কমপক্ষে ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সদস্যদের কাছে স্পষ্ট থাকবে।

৯। মুনাফিকদেরকে দলিল-প্রমাণ ও অন্যান্য উপযুক্ত উপায়ে প্রতিহত করা এবং তাদের উপর এতটুকু চাপ প্রয়োগ করা যেন তারা নিজেদের মুনাফিকি এবং তাদের সংশয় উদ্রেককারী মতামতগুলো লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হয় এবং এ উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে যারা গণ্যমান্য তাদের কিছুটা খাতির করা যেন তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

১০। ক্রমাগত উন্নয়ন করতে থাকা, যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্যবস্থাপনার আওতাভূক্ত এলাকার পরিধি সম্প্রসারণ করা, শত্রুকে ঘায়েল করতে আক্রমণ করা, তাদের অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া এবং তাদেরকে সর্বদা আতংকের মধ্যে রেখে আপোস-রফায় আগ্রহী করার মতো যথেষ্ট পরিমাণ সক্ষমতা অর্জিত হয়।

১১। আমাদের ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সাথে যারা পূর্ণ একাত্মতা জানায়নি তাদের মধ্য হতে যাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করা বৈধ তাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করা।

১২। উপরের পয়েন্টগুলোর সাথে আরেকটি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যুক্ত করছি। তা হলো, ব্যবস্থাপনা কর্মে নিয়োজিত দলগুলো ধারাবাহিক অগ্রগতির মাধ্যমে ক্ষমতায়নের শক্তি অর্জন করা ও ফল ঘরে তোলার জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং (সবশেষে) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

একইভাবে এই ধাপে আমাদের আরও কিছু লক্ষ্য বা পরিকল্পনা রয়েছে, যেসব লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আমরা অবশিষ্ট (অর্থাৎ দ্বিতীয় সারির) অঞ্চলগুলোতে এবং (প্রথম সারির মধ্যে) নৈরাজ্য পরিস্থিতির মাধ্যমে এখনও পতন ঘটেনি এমন অঞ্চলগুলোতে কাজ করবো। ওসব লক্ষ্যের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নরূপঃ

এক। সাধ্যমত ‘তটস্থঃকরণ ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণমূলক অভিযান’ অব্যাহত রাখা।

দুই। কাছের কিংবা দূরের যেসব অঞ্চলে আমাদের মাধ্যমে ‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা’ চলছে সেসব অঞ্চলে লজিস্টিক সাপোর্ট পাঠানোর (রসদ সরবরাহের) একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

যদি কোন কারণে ‘তটস্থঃকরণ ’ এবং ‘লজিস্টিক সাপোর্ট প্রেরণ’ এ দুয়ের মাঝে [কোনটি আগে এবং কোনটি পরে হবে এ মর্মে] সংঘর্ষ দেখা দেয় তাহলে সেখানকার পরিস্থিতি অনুযায়ী যেটা সবচেয়ে যথাযথ এবং কার্যকর সেটাই প্রাধান্য পাবে।

(ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার) কর্ম-পরিকল্পনা ও তৎপরতা

আমেরিকার বিরুদ্ধে করা ধারাবাহিক আক্রমণগুলো সেপ্টেম্বরের সেই কালজয়ী আক্রমণের মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। এ আক্রমণ শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকেই

আমেরিকার পাওনা ছিল। এবং এসব আক্রমণ ইখলাসের সাথে এবং আরো অন্যান্য শর্ত পূরণ করে পরিচালনা করা হয়ে থাকলে অচিরেই আল্লাহর ইচ্ছায় বিরাট আকারে সফলতা বয়ে আনবে। আলহামদুলিল্লাহ এগুলোর সফলতা প্রকাশ পেয়েছেও। এসব ক্রমবর্ধমান আক্রমণের সুনিশ্চিত ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, বিশ্বে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর কাছে এবং তাগুতি সামরিক বাহিনীতে কর্মরত সেনা সদস্যদের কাছে আমেরিকার ভাবমূর্তি [এখন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে] ক্ষুণ্ন ।

[আমেরিকার বিরুদ্ধে পরিচালিত] ক্রমবর্ধমান আক্রমণের অগ্নিশিখা ছড়তে ছড়তে সেই আগুন (আমেরিকার) মূল ভূখন্ডে পৌঁছে যাওয়া ছাড়াও [আরেকটি বড় লাভ যা হয়েছে তা হলো,] জিহাদী ধারায় এক জাগরণ তৈরি হয়েছে। যা নব্বইয়ের দশকে হারানো জিহাদী জাগরণের চেয়েও বহুগুণে বেশি ছিল। এতটাই যে, সাধারণত বড় মাত্রার অপারেশন বা ঘটনায়ও এ পরিমাণ সম্প্রসারণ ও জোয়ার তৈরি হয় না। [10]

এখন আমেরিকা এর প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে, যা সংঘাতকে আরও গভীর করে তুলবে। সুতরাং প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সে হয়তো একটি সীমিত যুদ্ধের অবতারণা করবে। যদি তাই হয় তাহলে এর দ্বারা তার আক্রোশ পুরোপুরি মিটবে না এবং জিহাদী ধারার ক্রমবর্ধমান জোয়ার ও সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণেও সে সফল হবে না।

[এজন্যই আমেরিকা তার ভাবমূর্তি রক্ষার্থে ও ক্ষোভ মেটাতে বড় আকারে হামলার ইচ্ছা করে এবং আফগানিস্তানে হামলা করে। তবে লক্ষনীয় হলো,] আফগানিস্তানের পতন ঘটানো এটা আমেরিকার পূর্ব পরিকল্পনার মধ্যেই ছিল। সুতরাং সেপ্টেম্বরের ঘটনা যদি নাও ঘটতো তথাপি তাদের হাতে আফগানিস্তানের পতন ঘটতো। (ভূমিকার আলোচনাটি আবার দেখা যেতে পারে)

[যদিও সে নিজের ভাবমূর্তি রক্ষার্থে ও ক্ষোভ মেটাতে আফগানিস্তানে হামলা করেছে] কিন্তু এখন তাকে জিহাদী জাগরণ ও জোয়ার ঠেকাতে গিয়ে সেপ্টেম্বরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হাজার হাজার গ্রুপের মুখোমুখি হতে হবে। শুধু যে মুখোমুখিই হবে তা নয় বরং সেসব গ্রুপ তার উপর প্রতিনিয়ত আঘাত করতে থাকবে। কিন্তু আমেরিকা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের মতো কোন সত্তা খুঁজে পাবে না। কারণ, আমেরিকার শত্রু রাষ্ট্র নয় বরং অসংখ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গ্রুপই তার শত্রু। এভাবে [এক সময়] আমেরিকার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, যেসকল ক্ষমতাসীনরা তাকে সমর্থন করছে তারা তাকে আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না এবং তার কৌশলগত স্বার্থ ও পালিত কন্যা ইসরায়েলের স্বার্থও তারা রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং দ্বিতীয় ফাঁদে পা দেয়া ছাড়া তার কোনো উপায়ও থাকবে না।[11]

আর প্রথম ফাঁদের বিষয়টা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি; সেটি হল আফগান আক্রমণ।[12] কারণ, আফগানিস্তানে আমেরিকার সামরিক উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়ে এক-দুই বছর বা আরও দীর্ঘসময় ধরে তাকে প্রতিরোধ করে রাখতে পারলেই এখানকার আপামর জনসাধারণ এবং মুরতাদ সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে থাকা গুরুত্বপূর্ণ লোকদের কিছু অংশ বুঝবে যে, আমেরিকাকে পরাজিত করা অসম্ভব কিছু নয়।

আর দ্বিতীয় ফাঁদ হল, আমেরিকার সামরিক শক্তিকে অত্র অঞ্চলের সাধারণ জনগণের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলা, যেখানে তারা কোন প্রতিরোধ ছাড়াই নিজেদের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে।

পরিস্থিতি এ মুহূর্ত পর্যন্ত যা তা হলো, অত্র অঞ্চলে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যমে জিহাদের জোয়ার তৈরি হয়েছে এবং যুবকদের এত এত বাহিনী তৈরি হয়েছে যে, তারা

এখন গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে প্রতিরোধ পরিকল্পনা তৈরি করছে। যদিও এতদিন এই শত্রুশক্তি এখানেই ঘাঁটি গেড়ে অবস্থান করছিলো এবং মুসলিম সমাজ তাদের পাশেই ঘুমন্ত ছিল, আর তারা এদের থেকে কোনো বিপদের আশংকাই করেনি।

ইতিমধ্যে আমেরিকান প্রশাসনের কাছে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে যে, তাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তারা বুঝতে পারছে যে, একই সময়ে একাধিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়াটা কেবল কাগজের পাতায় অনুমান করাই সম্ভব, বাস্তবে নয়। তারা আরও বুঝতে পারছে যে, তাদের কেন্দ্র থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের দেশগুলোর দূরবর্তীতা, যুদ্ধ শেষ করার সক্ষমতার উপর প্রভূত প্রভাব রাখে। আর দিন যত যেতে থাকবে, এসবের ফলাফল আরো ভয়ংকর হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ। পূর্বাপর সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই জন্য।

বিশ্বের পূর্ব-পশ্চিমে আমেরিকা ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে হানা আঘাতগুলো দেখুন! এই মুহূর্ত পর্যন্ত এই আঘাতগুলো অব্যাহত আছে। এর আলোকে এখন থেকে শুরু করে (আল্লাহর ইচ্ছায়) আমাদের চুড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করা পর্যন্ত আমাদের কর্ম পরিকল্পনা কী হতে পারে, যার দ্বারা আমরা ঘটনাগুলো সাজাতে পারি? (তা নিম্নরূপ)

মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে ক্রসেড ও ইহুদিবাদী শত্রুদের বিরুদ্ধে ‘তটস্থঃকরণ মূলক’ অপারেশনগুলোকে বহুমুখী এবং ব্যাপক করতে হবে। সম্ভব হলে মুসলিম বিশ্বের বাইরেও অপারেশন চালাতে হবে। যেন তাদের জোটশক্তিগুলোকে ছত্রভংগ করে দেওয়া যায় এবং ক্রমাগত তাদের শক্তি বিনাশ করা যায়।

উদাহরণ স্বরূপ, যদি ইন্দোনেশিয়ার কোনো ট্যুরিস্ট রিসোর্টে (পর্যটন বাংলোয়) আক্রমণ করা হয় যেখানে ক্রুসেডাররা ভ্রমণে যায়, তাহলে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রে সকল ট্যুরিস্ট রিসোর্টগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সেখানে অতিরিক্ত ফোর্স মোতায়েন করতে হবে, যা হবে নিয়মিত সংখ্যার চেয়ে কয়েকগুণ এবং তা হবে অনেক ব্যয়বহুল।

যদি তুরস্কে অবস্থিত ক্রসেডারদের কোনো ব্যাংকে আঘাত হানা যায় তাহলে বিশ্বের সকল দেশে ক্রসেডারদের মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে; ফলে অর্থনীতির খরচের খাত বেড়ে যাবে।

যদি ইয়েমেনের এডেন বন্দরের নিকট একটি তেলের স্থাপনায় আঘাত হানা যায়, তাহলে সেখানকার সকল তেল কোম্পানীর জন্য এবং তেলবাহী জাহাজগুলোর জন্য, এমনকি তেলের পাইপ লাইনগুলোর নিরাপত্তার জন্য প্রচুর নিরাপত্তা রক্ষী নিযুক্ত করতে হবে। এতে তাদের খরচের পরিমাণ বেড়ে যাবে।

যদি কাছাকাছি সময়ের মধ্যে দুটি মুরতাদ সাহিত্যিককে দুটি পৃথক পৃথক শহরে হত্যা করা যায় তাহলে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন শহরে এমন হাজারো লেখক-সাহিত্যিককে তাদের নিরাপত্তা দিতে হবে। এভাবে তটস্থঃকরণ মূলক অপারেশনে টার্গেট নির্ধারণে বহুমূখীতা ও ব্যাপকতা আনা যেতে পারে, যেগুলো পরিচালিত হবে ছোট ছোট, পৃথক পৃথক গ্রুপ দ্বারা। তদুপরি একই রকম টার্গেটের উপর উপর্যুপরি দুই বা তিনবার আঘাত হানলেই ওদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, এই ধরণের টার্গেটগুলো অব্যাহতভাবে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনায় আছে।

যে টার্গেটগুলোতে আমাদের বেশি মনোযোগ দেয়া উচিত এবং তার কারণসমূহ

আমরা বলেছি যে, শরীয়া অনুমতি দেয় এমন যে কোন টার্গেটে আমাদের আক্রমণ করা উচিত।
এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক টার্গেটগুলোর প্রতি বেশি মনোযোগ দিতে হবে, বিশেষ করে তেল।
কেউ হয়তো বলতে পারে, সেক্ষেত্রে আমরা মিডিয়ার অপপ্রচারের শিকার হব। তখন আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে যাবতীয় অভিযোগ করা হবে এবং বলা হবে যে, আমরাই দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির জন্য দায়ী ইত্যাদি ইত্যাদি।

কেউ হয়তো আমাদেরকে স্মরণ করাবে যে, মিশরের ‘আল জামাআতুল ইসলামিয়া’ যখন পর্যটন সেক্টরে এই শ্লোগান তুলে আক্রমণ করলো যে, তারা একটি হারাম খাতকে ধ্বংস করছে এবং মুরতাদ সরকারের অর্থনীতিকে দূর্বল করছে তখন তাদের এই পরিকল্পনা ভালো ফল বয়ে আনেনি এবং এ পথে তারা ভালোভাবে এগুতেও পারেনি। তেমনিভাবে মিশরীয় মুরতাদ সরকারের মিডিয়া ক্যাম্পেইনের জবাবও তারা সুন্দরভাবে দিতে পারেনি। আমরা এই পয়েন্টটি নিয়ে পরে আবার আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

শত্রু উপকৃত হয় এমন অর্থনৈতিক খাত বিশেষকরে পেট্রোল খাতকে টার্গেট করতে হবে। কারণ, শত্রুর কাঙ্খিত ঘর বা কমপক্ষে তার চালিকা শক্তি যে এটাই। শত্রুর নেতৃবৃন্দ শুধু এর জন্যই বহু সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে। সুতরাং অর্থনৈতিক খাতগুলোকে টার্গেট করলে শত্রুরা অন্যান্য (অর্থনৈতিক বা ভিন্ন) খাতগুলো রক্ষা করার জন্য ওখানকার সরকারগুলোকে আরও বেশি ফোর্স নিয়োগ দিতে তাড়া দিবে। ফলস্বরূপ তাদের ফোর্সগুলোর দুর্বলতা প্রকাশ পেতে শুরু করবে, বিশেষ করে যেহেতু তাদের ফোর্সের সংখ্যা সীমিত। কারণ, মুরতাদ সরকারের বাহিনীগুলোতে একটি নিয়ম হলো, সাধারণভাবে পুলিশ বা সামরিক বাহিনীগুলোকে, আর বিশেষভাবে সন্ত্রাসী হামলার বিরুদ্ধে নিয়োজিত বাহিনী ও (সরকারের উচ্চ লেভেলে) নিরাপত্তা প্রদানকারী বাহিনীগুলোকে যে কোন প্রকারেই হোক ইসলামী গ্রুপগুলো থেকে আসা গুপ্তচর মুক্ত রাখতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, মিশরের গোয়েন্দা সংস্থার জন্য ইসলামী গ্রুপগুলো দ্বারা অনুপ্রবেশ কবলিত বিশ হাজার সদস্যের চেয়ে [অনুপ্রবেশ মুক্ত] মাত্র পাঁচ হাজার অনুগত অফিসার অনেক ভালো। এসব কারণে তাদের ফোর্সের সংখ্যা সীমিত ও বাছাইকৃত। ফলে সরকারগুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাহিনী মোতায়েন করে। যেমন,

প্রথমতঃ রাজ পরিবারের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা।

দ্বিতীয়তঃ বিদেশীদের নিরাপত্তা।

তৃতীয়তঃ পেট্রোল/তেল সম্পদ এবং অর্থনীতি।

চতুর্থতঃ বিনোদন কেন্দ্রগুলো।

ধারাবাহিকভাবে এসব টার্গেটের উপর মনোযোগ দিলে দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো এবং ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলো সামরিক ফোর্স শূন্য হওয়ার মাধ্যমে শিথিল হতে শুরু করবে। অথবা ফোর্স থাকলেও সেখানে অল্প কিছু দুর্বল নেতৃত্ব বিশিষ্ট সৈন্য থাকবে, যেখানে পর্যাপ্ত অফিসার থাকবে না। কারণ তারা অর্থনৈতিক স্থাপনা এবং প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীসহ বড় বড় হর্তাকর্তাদের নিরাপত্তা দেয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ফোর্স নিয়োগ দিবে। আর তখন কখনও কখনও এই সুবিশাল সামরিক শক্তির অবকাঠামো দূর্বল হয়ে পড়ে। ফলে সহজেই তাদের উপর আক্রমণ করা যায় এবং তাদের থেকে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া যায়।

আর তখন জনসাধারণ চেয়ে চেয়ে দেখে যে, সৈন্যরা কীভাবে কোনো দিকে না তাকিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালায়। ঠিক তখন থেকেই সেসব অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য পরিস্থিতির সূত্রপাত হয় এবং অঞ্চলগুলো নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে।

মৌলিকভাবে এই চারটি টার্গেটের বাইরেও আরও অন্যান্য টার্গেটগুলোতে হামলা ও শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে এভাবেই ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।

তেল সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যবস্তুগুলোতে আক্রমনের যৌক্তিকতা বুঝার জন্য আমরা এখানে যা বলছি তা যথেষ্ট নয়, এখনও কারো মনে কোন আপত্তি বা সংশয় জাগতে পারে। পাঠকের উচিৎ হবে নিম্নোক্ত শিরোনামের আলোচনাগুলো (যা সামনে ৩য় অধ্যায়ে আসবে) দেখে নেওয়া।

[৩য় পরিচ্ছেদ] পরিক্ষীত ও সফল প্রমাণিত সামরিক কৌশলসমূহের ব্যবহার।

[৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ] শত্রু ও তাদের সহগামীদের রাজনৈতিক চাল সঠিকভাবে বোঝা এবং শরিয়া রাজনীতি (সিয়াসত) অনুসারে সেগুলো মোকাবেলায় পদক্ষেপ নেয়া।

[৭ম পরিচ্ছেদ] মেরুকরণ, বিশেষত অর্থনীতি সংক্রান্ত অংশ এবং মিডিয়া (গণমাধ্যম) সংক্রান্ত অংশ।

একইভাবে এ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত (৫ম অধ্যায়ের) কয়েকটি প্রবন্ধও পাঠকের পড়া উচিত,

[১ম] প্রবন্ধঃ ধৈর্য্যের লড়াই।

[৭ম] প্রবন্ধঃ সম্পদের মাধ্যমে মেরুকরণ।

[৪র্থ] প্রবন্ধঃ ‘প্রকৃতির স্বাভাবিক নীতি’- মুমিন, কাফের উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

উপরের প্রতিটি পরিচ্ছেদে ও প্রবন্ধে এমন এমন আলোচনা রয়েছে যা অর্থনীতি ও তেল সংক্রান্ত পয়েন্টটিতে পাঠককে সুস্পষ্ট ধারণা দিবে ও এর সামগ্রিকতা অনুধাবনে সাহায্য করবে এবং [শরীয়া কর্তৃক নিষিদ্ধ] জান ও মালের ক্ষতি না করে কীভাবে এই সেক্টরগুলোকে টার্গেট করা যায়, তা স্পষ্ট করবে।

ফিরে আসি আমাদের পরিকল্পনার বাকি অংশে। গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পর যদি আমাদের গ্রুপগুলো সেসব এলাকার কাছাকাছি থাকে বা কাছাকাছি না হলেও সেখানে পৌঁছে যাওয়ার মাধ্যম যদি থাকে, আর গোলযোগপূর্ণ সেই অঞ্চলে (পূর্ব থেকেই) আমাদের গোয়েন্দা ও বন্ধুভাবাপন্ন অনুগত লোকও থাকে, তাহলে আমাদের উচিত হবে, গোলযোগ পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনা করতে সম্ভাব্য কতদিন সেখানে অবস্থান করতে হবে এবং সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতি কী- এসব বিষয় গভীরভাবে পর্যালোচনা করা। সুতরাং এতদিন সেসব অঞ্চলে ‘তটস্থঃকরণ মূলক’ অপারেশন পরিচালনার কাজটি যেসব গ্রুপ আঞ্জাম দিচ্ছিলো তারা যখন একত্রিত হয়ে একটি কাঠামোতে পরিণত হবে এবং ওসব অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা কর্মে নেমে পড়বে, তখন সেই অঞ্চল ও তার আশপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে ও এক জায়গায় জড়ো হওয়ার ক্ষেত্রে এমনভাবে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে, যেন শত্রুপক্ষ তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত থাকে এবং সবসময় উদ্বিগ্ন থাকে।

মুজাহিদদের এই প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে যখন শত্রু পক্ষের নেতা ও অধীনস্তরা জানতে পারে তখন নেতারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং অধীনস্তরা চিন্তা করা শুরু করে [মরতে যখন হবেই তখন] জালিম মুরতাদদের সাথে মৃত্যু বরণ করার চেয়ে মুজাহিদীনদের সাথে শহীদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করাই তো শ্রেয়। এমতাবস্থায় শত্রুপক্ষ মীমাংসার

দিকে ঝুঁকতে পারে, অবশ্য এটি সন্ধি-চুক্তি করে নয় বরং আপাতত সে তার অর্থনীতি ও সম্পদ বাঁচানোর জন্য পিছনের সারিতে সরে গিয়ে অবস্থান নিবে এবং ওখানেই সে তার সৈন্য সমাগম বৃদ্ধি করতে থাকবে।

শত্রুরা পিছনে সরে যাওয়ার সাথে সাথে, ওই জায়গাগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে এবং নৈরাজ্য বৃদ্ধি পাবে। সাথে সাথে মুজাহিদরা সেখানে ধারাবাহিক উন্নয়ন শুরু করবে ও তা অব্যাহত রাখবে এবং পরবর্তী ধাপগুলোর জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অগ্রসর হতে থাকবে। এভাবে মুজাহিদদের খ্যাতি ও অবদানের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

শত্রুরা যখন মুজাহিদদের এই উদ্দীপনা দেখবে তখন মুজাহিদদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া বা নিজেদেরকে আরও বেশি পরিমাণে গুটিয়ে নেওয়া ছাড়া তাদের কিছুই করার থাকবে না। এতে নৈরাজ্য আরও বৃদ্ধি পাবে। তখন নৈরাজ্য কবলিত অঞ্চলকে আরও ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং ওই অঞ্চলে থাকা আমাদের অগ্রবর্তীদলের সাথে যোগাযোগ করে আমাদেরকেই ওখানকার নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আগে বাড়তে হবে এবং এভাবেই চলতে থাকবে।

নির্দিষ্ট কিছু পয়েন্টের মাধ্যমে উপরোল্লিখিত পরিকল্পনাটির সহজীকরণ

উপরের পরিকল্পনাটিকে বাস্তবায়ন করতে হলে দরকার হবে,

• একটি সামরিক কৌশল প্রণয়ন করা, যা শত্রুর যাবতীয় প্রচেষ্টা ও শক্তি-
সামর্থকে বিক্ষিপ্ত করে দিবে এবং তার অর্থনৈতিক ও সামরিক সক্ষমতাকে ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে দিবে।
• একটি মিডিয়া কৌশল প্রণয়ন করা, যার টার্গেট হবে দুই শ্রেণীর মানুষ। প্রথম
শ্রেণী হল আম জনতা, যাদের একটি বড় অংশকে জিহাদে যোগদানের জন্য মিডিয়ার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করা হবে এবং জিহাদের পক্ষে ইতিবাচক সাপোর্ট দেয়া হবে।
আর যারা এই কাতারে [জিহাদে] যোগদান করবে না তাদের ব্যাপারে নেতিবাচক
মনোভাব ব্যক্ত করতে হবে। অপর শ্রেণীটি হল, শত্রু শিবিরের নিম্ন লেভেলের সেনাসদস্যগণ। মিডিয়ার মাধ্যমে তাদেরকে উজ্জীবিত করা হবে, যেন তারা মুজাহিদদের সাথে এক কাতারে শামিল হয় বা কমপক্ষে শত্রুপক্ষের হয়ে কাজ করা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এভাবে একটি যথোপযুক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা নিচের লক্ষ্যগুলো পূরণে কাজ করবোঃ

• সামরিক কৌশলে পর্যায়ক্রমে উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটাতে হবে, যার ফলে শত্রু
বাহিনীকে বাধ্য করা হবে যেন তারা অর্থনৈতিক লক্ষ্যবস্তুগুলোকে রক্ষার
জন্য তাদের সৈন্য-সামন্তকে গুটিয়ে এনে ওখানে মোতায়েন করে।
• মিডিয়া কৌশলে পর্যায়ক্রমে উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটাতে হবে, যেন মুরতাদ
সেনাবাহিনীর মধ্যম সারির অফিসারদের কাছে আমাদের বার্তা পৌঁছে এবং মুজাহিদদের সাথে যোগদানের জন্য তারা তাড়না অনুভব করে।
• উপরোক্ত পয়েন্টগুলোর ফলাফলকে কাজে লাগানোর জন্য [অর্থাৎ নৈরাজ্য
পরিস্থিতি তৈরি হলে সে পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর জন্য] ধারাবাহিক পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ চালু রাখা।
• একটি মিডিয়া প্লান দাঁড় করানো, যেখানে প্রত্যেকটি ধাপে পরিচালিত আমাদের
অপারেশনগুলোর ন্যায্যতা শরয়ী দলিল ও যুক্তির আলোকে প্রচার করা হবে। এটি বিশেষকরে আম জনতাকে লক্ষ্য করে করতে হবে, যেন তারা অন্যান্য ইসলামী দলগুলোর হাতে বন্দী হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে। কারণ, ওসব ইসলামী দলগুলো একটু বেশি বোঝে!![13] আর এটা নিশ্চিত যে, আম জনতাই হচ্ছে জটিল সমীকরণ,

ভবিষ্যতে এরাই আমাদের পিছনে থাকবে এবং আমাদের সহযোগী হবে। [তবে তারা তা তখনই করবে] যখন (আমাদের প্রতিটি) কাজে স্বচ্ছতা থাকবে। এমনকি কখনও কোন ভুল হয়ে গেলে ভুলের স্বীকারোক্তি দেওয়া হবে। এর ফলে শত্রুদের মিথ্যা ও কূট-কৌশলগুলো প্রকাশিত হয়ে যাবে এবং আমাদের সত্যবাদিতার বিষয়টি আম জনতার মাঝে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। [ইনশাআল্লাহ]।
• এই মিডিয়া প্লানটি যখন ‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা’ ধাপের সঙ্গী হবে তখন বিশেষভাবে এর টার্গেট থাকবে, আম জনতা বিশেষকরে যুবকরা যেন ব্যাপকভাবে
আমাদের ব্যবস্থাপনাকৃত অঞ্চলে চলে আসে। এই টার্গেট বাস্তবায়নের জন্য
মিডিয়া কমিটি প্রথম থেকেই এমন কাউকে ঠিক করে দিবেন, যিনি এ বিষয়ে নানা পরিকল্পনা করবেন।

ওসব অঞ্চলের খবরগুলো খুব স্বচ্ছতা ও সত্যবাদিতার সাথে প্রকাশ করা হবে এবং জানানো হবে যে, এখানে আসার পর তাদের জান-মালের কিছু ক্ষতিও হতে পারে। [অর্থাৎ মিডিয়ার কাজ হবে বাস্তবচিত্র তুলে ধরেই তাদেরকে এসব অঞ্চলে চলে আসার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।]

লক্ষ্য করুন, যখন আমরা বলছি যে, আম জনতার বিষয়টি ‘একটি জটিল সমীকরণ’ তখন আমরা কিন্তু এটা বুঝাচ্ছি না যে, আমাদের আন্দোলন তাদের উপর নির্ভরশীল। আমরা জানি, তাগুতরা তাদের মানসিকতাকে যেভাবে পরিবর্তন করেছে এর ফলে একটা পর্যায়ে তাদের উপর তেমন একটা ভরসা করা যায় না। আর এও জানি, বিজয় না আসা পর্যন্ত তাদের তেমন উন্নতিও হবে না।

(যাই হোক) আম জনতার মধ্যে যারা আমাদের ডাকে সাড়া দিবে না এবং সম্ভবত এদের সংখ্যাই বেশি হবে, সেক্ষেত্রে আমাদের মিডিয়া পলিসির ভূমিকা হবে, তাদের সহানুভূতি আদায় করা, কমপক্ষে তাদেরকে নিরপেক্ষ ভূমিকায় রাখা।

কিন্তু আমরা মনে করি - আল্লাহর ইচ্ছায় - আম-জনতার মধ্যে আমাদের জন্য একটি সংরক্ষিত [রিজার্ভ] অংশ রয়েছে, যারা কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সক্ষম। তবে শর্ত হলো, উম্মাহ’র সেই উত্তম অংশকে দলে ভিড়ানোর যেসব উপায় রয়েছে, সেগুলো নিয়ে অবশ্যই আমাদেরকে কাজ করতে হবে। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করেন এবং আমাদেরকে উম্মাহর সেই উত্তম অংশের অন্তর্ভূক্ত করেন।

আমরা অনুমান করতে পারি যে, (আল্লাহর ইচ্ছায়) আমাদের এই দীর্ঘ লড়াই শেষ হতে আনুমানিক পাঁচ লক্ষ মুজাহিদের প্রয়োজন হবে। আর এ পরিমাণ মুজাহিদ, প্রচলিত ইসলামী আন্দোলনগুলোতে অংশগ্রহণরত যুবকদের থেকে- যারা নামধারী দুষ্ট ওলামা- মাশায়েখদের সংশয়পূর্ণ কথাবার্তা দ্বারা ইতিমধ্যেই দূষিত হয়ে গেছে- তাদের মধ্য থেকে যোগাড় করার বদলে, এক বিলিয়ন [একশ কোটি] জনসংখ্যার একটি উম্মাহর [তথা বাকি মুসলিম উম্মাহর] মধ্য থেকে যোগাড় করা অনেকটাই সহজ। মুসলিম উম্মাহর যুবকরা - তাদের মধ্যে শত ভুল ত্রুটি থাকলেও- সৃষ্টিগত স্বভাবের (ফিতরাতের) অধিক নিকটবর্তী। বিগত দশকগুলোর অভিজ্ঞতা এটাই নিশ্চিত করে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী দ্বারা সবার সামনে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, (আমাদের কাজগুলো দেখে) একজন সাধারণ মুসলমান তার স্বভাবজাত ফিতরাতের কারণে জড়তাগ্রস্ত ওই সকল ইসলামী দলের সদস্যদের চেয়ে অনেক বেশি প্রভাবিত হয়, যারা নিজেদের দ্বীনকে পথভ্রষ্ট আলেম-ওলামা এবং ভন্ড পীর মাশায়েখদের হাতে সঁপে দিয়েছে।

আমরা দেখেছি যে, অনেক সময় যারা মিডিয়া টপিক প্রস্তুত করে তাদের অধিকাংশ চিন্তা- ভাবনা, সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হয় এইসব পথভ্রষ্ট আলেম-ওলামা আর পীর মাশায়েখদের সৃষ্ট সংশয় দূরীকরণে, এমনকি যদিও টপিকটি সাধারণ জনতাকে উদ্দ্যেশ্য করে তৈরি করা হয়। সন্দেহ নেই [টপিক তৈরির ক্ষেত্রে] এর প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু এখন যা জরুরি তা হলো, জনসাধারণের বুদ্ধি বিবেচনার সাথে সঙ্গতি রেখে সঠিক ধ্যান-ধারণা উপস্থাপনে বেশি মনোযোগী হওয়া এবং বেশিরভাগ যেসব ধারনা তাদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখছে, সেগুলোকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা। তাদের ভাবনা ও আবেগ-অনুভূতিরও নিজস্ব একটি ধরণ আছে, যা উভয়পক্ষের (ওলামায়ে হক্কানী ও ওলামায়ে সূ‘দের) বিবেচনাবোধ থেকে ভিন্ন। [সুতরাং সঠিক বিষয়টি উপস্থাপনের পর তাদেরকে নিজেদের মত চিন্তা করার সুযোগ করে দিলে তারা সহজেই সঠিক বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবে।]

তৃতীয় অধ্যায়

কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ও পলিসি, যা অনুসরণ করলে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সহজ হয় এবং [আল্লাহর ইচ্ছায়] সাধারণভাবে ‘তটস্থঃকরণ ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ’ পর্বের লক্ষ্যগুলো পূরণের পাশাপাশি বিশেষভাবে ‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা’ পর্বের লক্ষ্যগুলোও পূরণ হয়।

১ম পরিচ্ছেদঃ

নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন (Mastery of the art of Management)

আল্লাহর অশেষ কৃপায় মুসলিম বিশ্বে বিশেষকরে জিহাদী তানজিমগুলোতে সুশৃংখল ইসলামী কর্মকান্ডগুলো সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে। তবে এ ব্যবস্থাপনাশৈলীতে এখনও বহুবিধ নৈপূণ্য অর্জন, প্রশিক্ষণকে আরও ব্যাপক করা এবং উৎকর্ষ সাধন করার প্রয়োজন আছে, যেন ইসলামী আন্দোলনের বড় একটি অংশ এর আওতায় এসে যায় । বিশেষ করে আমরা যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছায় এমন একটি ধাপের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যে ধাপে আমাদের প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তাগুলো আরও বিস্তৃত হবে, যাকে আমরা ‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার ধাপ’ বলে থাকি। তখন লাখ লাখ মানুষের সাথে আমাদের মিশতে হবে এবং ছোট ছোট রাষ্ট্রের মতো করে বিভিন্ন অঞ্চল আমাদেরকে পরিচালনা করতে হবে। আমরা যদি এটি মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত না থাকি তাহলে আমাদেরকে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে, এদিক ওদিকের বিভিন্ন ক্ষতি কিংবা প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের সাধারণ ক্ষতি তো আছেই, যা স্বতঃস্ফূর্ত কার্যক্রম বন্ধ করে দিবে এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্থ করবে।

তাই ছোট ও মাঝারী ধরণের জিহাদী গ্রুপগুলো -যাদের মাধ্যমে বড় বড় ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে এবং যারা আল্লাহর অনুগ্রহে মুসলিম বিশ্বের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে পড়েছে- তাদের উচিত, এখন থেকেই অপরিকল্পিত ও গৎবাঁধা প্রশাসনিক কাজগুলোকে পরিহার করা।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টিতে আমাদের অর্জিত দক্ষতার প্রয়োগ জরুরী সেটি হল, কীভাবে কমিটি গঠন করতে হয় এবং কীভাবে বিশেষ বিশেষ কাজ বা ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে হয় এবং কীভাবে কাজ ভাগ করতে হয়, যেন সকল কাজ একজনের কাঁধে বা একটি ছোট গ্রুপের কাঁধে গিয়ে না পড়ে। পাশাপাশি সকল সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা আদান প্রদান করাও জরুরি, যেন একজন ব্যবস্থাপক চলে গেলে আরেকজন তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে।

সবাইকে সব অথবা অধিকাংশ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া জরুরি, যেন চাহিদা অনুযায়ী, দক্ষতা একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা যায়। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, যে ব্যক্তি যে শাখাতে কাজ করে না, সে যেন ওই শাখার গোপন বিষয়াদি না জানে। আমি বোঝাতে চাচ্ছি, তাদেরকে শুধু প্রশিক্ষণ এবং ব্যবহারিক জ্ঞান দিতে হবে। যেমন, বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও কলাকৌশল ইত্যাদি। এর বাইরে কিছু নয়।

ব্যবস্থাপনার কাজে নৈপূণ্যতা প্রচুর সময় বাঁচায় এবং কাজে-কর্মে বরকত নিয়ে আসে, বিশেষ করে আমরা যখন সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে চলছি এবং আমাদেরকে যেকোন কাজ এমনভাবে করতে হয় যেন তা সর্বোচ্চ ফলাফল বয়ে আনে।

প্রতিটি গ্রুপেই এমন কিছু ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া সম্ভব, যারা জন্মগতভাবেই ব্যবস্থাপনার কাজে নৈপূণ্যতার অধিকারী (জন্মগতভাবে নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনার গুণাবলীর অধিকারীদের নিয়ে গবেষণামূলক নানা বই ও প্রবন্ধ রয়েছে, যেগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে, কীভাবে তাদের খুঁজে বের করা যায় এবং তাদের মেধাকে কাজে লাগানো যায়)। তারপরও অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা এবং ব্যবহারিক অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের সেই যোগ্যতাকে আরও কার্যকর করে গড়ে তোলা অপরিহার্য।

স্বাভাবিকভাবেই যাদের আগ থেকে অভিজ্ঞতা আছে প্রথমে তারা এগিয়ে যাবে এবং তারাই দ্বিতীয় প্রজন্মকে প্রস্তুত করার দায়িত্ব নিবে। দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্যে তারাই হবে বাছাইকৃত ও উল্লেখযোগ্য যারা হবে জ্ঞানান্বেষী, বুদ্ধিমান, ধর্মভীরু, যারা (ইতিমধ্যে) অত্যন্ত ধৈর্য, ধীরস্থিরতা এবং গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে ভয়ংকর সব অবস্থা ও চরম দুর্দশার মোকাবিলা করেছে। এই সর্বশেষ গুণগুলোই সংগঠনের নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্য ব্যক্তির বড় পরিচায়ক। এমন ব্যক্তিদেরকে প্রশাসনিক কাজের পাশাপাশি নেতৃত্ব দানের দায়িত্বও প্রদান করা যেতে পারে।

আমরা অবশ্যই প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উপর লেখা বইগুলো পড়ব। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে ব্যবস্থাপনার উপর লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ ও নিবন্ধগুলো। কারণ, এগুলো বর্তমান সময়ের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইন্টারনেটে এখন একাধিক সাইট রয়েছে, যেখান থেকে যে কেউ এ জাতীয় বইগুলো সংগ্রহ করতে পারবে। ‘মুফাক্কিররাতুল ইসলাম’ সাইটটিতে সারাংশ আকারে যে লেখাগুলো বের হয়, আমার মতে, ওগুলো খুবই চমৎকার। বিশেষকরে সাইটটিতে আধুনিক বিশ্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণার সারাংশ থাকে এবং এর পরিচালকদের নানান মন্তব্যও থাকে। সেখানে এ কথাও উল্লেখ আছে যে, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার আধুনিক পদ্ধতির উৎস হল সুন্নাহ ও সালাফদের জীবনাচরণ। একইভাবে, মন্তব্যগুলোতে শরিয়াহ অনুসরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভুলের বিপরীতে অগণিত সাবধান বানী রয়েছে। এছাড়াও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আরও বই এবং তথ্য-উপাত্ত্ব ইন্টারনেট, লাইব্রেরী এবং প্রকাশনা সংস্থাগুলোতে পাওয়া যাবে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এগুলো পড়া শেষ হলে এগুলো থেকে অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে, যেন প্রশাসনিক কাজে এর ইতিবাচক প্রভাব কী পড়ে, তা লক্ষ্য করা যায়।

২য় পরিচ্ছেদঃ

কে নেতৃত্ব দিবেন? কে ব্যবস্থাপনা করবেন? এবং কে প্রশাসনিক মৌলিক সিদ্ধান্তগুলো অনুমোদন করবেন?

ইসলামী আন্দোলনে একটি প্রচলিত কথা আছে, সকল লিডার ব্যবস্থাপক [ম্যানেজার] নন এবং সকল ব্যবস্থাপকই লিডার নন। আমরা কথাটিকে একটু পরিবর্তন করে এভাবে বলবো, সকল লিডারই ব্যবস্থাপক কিন্তু সকল ব্যবস্থাপকই লিডার নন।

একটি আন্দোলনের ম্যানেজার বা ব্যাবস্থাপক হন ওই আন্দোলন বা গ্রুপের এমন একজন ব্যক্তি, যিনি প্রশাসনিক কাজে দক্ষ হন, যাকে অর্থ বা খাদ্যপুষ্টি অথবা এরকম কোন সেক্টর ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োগ দেয়া হয়, ওই সেক্টরের গোপনীয় বিষয়গুলো যথাসম্ভব তাকে জানানো হয় না। (তাকে কেবল ততটুকুই জানানো হয় যতটুকু তার কাজের জন্য জানা দরকার) কিন্তু যিনি লিডার হবেন, তিনি ওই আন্দোলনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিটি হবেন। যার উপর এর সকল কাজের দ্বায়দায়িত্ব অর্পিত হবে এবং যার নিকট এর সকল গোপন তথ্য থাকবে। অতএব স্বাভাবিক ভাবেই আন্দোলনের লিডাররা আন্দোলনের অনেক গোপনীয় বিষয়াদি জানবেন। কোন কোন লিডার প্রশাসনিক মৌলিক সিদ্ধান্ত এবং ছোট খাট সিদ্ধান্ত সবই প্রদান করবেন অপরদিকে কেউ কেউ শরীয়া সংক্রান্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। একারণে আমরা যখন পরিকল্পনা করি তখন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাদের উপর দেই, যারা সংশ্লিষ্ট কাজে পারদর্শী। কিন্তু লিডারশীপ বা নেতৃত্ব কেবল তাঁদেরকেই দেই যারা নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণ আস্থাভাজন। লিডার ও ম্যানেজারদের কাজের পেশাদারিত্ব নজরদারি করার জন্য ‘নিরাপত্তা ব্যবস্থা’ও রাখা হয়। যেন এর মাধ্যমে অনুপ্রবেশ রোধ করা যায়।

উচ্চতর প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক

উপরোক্ত বিষয়াবলীর ভিত্তিতে একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়, তা হল, যে সকল নেতা উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন, যেমন (শত্রুপক্ষের) আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা উচিত এবং কোন্ শ্রেণিটিকে না করা উচিত- এ সকল সিদ্ধান্ত যারা দিবেন, তাদের মাঝে শরিয়াহ এবং বাস্তবতার আলোকে সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ কী কী গুণ বা বৈশিষ্ট পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা উচিৎ?

যদিও হাইকমান্ড-উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্ব, কাজের সরাসরি তদারককারী মাঠ পর্যায়ের নেতৃত্ব (filed commanders) কিংবা অন্যান্য যারা অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার দিক থেকে সুবিদিত, সাধারণত তারাই উচ্চতর প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন, কোন্‌আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা উচিত এবং কোন্ শ্রেণিকে না করা উচিত-এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় বিশেষ নজর দেয়া জরুরি। স্বাভাবিকভাবেই এর জন্য মৌলিক কিছু নীতিমালা এবং এ সংক্রান্ত শরিয়তের সূক্ষ্ম কিংবা অস্পষ্ট হুকুম আহকামগুলো প্রস্তুত রাখা জরুরি এবং ওই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করার পূর্বে অবশ্যই মূল জিহাদি আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত বিজ্ঞ উলামাদের দ্বারা এর অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। যদি ওই মূহুর্তে মূল জিহাদি আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত বিজ্ঞ উলামাদের পাওয়া সম্ভব না হয়, তবে এমন একজন আলেমকে দিয়ে এর অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে যিনি গভীর ইলমের অধিকারী এবং (ইলমী অঙ্গনে) গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত। তাকে শরয়ী নীতিমালার আলোকে ওই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

অবশ্য শত্রুদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা জিহাদি আন্দোলনের বিদগ্ধ ওলামা কর্তৃক আগ থেকেই বৈধ বা আবশ্যকীয় লক্ষ্যবস্তু হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। আমি মনে করি, আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে (তাদেরকে টার্গেট করার জন্য) এটুকুই যথেষ্ট।

তবে যত কিছুই হোক, তাদেরকে টার্গেট করার সিদ্ধান্তটিও উচ্চ পর্যায়ের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছ থেকেই আসা উচিৎ। ওই সব লোককে এখন টার্গেট করলে ভালো হবে, নাকি দেরি করলে ভালো হবে, তা তারাই ঠিক করবেন। এবং এক্ষেত্রেও বিষয়টি কমপক্ষে মাঝারী লেভেলের আলেমদের সাথে পরামর্শক্রমে চূড়ান্ত করা উচিত।

যাই হোক, আমাদের কথা বা আমাদের সতর্কবার্তা যা এখানে আমরা বললাম, এগুলো আসলে পরবর্তীতে আসবে এমন কিছু পরিস্থিতি সংক্রান্ত এবং যা ভবিষ্যতে বিভিন্ন শ্রেণির

মানুষের মধ্যে কিংবা পরবর্তী বিভিন্ন পরস্থিতিতে দেখা যাবে। তাদেরকে টার্গেট করা বা না করার সিদ্ধান্ত কেবল অভিজ্ঞ লিডারদের উপরই ন্যস্ত নয়, বরং তাদের উপরও যারা (আলেম এবং জিহাদী মানহাজ সম্পর্কে) গভীর ইলমের অধিকারী, যা আমরা প্রথম থেকে বলে আসছি।

বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা পূর্বের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরবো যেখানে কিছু গ্রুপকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে, আর কিছু গ্রুপকে লক্ষ্যবস্তু করা থেকে বিরত থাকা হয়েছে

প্রথম উদাহরণ

মিশরে এক যুবক একটি ছোট জিহাদী গ্রুপ তৈরি করেছিল, যেটি সাংগঠনিক ভাবে মিশরের অন্যান্য জিহাদী গ্রুপগুলোকে অনুসরণ করত না। সে একটা পর্যায় পর্যন্ত এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিল এবং ‘আল উমদাহ ফী ইদাদিল উদ্দাহ’ [দ্যা রিলায়েন্স ইন প্রিপারেশন অফ দ্যা মেনি] গ্রন্থটি অধ্যয়ন করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, সে ফিকহুল জিহাদ বিষয়ক কিতাবাদি থেকে নেওয়া জিহাদের তাত্ত্বিক নিয়ম কানুনগুলোকে (জিহাদী মানহাজ সম্পর্কে) গভীর ইলমের অধিকারী উলামাদের সাথে পরামর্শ করা ছাড়াই মাঠে প্রয়োগ করা শুরু করে। নব্বইয়ের দশকে চলা সংঘর্ষের সময় এই দলটি ভেঙ্গে যায় এবং সেই যুবক ভাইটি মারা যায়। আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন এবং তাঁকে শহীদ হিসাবে কবুল করুন।

জানি না, আল্লাহ যদি তাঁকে জীবিত রাখতেন তাহলে তিনি কি তার ভুলটি সংশোধন করে নিতেন, নাকি তিনি মিশরের জিহাদী আন্দোলনগুলোর ব্যাপারে মিডিয়ার এ জাতীয় প্রোপাগান্ডা চালানোর দরোজা খুলে দিতেন যে, জিহাদীরা নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে। যে প্রোপাগান্ডার মোকাবেলা করা (আমাদের পক্ষে) খুবই কঠিন হয়ে যেত। কারণ, এর কিছু বিশ্বাসযোগ্যতাও ছিল।

কিছু কিছু সঠিক নিয়মকে এই ভাই ভুলভাবে প্রয়োগ করেছিল। আমি এই ভাইয়ের সাথে থাকা ব্যক্তিদের কাছ থেকে শুনেছি যে, তারা নিয়মগুলোকে বাস্তবে প্রয়োগও করেছিল, কমপক্ষে একবার হলেও। ওই নিয়মগুলোর একটি হলো, উদ্দেশ্য ভালো হলে অমুসলিম রাষ্ট্রে থাকা এমন যে কাউকে হত্যা করা বৈধ, যার ধর্মের বিষয়টি অজানা (সে কি কাফের, না, মুসলিম, না, মুরতাদ)।

নিয়মটি যদি এমন অমুসলিম রাষ্ট্রে প্রয়োগ করা হয়, যেখানকার অধিকাংশই কাফের তাহলে এটি অবশ্যই সঠিক কিন্তু যে অমুসলিম রাষ্ট্রের অধিকাংশই মুসলিম, সেখানে নিয়মটি প্রয়োগ করা যাবে না।

জিহাদ বিষয়ক কিতাবাদি এমন অনেক জিহাদী নিয়ম-নীতি রয়েছে যেগুলোকে ফিল্ড কমান্ডারদের দ্বারা প্র্যাকটিক্যালি প্রয়োগ করার পূর্বে অবশ্যই (জিহাদী মানহাজ সম্পর্কে) গভীর ইলমের অধিকারী কোন আলেমকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

তবে হ্যাঁ, প্রতিবারই এমন আলেমের কাছে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই, বিশেষ করে সেটি যদি পরিস্থিতির কারণে অসম্ভব হয়। যাই হোক, নির্দিষ্ট কোন শ্রেণির লোকদেরকে হত্যা করার জন্য টার্গেট বানানো অথবা এধরনের সুনির্দিষ্ট কোন একশন নেওয়ার নির্দেশনা অনুমোদন এবং বার বার প্রয়োগের পূর্বে কমপক্ষে প্রথমবার (জিহাদি মানহাজ সম্পর্কে) গভীর ইলমের অধিকারী কোন আলেমকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

দ্রষ্টব্যঃ ‘ধর্মের বিষয়টি অজানা ব্যক্তি’ বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে, যাকে দেখে বুঝা যায় না যে, সে কি মুসলিম, না, কাফের। তার মুসলিম হওয়ার প্রকাশ্য কোন চিহ্ন

নেই এবং কাফের হওয়ারও প্রকাশ্য কোন লক্ষণ নেই এবং এও জানা নেই যে, তার থেকে ঈমান ও ইসলাম ভংগকারী কোন কিছু পাওয়া গেছে কি না?

দ্বিতীয় উদাহরণ

পূর্বের উদাহরণে আমরা দেখলাম ‘ধর্মের বিষয়টি অজানা ব্যক্তির’ ব্যাপারে সৃষ্ট সমস্যা বুঝতে না পারাটা কীভাবে প্রায় ধ্বংসই ডেকে আনে। এই দ্বিতীয় উদাহরণে আমরা দেখব, আরেক ধরনের অবহেলা বা ইচ্ছে করে না বুঝার কারণে সৃষ্ট সমস্যা, যা হল ‘যে মুসলিমের মুসলিম পরিচয় লুকায়িত’। এটি আগেরটির চেয়ে আরও গুরুতর একটি বিষয় এবং আমরা এই সমস্যায় আজও পর্যন্ত ভুগছি। এটি ঘটেছিল আলজেরিয়াতে। ওখানকার সশস্ত্র ইসলামী গ্রুপের নেতাদের একের পর এক মৃত্যু, শৃঙ্খলার ব্যাপারে যাদের বেশ ভালোই জ্ঞান ছিল, তাদের বড় একটি অংশের মৃত্যুর পর সংগঠনের নেতৃত্ব অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞদের হাতে চলে গিয়েছিল আর তখনই ঘটনাটি ঘটেছিল।

এই নতুন নেতৃত্ব অস্পষ্ট কিছু দলিল প্রমাণের উপর ভিত্তি করে একটি অন্যায় নীতিকে অনুমোদন দিয়েছিল। তা হল, ‘যারাই আমাদের সঙ্গে নেই তারাই আমাদের শত্রু’।

ওই (মূর্খ্য ও অনভিজ্ঞ) লোকগুলো যারাই তাদের সাথে অমত পোষণ করত তাদের সবাইকে বিদ্রোহী এবং বিদআতী হিসেবে আখ্যায়িত করত, এমন কি যে সব জিহাদি গ্রুপ তাদের পতাকার নিচে যুদ্ধ করত না তাদেরকেও। যদিও নির্বাচনের পক্ষে লড়াইকারীদেরকে ‘পথভ্রষ্ট’ আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান সঠিকই ছিল। কিন্তু তাগুত থেকে সম্পর্কচ্ছেদ না করার কারণে তারা সাধারণ মসুলমানদেরকে (ঢালাওভাবে) কাফের এবং তাগুতের গোলাম আখ্যায়িত করত। (এটি তাদের ভুল সিদ্ধান্ত ছিল)

অবশ্য তাদের নিয়মটি সঠিক হত যদি নিয়মটি দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হত, যারা তাদের সাথে নেই এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন না কোন ভাবে তাগুতদের সাহায্য করে, সেই লোকগুলো তাদের শত্রু। (এমন হলে নিয়মটি ঠিকই ছিল) তারা নিয়মটিকে যেভাবে প্রয়োগ করেছিল তা কেবল এমন ব্যক্তি থেকেই হতে পারে যে যুক্তি এবং শরীয়াহ সম্পর্কে অজ্ঞ। আসলে এমনই হয়, যখন এধরনের বিষয়ে [সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য] মূর্খদেরকে কিংবা মাঝারী সারির আলেমদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় ।

এই নিয়মটির সঠিক প্রয়োগের সময়ও আমরা শত্রুর সাহায্যকারী সকল শ্রেণির লোকদেরকে তাৎক্ষনিকভাবে হত্যা করতে যাব না। বরং অবস্থা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে শত্রুর সাহায্যকারী কিছু কিছু লোককে লক্ষ্যবস্তু করাকে আমরা স্থগিত রাখবো যেমন, অসৎ ওলামা শ্রেণি।

দ্রষ্টব্যঃ ‘যে মুসলিমের মুসলিম পরিচয় লুকায়িত’- [এর অর্থ হল] যার মধ্যে মুসলিম হওয়ার কোন চিহ্ন প্রকাশিত থাকে, কিন্তু এটা জানা থাকে না যে, তার থেকে ঈমান ও ইসলাম ভঙ্গকারী কোন কিছু পাওয়া গেছে কি না?

অপর দিকটির কিছু উদারহণ

পূর্বের উদাহরণগুলো ছিল নির্দিষ্ট কিছু গ্রুপকে টার্গেট করার ব্যাপারে। এবার কিছু উদাহরণ তুলে ধরবো যেখানে কিছু গ্রুপকে টার্গেট করা থেকে হাত গুটিয়ে রাখা হয়েছে। এতে কোনো ভুল নেই যে, যেসব ইসলামী আন্দোলন একদিনের জন্যে হলেও ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুরতাদদের মোকাবেলায় যুদ্ধে জড়িয়েছে তাদের ইতিহাস বর্তমান তাগুত এবং তার সেনাবাহিনী ও সহযোগীদের ক্ষেত্রে এসে একেবারে হাস্যকর। এদেরকে টার্গেট বানানোর বিষয়ে তারা ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছে।

যে সব মুজাহিদ মিশরে ইহুদি দখলদারদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে অপারেশন পরিচালনা করতেন এবং ওই সব তাগুতদের বিরুদ্ধেও অপারেশন পরিচালনা করতেন যারা ফিলিস্তিনকে ইহুদিদের হাতে অর্পণ করেছিল সেই সব মুজাহিদদের সম্পর্কে হাসান আল বান্না (আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন এবং তাঁকেও) বলেছিলেন, ‘তারা না ইখওয়ানের সদস্য, আর না তারা মুসলিম’।

এ ধরণের চিন্তা-চেতনা ও বক্তব্যের মাধ্যমে মূলত সেই জিহাদী আন্দোলনগুলোর কবর রচনা করা হয়েছে, যেগুলো ফল দেয়ার মত একটা পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। অথচ তাদের এ জাতীয় চিন্তা-চেতনা শরয়ী ইলম এবং বাস্তবতা সম্পর্কে স্বল্প ধারণারই ফসল।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটি উদাহরণ ছিল গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে, যখন মিশরের ‘আল জামাআতুল ইসলামিয়া’র [Islamic Group in Egypt] মধ্যম সারির উলামাগণ একটি সিদ্ধান্ত জারি করেন- গ্রুপের মতামতে এবং এর সদস্যদের মাঝে ফিতনা ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে- যা কিছু শ্রেণীর লোকদেরকে টার্গেট করাকে নিষিদ্ধ করে, অপরদিকে একই সময়ে তাদের সামরিক শাখা এই শ্রেণীর লোকদেরকে কৌশলগত ও রাজনৈতিক দিক থেকে টার্গেট করা থেকে এড়িয়ে চলে। যাইহোক, পূর্ববর্তী গ্রুপের ঘোষণাসমূহ ও এর লিডার শাইখ ওমর আব্দুর রহমান (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) এর ফাতওয়া [আবার] উক্ত শ্রেণীর লোকদেরকে টার্গেট করতে অনুমোদন দেয় এবং আইনসম্মত করে দেয়। যার ফলে, তরুণ মুজাহিদীনদের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি হতে শুরু করে। অবশেষে যখন ফিতনা শুরু হয়েই গেল, কিছু কিছু নেতৃবৃন্দ ব্যাপারটি আরেকটু বাড়িয়ে বললেন এবং তারা ওই শ্রেণির লোকদের টার্গেট করাকে ‘অপরাধ’ বলা শুরু করলেন যাদেরকে ইতিমধ্যে মুজাহিদরা টার্গেট করেছে, যার ভিত্তি ছিল সেই ফাতওয়া এবং দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত অকাট্য প্রমাণাদি যা তাদেরকে ওই শ্রেণির লোকদেরকে টার্গেট করতে অনুমোদন দিয়েছিল এবং বাধ্যতামূলক করেছিল। [যাই হোক] এমনটি করে [অর্থাৎ, অপরাধ আখ্যা দিয়ে] তারা শহীদদের রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং যার ফলে মুজাহিদদের দলগুলো ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে, বিশেষ করে যখন অন্য কারণগুলোরও সামনাসামনি হতে হয়েছে।

হে আমার মুজাহিদ ভাই! ঠিক যেভাবে আমরা আপনাকে মধ্যম সারির উলামাদের রায়ের উপর ভিত্তি করে কিছু শ্রেণীর লোকদেরকে টার্গেট করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলাম, ঠিক একইভাবে মধ্যম সারির উলামাদের ফতোয়া অথবা মিথ্যা গুজবে বিশ্বাসী অজ্ঞ লোকদের কথামত কিছু শ্রেণীকে লক্ষ্যবস্তু না করার বিরুদ্ধেও সতর্ক করছি, বিশেষ করে যে শ্রেণীর লোকদেরকে (দুনিয়া থেকে) মুছে ফেলা বিশ্বাসীদের জন্য রহমত স্বরূপ এবং দীনের জন্য মর্যাদা এবং বিজয় স্বরূপ। তাদেরকে লক্ষ্যবস্তু না করার ব্যাপারে সতর্ক হোন। হ্যাঁ, যদি হাইকমান্ড বা কোন অঞ্চলের ফিল্ড কমান্ডারদের ইচ্ছার ভিত্তিতে ওই শ্রেণীর লোকদেরকে টার্গেট করার ক্ষেত্রে কিছুটা দেরি করা হয় তবে তা হতে পারে, এটি তাদের এখতিয়ারভুক্ত। ওই টার্গেটের বিরুদ্ধে জিহাদী এ্যাকশনে গেলে কী লাভ হবে সেই হিসেব করে তারাই এই সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য জাহিরকারী ওই সব লোকদের থেকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে যারা বলবে যে, ওই শ্রেণীর লোকদেরকে টার্গেট করার ক্ষেত্রে দেরি করার কারণ হল, তাদেরকে টার্গেট করা বৈধ নয়।

৩য় পরিচ্ছেদঃ

পরিক্ষীত ও সফল প্রমাণিত সামরিক কৌশলসমূহের ব্যবহার।

প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বা কাজ মুমিনের হারানো সম্পদ। আমরা সাধারণ ভাবে আমাদের সকল সামরিক কর্মকান্ডে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের পথেরই অনুসরণ করি এবং সামরিক কর্মকান্ডের নীতিনির্ধারণে আমরা শরিয়ার নীতিমালাই গ্রহণ করি। তবে হ্যাঁ, শরিয়া আমাদেরকে এটুকু অনুমতি দিয়েছে যে, আমরা

কাফেরদের ওই সব পরিকল্পনা ও নীতিমালা গ্রহণ করতে পারবো যেগুলোতে কোন ধরণের পাপ জড়িত থাকবে না।

পরিতাপের বিষয় এই যে, ছোট ছোট কিছু জিহাদী গ্রুপ জিহাদের পূর্বেকার ধাপগুলোতে (অমুসলিমদের গবেষণালব্ধ) সামরিক নীতিমালাগুলো উপেক্ষা করেছিল; তবে সেটা শরিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে নয়, বরং তাদের অপরিকল্পিত ও গৎবাঁধা কিছু নিয়মনীতির কারণে। পাশাপাশি তরুণদের দ্রুততম সময়ে শাহাদাত অর্জনের আকাঙ্ক্ষাও ছিল এর একটি কারণ। সামরিক এ্যাকশনগুলো ছোট বা বড় যাই হোক তাতে গবেষণালব্ধ নীতিমালার আলোকে কাজ করা হলে এটাই লক্ষ্য অর্জনের পথে একটি বড় পদক্ষেপ।

সামরিক অভিযানে সফল প্রমাণিত নীতিমালার অনুসরনের ফলে অপরিকল্পিত ও গৎবাঁধা নিয়মনীতির দরুন আগত ভোগান্তির অবসান ঘটবে ইনশাআল্লাহ। অপরিকল্পিত নিয়মনীতি পরিহার করে বুদ্ধিবৃত্তিক, একাডেমিক এবং পরিক্ষিত সামরিক মূলনীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং সামরিক বিজ্ঞানের ব্যবহার আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের লক্ষ্য অর্জনকে সহজ করবে এবং উন্নতি-অগ্রগতিকে সক্ষম তরান্বিত করবে।

এ মূলনীতিগুলোর শিক্ষা একজন ব্যক্তির চোখের সামনে সৃজনশীলতার এক প্রশস্ত দিগন্ত উন্মোচন করে এবং এর মধ্য দিয়ে নতুন নতুন লিডারের আবির্ভাব ঘটতে পারে যারা তাদের [উদ্ভাবিত] ত্বত্ত্বসমূহ আধুনিক ইতিহাসের বইতে লিখবেন, বিশেষ করে যখন আমাদের সময়ের সামরিক বিদ্যার বইগুলোতে এ তথ্য উপেক্ষিত যে, অধিকাংশ সামরিক মূলনীতিই আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে নেওয়া হয়েছে।

এখানে আমি এসকল মূলনীতি সংক্রান্ত কিছু উদাহরণ পেশ করব, যাতে আমাদের চিন্তা শক্তি শানিত হয় এবং আমাদের সামরিক এ্যাকশনগুলোর কার্যকারিতা বাড়াতে এ মূলনীতিগুলোর গুরুত্ব কতখানি তা পরিষ্কার হয়।

[১ম মূলনীতি]

একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হল, যদি নিয়মতান্ত্রিক সেনাবাহিনী এক জায়গায় জড়ো হয়ে থাকে তাহলে নিয়ন্ত্রণ হারায়, এর বিপরীতে যদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তবে কার্যকারিতা হারায়।

মূলনীতিটির প্রথম নির্দেশনা হল, শত্রু সেনাদের এক জায়গায় একত্রিত থাকা ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার মাঝে যে ভারসাম্যতা থাকে, তাতে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য আমাদের সামরিক অপারেশন চালাতে হবে। এর অর্থ হল, আমরা যখন নির্দিষ্ট কোন স্থানে বা নির্দিষ্ট কোন টার্গেটকে লক্ষ্য করে আক্রমণ করব তখন তাদের জন্য সেখানে বিপুল পরিমাণে সৈন্য মোতায়েন করা সম্ভব হবে না। যদি তারা তা করে তাহলে প্রথম গুলিটি ছুড়তে না ছুড়তেই তারা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক ইউনিট অন্য ইউনিটকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে শুরু করবে। এ কারণে শত্রুরা একটি স্থানের (যুদ্ধ ক্ষেত্রের) প্রকৃতি ও আকারের উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্যই সেখানে মোতায়েন করে থাকে। এ কারণে আমাদেরকে জানতে হবে [যুদ্ধ ক্ষেত্রের] কোন প্রকৃতি ও আকারের জন্য কী পরিমাণ সৈন্য মোতায়েন করা হয়, যা আমাদেরকে তার ওপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করবে। কারণ, নির্দিষ্ট কোন স্থানে শত্রু সেনার সংখ্যা একটি সীমার চাইতে বাড়ানো অসম্ভব। একই ভাবে মূলনীতিটির প্রথম ভাগ থেকে আমরা বুঝতে পারি, যে কোন সময়, যে কোন পরিস্থিতিতে যুদ্ধ আসন্ন হলে সেই যুদ্ধের ‘ময়দান বা ক্ষেত্র’ নির্ধারণ করার কৌশল শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি।

মূলনীতিটির দ্বিতীয় অংশটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, প্রথম অংশটির উপরও এর প্রভাব রয়েছে। তা হল, শত্রু সেনারা যখন বিরাট এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তখন তারা কার্যকারিতা হারায়, তখন তাদেরকে আক্রমণ করাও সহজ হয়। সম্ভবত মূলনীতিটির এই অংশটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা জিহাদের সঠিক বুঝ সম্পন্ন যুবকরা অনুসরণ করে থাকে। আমরা দেখেছি, কীভাবে তারা একে কাজে লাগিয়ে শত্রুর সবচেয়ে বড় টার্গেটের ওপর আক্রমণ করে শত্রু সৈন্যদেরকে বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে তাদের শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে দিতে সক্ষম হয়েছে। একই ভাবে আমরা দেখেছি, যারা এই নির্দেশনাটির ব্যাপারে অজ্ঞ তাদের অধিকাংশই ব্যর্থ হয়েছে।

মিশরের ‘আল জামাআতুল ইসলামিয়াহ’র বেলায় এমনটাই ঘটেছিল; যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। শত্রু সেনাদেরকে পুরো মিশর জুড়ে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করার সক্ষমতা তাদের ছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে দলটির কিছু নেতৃবৃন্দ এ বিক্ষিপ্তকরণ প্রক্রিয়াকে থামিয়ে দিয়েছিল। এর ফলে সরকার নির্ধারিত কিছু এলাকায় সৈন্য মোতায়েন করে পুরো পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলে।

[২য় মূলনীতি]

অপারেশনের হার বিষয়ক মূলনীতিঃ অপারেশনের হার কি ঊর্ধ্বমুখী, নাকি ফিক্সড, নাকি উঠানামা করে? যুদ্ধের ধাপগুলোতে আমাদের অপারেশনের হার কখনও কখনও এই তিন ধরনেরই হয়ে থাকে।

মূলনীতিটির ব্যাখ্যাঃ অপারেশনের হার বাড়ানোর উদ্দেশ্য হল লোকদেরকে, সাধারণ জনতাকে এবং শত্রু বাহিনীর নিচের সারির সৈন্যদেরকে একটি জীবন্ত ও বাস্তব বার্তা দেয়া যে, মুজাহিদদের শক্তি ক্রমবর্ধমান ও ঊর্ধ্বমুখী। এ সব লোকেরা এই মূলনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়, যার ফলে অপারেশনের ক্রমবর্ধমান হার তাদের মনের উপর ছাপ ফেলে- সেটা অপারেশনের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে হোক বা অপারেশনের ধরন বা গুণগত মানের কারণে হোক অথবা অপারেশনের খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার কারণে হোক অথবা এই সবগুলোর কারণেই হোক। এর ফলে তাদের মনে এ কথা গেঁথে যায় যে, মুজাহিদরা অনবরত এগিয়ে চলেছেন এবং শত্রু পক্ষ পিছু হটছে এবং শত্রুর ভাগ্যে পরাজয় ছাড়া কিছু নেই। এটি সাধারণ জনগণকে উৎসাহিত করে এবং তাদের মধ্যে আশা জাগ্রত করে, যা তাদের পক্ষ থেকে জিহাদী আন্দোলনের প্রতি স্থায়ী সমর্থন প্রাপ্তি ও আন্দোলনের ক্রমবর্ধমানতাকে সহজ করে তোলে।

এ কারণে আমরা যখন অপারেশন পরিকল্পনা করব তখন আমাদের উচিত, ছোট ছোট অপারেশন দিয়ে শুরু করা, তারপর একটু বড়, তারপর আরও বড় এভাবে অগ্রসর হওয়া- যদিও আমরা শুরুতেই অনেক বড় বড় অপারেশন করার ক্ষমতা রাখি। (শত্রুর সাথে) সংঘর্ষের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে আল-কায়দা ঠিক এভাবেই অপারেশনগুলো সাজিয়েছিল। এভাবে ক্রমবর্ধমান হারে অপারেশন পরিচালনার ফলে বহুবিধ উপকার সাধিত হয় যেগুলোর কথা বলাই বাহুল্য, বিশেষ করে অপারেশন পরিচালনাকারী তরুণদের অনেক উন্নতি হয় (দক্ষতাবৃদ্ধিসহ তাদের মাঝে পরিপক্কতা আসে) এবং তারা এধরনের সংঘর্ষ ও (যুদ্ধের) অন্যান্য দিকের সাথে ক্রমান্বয়ে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে।

উল্লেখ্য, পূর্বের মূলনীতিটির দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ শত্রুকে বিক্ষিপ্তকরণ (এখানে উল্লেখিত) ক্রমবর্ধমান হারে অপারেশন সংক্রান্ত মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে বিশাল এলাকা জুড়ে ছোট ছোট অপারেশন দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। কিছুদিন পর এর চেয়ে বড় ধরনের কিছু অপারেশন করতে পারি, যেগুলো সংঘটিত হবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরস্পর নিকটবর্তী এলাকায়। এই ক্রমবর্ধমান হার একটি নির্দিষ্ট ধাপের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। অতঃপর এটি ‘স্থির’ হারে পরিবর্তিত হতে পারে কিংবা পরিস্থিতি অনুযায়ী হার বাড়ানো-কমানো যেতে পারে।

তরঙ্গাকারে অপারেশন পরিচালনা করা (অর্থাৎ অপারেশনের হার পর্যায়ক্রমে বাড়াতে বাড়াতে একটি সীমায় পৌঁছার পর আবার পর্যায়ক্রমে কমাতে কমাতে একটি সীমায় পৌঁছা, এভাবে এক ধরনের ‘সিরিজ অফ অপারেশন’ জারি রাখা, এটি) ওই সকল গ্রুপের জন্য উপযুক্ত যাদের সামরিক ঘাঁটিগুলো এবং প্রতিরক্ষার জায়গাগুলো বেশ মজবুত ও দুর্ভেদ্য এবং অপারেশন চালানোর স্থান থেকে বেশ দূরে। একইভাবে এটা উপযুক্ত তাদের জন্য যারা শত্রুকে এই বার্তা দিতে চায় যে, ভীতি সৃষ্টিকারী এ অপারেশন তরঙ্গ এবং তাদের দুঃষ্কর্মের মাশুল প্রদান কখনোই থামবে না এবং অপারেশন সাময়িক বন্ধ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এটা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে এখন তারা মুসলিম জনসাধারনের সাথে যা খুশি তাই করতে পারবে বরং অপারেশন সাময়িক বন্ধ হওয়ার অর্থ হল, আমরা অপারেশনসমূহের আরেকটি ঢেউ বইয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, যে অপারেশনগুলো ওদের অন্তরকে ভীত-সন্ত্রস্ততায় ভরে দেবে আর সে ভয় কখনো দূর হবার নয়। আর এভাবেই শত্রুরা মুসলিম জনতার উপর জুলুম করা বন্ধ করবে বা (অন্তত) পরিমাণ কমিয়ে আনবে। আল্লাহ তাআলা একটি চুড়ান্ত ফায়সালা করার আগ পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকবে। আমি মনে করি, অপারেশন পরিচালনার এই ‘তরঙ্গপদ্ধতি’ দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকা অধিকাংশ রাষ্ট্রগুলোর জন্য উপযুক্ত। যা আমরা আগের অধ্যায়ে আলোচনা করে এসেছি।

[৩য় মূলনীতি]

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি, যা সাধারণ কৌশল হিসেবে যেমন উপযোগী তদ্রুপ ছোটখাট অপারেশন পরিকল্পনার জন্যেও বেশ যুৎসই। সেটি হল, ‘নিজের সবটুকু শক্তি দিয়ে প্রচন্ডভাবে শত্রুর সবচেয়ে দূর্বল পয়েন্টে আঘাত করো’।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কীভাবে (আল কায়েদার) হাই কমান্ড আরব উপদ্বীপের যুবক ভাইদেরকে তীব্র আঘাতকারী ফোর্স হিসেবে কাজে লাগিয়েছিলেন। কিন্তু হাই কমান্ড তাদেরকে আরব উপদ্বীপকে (বিশেষ করে সৌদি আরবকে) পরিবর্তন করার জন্য মনোনীত করেননি। ইতিপূর্বে ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা নিয়ে করা গবেষণাপত্রে এর কারণগুলো উল্লেখ করা হয়েছিল (যেমন, তখন সৌদি আরবকে অগ্রগণ্য রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য করা হত না) কিন্তু সেপ্টেম্বরের যুগান্তকারী ঘটনার পর এই কারণগুলো উল্টে যায় এবং সৌদি আরব অগ্রগণ্য রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হয়। এমনকি আমরা দেখেছি, হাই কমান্ড একে বেশ অগ্রাধিকার দিচ্ছেন, কারণটা ছিল এর ভেতরের শত্রু- অর্থাৎ আল সউদ সরকার, যারা মুজাহিদদের তীব্র বিরোধীতাকারী অন্যান্য সরকারের মতোই। এ কারণে আরব উপদ্বীপ (বিশেষ করে সৌদি আরব) এই মূলনীতিটি প্রয়োগ করার আদর্শ স্থান বলে গণ্য হয়।

[ছোট অপারেশন পরিকল্পনার সময় এই মূলনীতি প্রয়োগের একটি উদাহরণ]

ধরুন, দশ জনের একটি ছোট সক্রিয় গ্রুপ খুবই সাধারণ একটি অপারেশন করবে- অপারেশনটি ফিদায়ী অপারেশন নয়। অপারেশনটি আসলে এক জন বা দুই জন দিয়েই করানো যায়। বরং কখনো কখনো এর চেয়ে বড় অপারেশনের জন্যও একজন বা দুইজনকে পাঠায়। যাই হোক, (আল্লাহর ইচ্ছায়) নিরাপদ এই অপারেশনে যদি গ্রুপটি তার সকল সদস্যকে হত্যাযজ্ঞ চালানো এবং শত্রুকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলার জন্য প্রেরণ করে তখন এই খবর নিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে এবং খবরের কাগজগুলোতে ব্যাপক আলোচনা হবে, তখন শত্রুরা চিন্তা করবে যে, সামনের অপারেশন হয়তো এর চেয়ে আরও বেশি সমন্বিত হবে এবং সংখ্যাগত বৃদ্ধিও সমানুপাতে হবে। যা মিডিয়াতে মুজাহিদদের সুখ্যাতি বৃদ্ধি করবে এবং তাদের মোকাবেলায় আসতে শত্রুর অন্তরকে কাঁপিয়ে তুলবে।

তবে এই মূলনীতিটি প্রয়োগ করতে হবে এর সম্ভাব্য সকল দিক এবং উপকারিতা-অপকারিতা বিশদভাবে পর্যালোচনা করার পর। অপারেশনে জনবল ব্যবহারের পরিমাণ যতটুকু লাগে ততটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই সাধারণত অগ্রগন্যতা পাবে।

এমনিভাবে ভিন্নতর পরিস্থিতিতে, ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এই মূলনীতির বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার রয়েছে, যেমনটি অন্যান্য মূলনীতির ক্ষেত্রেও দেখা যায়। যেমন, সহজে আক্রমণ করা যায় এমন একটি টার্গেট, ধরুন শত্রুর একটি বিল্ডিং, যেখানে তারা মিটিং করে। সেটিকে একটি ছোট্ট বুবি-ট্র্যাপ দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া যায়, তবে আমাদের কাছে বিস্ফোরকের বিশাল মওজুদ রয়েছে, এই ক্ষেত্রে পরিমাণমত বিস্ফোরক ব্যবহার করে বিল্ডিংটাকে শুধু ধ্বংস করাই নয় বরং এটিও সম্ভব যে, একে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হবে, জমিন বিল্ডিংটাকে পুরোপুরি গিলে ফেলবে। এমনটি করলে শত্রু আরও বহুগুণ বেশি ভীতসন্ত্রস্থ হবে এবং ভালো মিডিয়া কাভারেজ [লক্ষ্য] অর্জিত হবে, যার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য একটি হল, শত্রু তার ক্ষয়ক্ষতি গোপন করতে পারবে না। এরকম অপারেশন বার বার চালাতে হবে, ফলশ্রুতিতে বেশ বড় মাপের একটা সফলতা অর্জিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

[৪র্থ মূলনীতি]

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি, যা অতীতে ও বর্তমানে যুদ্ধের অন্যতম একটি স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত, সমরবিদ ও ঐতিহাসিকগণ এখনও বলেন, জিহাদী গ্রুপগুলো তাদের সমস্ত শত্রুর পতন দ্রুত নিশ্চিত করতে যে মূলনীতির উপর নিজেদের মনযোগ নিবদ্ধ করেছে তা হল, ‘সামরিক দিকে দিয়ে প্রচন্ড শক্তিশালী শত্রুকে পরাজিত করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল, ক্রমান্বয়ে তার সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ক্ষয় করে ফেলা’।

শত্রুকে অর্থনৈতিকভাবে নিঃশেষকরণ সামরিক অপারেশন চালানোর মাধ্যমেই করা হয়। অন্যান্য উপায়ও রয়েছে। রাম্সফেল্ড তার (সৈন্যদের) পিছিয়ে আসার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাংবাদিকদের বলেছিল, ‘আমরা আর কিই বা করতে পারি? আপনারা ভুলে যাবেন না, আমরা এমন এক শত্রুর মোকাবেলা করতে গিয়ে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করেছি যে শত্রু মাত্র কয়েক মিলিয়ন ডলার খরচ করে’। সে যদিও মিথ্যাবাদী তবে এ ক্ষেত্রে সে সত্য কথাটিই বলেছে।

এক বিদেশী গবেষক (তার এক গবেষণা প্রবন্ধে) বলেছিলেন, যে কারণে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটেছিল তা হল, ছোট ছোট যুদ্ধের মাধ্যমে এবং এ ছাড়া আরও কিছু উপায়ে তার অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি নিঃশেষ করে ফেলা হয়েছিল, বিশেষ করে আফগান যুদ্ধ এবং এ যুদ্ধের ফলে আরও যা যা হয়েছিল। আমেরিকাকেও সাম্প্রতিক যুদ্ধগুলোতে মোটামুটি সেই একই ভাগ্য বরণ করতে হবে। তিনি এই বলে একটু কৌতুক করে তার গবেষণা প্রবন্ধটি শেষ করেছিলেন যে, আমেরিকার (অর্থনৈতিক ও সামরিক) শক্তিকে নিঃশেষ করে তার পতন ত্বরান্বিত করতে শত্রুর প্রয়োজন হবে না। কারণ, বুশ নিজেই এ কাজটি খুব ভালো ভাবে করেছে।

এ আলোচনার নিচের দিকে কিছু পয়েন্টে অর্থনৈতিকভাবে নিঃশেষকরণের কিছু পদ্ধতির সম্ভাব্য ব্যাখ্যা প্রদান করা হবে। এর সাথে শরয়ী বিবেচনা, পরিকল্পনা এবং মিডিয়ার দিকটাও বিবেচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আমাদের উল্লেখিত এ সব কিছু উদাহরণ মাত্র এবং প্রত্যেকটাই সাধারণ নীতিমালা এবং দিক নির্দেশনার সাথে সম্পৃক্ত। যাই হোক, বুঝমান ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, জিহাদী অপারেশনের সবচেয়ে ছোট ইউনিটকেও বিশেষ বিশেষ কিছু নিয়ম-কানুন অবশ্যই রপ্ত করতে হয় – হোক তা কেবলমাত্র অস্ত্র প্রস্তুত করা, সংরক্ষণ করা ও পরিষ্কার করা- কমপক্ষে প্রত্যেকের যা দায়িত্ব ওটার সাথে সংশ্লিষ্ট নিয়ম কানুন। এখানে এ সংক্রান্ত যথাযথ একটি উদাহরণ আমি পেশ করতে পারি, তা হল, মিশরের সবচেয়ে কুখ্যাত তাগুত তথ্যমন্ত্রী সাফওয়াত শরিফের হত্যা চেষ্টার ঘটনা। এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল কারণ যার এই তাগুতকে হত্যা করার কথা ছিল সে অপারেশন চালানোর রাতে তার অস্ত্রটি আদ্র জায়গায় রেখেছিল। ফলে আসে মন্ত্রীকে গুলি করার, তখন গুলি (তার অস্ত্রের) ভিতরে আটকে যায় এবং (এ সুযোগে) মন্ত্রী বেঁচে যায়।

সামরিক নীতিমালা, তত্ত্ব ও যুদ্ধ কৌশল অধ্যয়নের জন্য আমরা যে সব তথ্যসূত্র বাছাই করেছি তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নরূপ,

- আফগান মুজাহিদদের প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন জিহাদী সমগ্র বা বিশ্বকোষ।

- ‘আল-বাত্তার’ পত্রিকা, যা আরব উপদ্বীপের সামরিক ক্যাম্পগুলো থেকে প্রকাশিত হয়।

- ‘আল-আনসার’ পত্রিকায় প্রকাশিত আবু উবাইদ আল কুরাইশী হাফিযাহুল্লাহর প্রবন্ধগুলো। এমনিভাবে ‘আল-উসওয়াহ আল-হাসানাহ’ (উত্তম আদর্শ) নামক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত আবু উবাইদা আল-কুরাইশী ও অন্যান্যদের পুরানো লেখাগুলো।

- যুদ্ধ কৌশলের ওপর লেখা সাধারণ বইপত্র, বিশেষ করে গেরিলা যুদ্ধের ওপর লেখা বই, যদি পাঠক ওসব বইয়ে থাকা শরীয়া সংক্রান্ত ভুলগুলো সংশোধন করতে পারে।

৪র্থ পরিচ্ছেদঃ

কঠোরতার যথাযথ ব্যবহার

যারা শুধু তাত্ত্বিক জিহাদ অধ্যয়ন করে অর্থাৎ কেবল বইয়ের পাতা থেকে জিহাদ শিখে তারা এই পয়েন্টটি কখনোই ভালোভাবে বুঝবে না। দুঃখজনক ভাবে, উম্মাহর যুবকদের কাছ থেকে অস্ত্র সরিয়ে রাখার পর থেকে তারা যুদ্ধের প্রকৃতি বুঝতে অক্ষম হয়ে গেছে। তবে যারা আগ থেকে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত তারা জানে যে, জিহাদ বা যুদ্ধ মানে কঠোরতা, নির্মমতা, সন্ত্রস্তকরণ, বিতাড়িতকরণ ও হত্যাযজ্ঞ ছাড়া আর কিছুই নয়। (মনে রাখবেন) আমি এখানে যুদ্ধ-জিহাদের কথা বলছি, ইসলামের (কোমলতা ও নম্রতার দিকগুলোর) কথা বলছি না। সুতরাং এ দু‘টিকে গুলিয়ে ফেলবেন না। তারা এও জানে যে, জিহাদের প্রাথমিক ধাপে শত্রুর প্রচুর রক্তপাত ঘটানো এবং (উপর্যুপরি আক্রমণের মাধ্যমে) তাদেরকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়া ছাড়া জিহাদ অব্যাহত রাখা এবং জিহাদের এক ধাপ থেকে অপর ধাপে অগ্রসর হওয়া যায় না। এমনকি অনেক সময় পরবর্তী ধাপগুলোতেও এসব কঠোরতা ও নির্মমতার প্রয়োজন হয়। নমনীয়তা অবলম্বন করে জিহাদ অব্যাহত রাখা অসম্ভব, চাই তা জিহাদের দাওয়াহর পদ্ধতির ক্ষেত্রে হোক বা সিদ্ধান্ত ও অবস্থান গ্রহণের ক্ষেত্রে হোক কিংবা অপারেশনের কৌশলের ক্ষেত্রেই হোক। কারণ, যে কোন জিহাদী কাজে ব্যর্থতার একটি কারণ হল, নমনীয়তা অবলম্বন। যারা জিহাদী কাজ শুরু করার ইচ্ছা রাখে আবার নমনীয়তাও অবলম্বন করে তাদের জন্য ঘরে বসে থাকাই ভালো। এটি ত্যাগ না করলে ব্যর্থতাই হবে তাদের ভাগ্য এবং পরবর্তীতে তারা নানান বিপদাপদের সম্মুখীন হবে। আমি যা বললাম তা যদি কেউ যাচাই করতে চায় এবং বুঝতে চায় তবে সে যেন অবশ্যই ইতিহাসগ্রন্থ এবং আধুনিক জিহাদী আন্দোলনগুলোর ওপর কী কী অবস্থা অতিবাহিত হয়েছে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে। আমরা নমনীয় বা কঠোর যেমনই হই না কেন, আমাদের শত্রুরা আমাদেরকে ধরতে পারলে আমাদের প্রতি কখনোই দয়া দেখাবে না। এ কারণে আমাদের উচিৎ, শত্রুদেরকে বাধ্য করা যেন তারা আমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে হাজার বার ভাবে।

যারা জীবনে কোনও দিন কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তাদের বেশির ভাগই কাফেরদের বিরুদ্ধে সামরিক ও মিডিয়া যুদ্ধে কঠোরতা ও নির্মমতার ভূমিকা বুঝতে পারবে না। বর্তমানে (কুফফার কর্তৃক) মুসলমানদেরকে পোষ মানিয়ে রাখার এই পরিস্থিতি এরই কুপ্রভাবের কারণে ফলাফল। একারণে (জিহাদের ক্ষেত্রে) কঠোরতা এবং নির্মমতার বিষয়টি ওই সব যুবকদেরকে খুব ভালোভাবে বুঝাতে হবে যারা জিহাদ করার ইচ্ছা রাখে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের সময়কার আরবদের চিন্তা- চেতনা আর এই যুবকদের চিন্তা-চেতনার মধ্যে রয়েছে বিরাট তফাত। আরবরা যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত ছিল এবং যুদ্ধের ধরণ-প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের বেশ জানাশোনাও ছিল।

আমরা যদি আমাদের জিহাদের ক্ষেত্রে কঠোর না হই, আমাদেরকে যদি নমনীয়তা পেয়ে বসে তবে তা হবে আমাদের শক্তি ও দৃঢ়তা হরণকারী কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি কারণ। যে শক্তি ও দৃঢ়তা সত্যের বার্তাবাহী এ উম্মাহর স্তম্ভগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি স্তম্ভ। শক্তি ও দৃঢ়তার অধিকারী উম্মাহই পারে যে সব অঞ্চল সে (ইতিমধ্যে) জয় করেছে তা রক্ষা করতে। এমন উম্মাহই পারে কঠিন থেকে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে এবং (নিজ অবস্থানের ওপর) পাহাড়ের মতো অটল অবিচল থাকতে। (তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে,) এই উন্নত গুণগুলো এ যুগে আমরা হারাতে বসেছি।

[ইতিহাস থেকে কিছু উদাহরণ]

ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে আমরা দেখি যে, আব্বাসীয় আন্দোলন- কিছু সংস্কারবাদী জিহাদী আন্দোলন ও নফসে যাকিয়্যা (মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান রহ.) প্রমুখদের মতো কিছু সত্যান্বেষী নেক লোকদের আন্দোলন থেকে ভিন্ন ছিল। আব্বাসীয়রা তাদের আন্দোলনে সফল ছিল। সফলতার পিছনে কারণ ছিল তাদের কঠোরতা ও নির্মমতা। আর তার প্রতিপক্ষের ব্যর্থতার কারণ ছিল নমনীয়তা ও (যথাসম্ভব) রক্তপাত না ঘটানোর চেষ্টা। তাদের রক্তপাত না ঘটানোর চেষ্টা এই পর্যায়ের ছিল যে, নফসে যাকিয়্যাহ (মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান রহ.) তাঁর সেনাপতিদেরকে বলতেন, তারা যেন যথাসম্ভব রক্তপাত না ঘটায়। অথচ তাঁরই বিজয়ের সম্ভাবনা ছিল। তাঁর সেনাপতিরা তাঁর এই অনুরোধ এবং নমনীয় পদ্ধতি দেখে বিস্মিত হয়েছিল। অবশ্য তিনি এবং অন্যান্য শান্তি প্রতিষ্ঠাকারীরা এ ক্ষেত্রে ঠিকই করেছিলেন। কারণ, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন এবং বিদ্রোহী মুসলমানদের সাথে লড়াইয়ের বিধান (কাফের ও মুরতাদদের সাথে লড়াইয়ের বিধান থেকে) একটু ভিন্নই। আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ ক্রুসেডার ও তাদের সহায়তাকারী মুরতাদদের সাথে লড়াই করছি। একারণে তাদের রক্তপাত ঘটাতে আমাদের কোনও বাধা নেই। বরং এটি ফরজসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি ফরজ, যে পর্যন্ত না তারা তওবা করবে, সালাত আদায় করবে এবং যাকাত দিবে এবং দীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যাবে।

[সাহাবায়ে কেরাম রাযি.র কঠোরতা]

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. কঠোরতা ও নির্মমতার ব্যাপারটি বুঝতেন। নবী রাসূলদের পর তাঁরাই (যুদ্ধের) কায়দা কানুনগুলো সবচেয়ে ভালো বুঝতেন। এমনকি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. ও হযরত আলী রাযি.র দ্বারা (বিশেষ কারণে) আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করার মত ঘটনাও ঘটেছে, (সাধারণভাবে) বিষয়টি অপছন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও। তাঁরা দুজন (হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. ও হযরত আলী রাযি.) এবং সাহাবীদের মধ্যকার নেতৃস্থানীয়রা এবং তাদের সৈন্যরা এটা এ কারণে করেননি যে, তারা হত্যা করতে পছন্দ করতেন এবং তারা কঠোর প্রকৃতির ছিলেন। আল্লাহর শপথ! (তাঁরা মোটেই এমন ছিলেন না, বরং) তারা অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। নবী রাসূলগণের পর আল্লাহর মাখলুকের প্রতি তারাই ছিলেন সবচেয়ে বেশি দয়ালু। হ্যাঁ, সাহাবীগণ কুফর ও কাফেরদের চরিত্র কী, তা খুব ভালোভাবে বুঝতেন এবং কোথায় কঠোরতা দেখানো প্রয়োজন আর কোথায় কোমলতা দেখানো প্রয়োজন তাও তাঁরা ভালো করে বুঝতেন।

ওলামায়ে কেরাম মুরতাদদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তা থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, (তাঁদের বর্ণনাটি হল এমন) “লোকেরা তাদের পূর্বের জাহিলী অবস্থায় ফিরে গিয়েছিল এবং শরিয়ার আবশ্যকীয় বিধানগুলো থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিয়েছিল। তাদের কেউ কেউ সম্পূর্ণ শরিয়তকেই ত্যাগ করে। কেউ কেউ যাকাত দিতে অস্বীকার করে। তাদের কথা হল, যাকাত কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে প্রদান করাই ফরজ ছিল। আবু বকর রাযি.র যাকাত গ্রহণ করার কোনও অধিকার নেই। তাদের কেউ কেউ ঘোষণা করেছিল, তারা নিজেরা যাকাত আদায় করবে। (অর্থাৎ নিজেদের লোকদের যাকাত নিজেরাই একত্রিত করে নিজেরাই বন্টন করবে) আবু বকর রাযি. কাছে দিবে না। দুর্বল ঈমানের অধিকারী মুসলমানরা ভেবেছিল,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর মাধ্যমে ইসলামের তরবারির ধার ভেঙ্গে গেছে, ফলে তারা ধর্ম ত্যাগের জন্য এটাকে মোক্ষম সুযোগ মনে করে। এভাবেই ধর্ম ত্যাগের ফিতনা গোটা আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কা, মদীনা, তায়েফ এবং বাহরাইনের জুওয়াসা ছাড়া ইসলামের অধীনে কোন এলাকাই ছিল না। ইরতিদাদের এ ফিতনা গোত্র, গ্রাম এবং গ্রুপগুলোকে বেষ্টন করে ফেলেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ যথাযথভাবেই তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং চরম উদ্দীপনা নিয়ে তাদেরকে এ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা জিহাদের ঝান্ডাকে উঁচু করেছিলেন। এ সময় হযরত আবু বকর রাযি.র মধ্যে এমন কঠোরতা ও নির্মমতা দেখা গিয়েছিল যা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। এমনকি যখন সংবাদবাহকেরা এমন এমন সংবাদ নিয়ে তাঁর কাছে আসত- যা অন্যদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে ফেলত- তখন তিনি যুদ্ধের আগুন আরও বাড়ানোর নির্দেশ দিতেন।

[হযরত আবু বকর রাযি.র কঠোরতা]

হযরত দিরার বিন আযওয়ার রাযি. বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর হযরত আবু বকর রাযি. অপেক্ষা তুমুল যুদ্ধ অভিজ্ঞতায় অধিক পারদর্শী আর কাউকে দেখিনি। আমরা তাঁকে ইরতিদাদের ফিতনা ও এর ভয়াবহতার সংবাদ দিতাম কিন্তু মনে হত যেন ওসব সংবাদ তার জন্য তেমন কোন উদ্বেগের বিষয় না। মুসলিম বাহিনীর প্রতি তার নির্দেশ ছিল কোনও রকম কোমলতা প্রদর্শন এবং কাল বিলম্ব করা ছাড়া মুরতাদদের মস্তক ছিন্ন করা। এমনকি তিনি ইয়ায বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দে ইয়ালিল নামক এক ব্যক্তিকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন, যার ডাক নাম ছিল আল-ফুজাআ। এর কারণ ছিল লোকটি মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদের কথা বলে হযরত আবু বকর রাযি.র কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল এবং পরে সে নিজেই মুরতাদদের সাথে যোগ দিয়েছিল। আরও স্পষ্ট ভাবে বললে, সে দস্যুতে পরিণত হয়েছিল। সমগ্র আরব উপদ্বীপে এই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার কারণে কোন সাহাবীই (যুদ্ধ করতে হবে এ নিয়ে) উদ্বিগ্ন ছিলেন না; বরং তারা (আগ থেকেই) যোদ্ধা ছিলেন। (তাঁরা মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অব্যাহত রাখেন) অবশেষে এক সময় গোটা আরব উপদ্বীপ পুনরায় ইসলামের শাসন ও কর্তৃত্বের ছায়াতলে ফিরে আসে।

আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির মিল রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর (চতুর্দিকে) দীন ত্যাগের ফিতনা ছড়িয়ে পড়ার পরিস্থিতির সাথে কিংবা (মদিনার জীবনে) জিহাদের প্রথম দিকে সাহাবাগণ যে ধরনের পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছিলেন তার সাথে। এ কারণে আমাদের প্রয়োজন প্রচুর হত্যাযজ্ঞ চালানো এবং বনু কুরাইযা ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে নেয়া একশনগুলোর মতো একশন নেয়া। আর আল্লাহ যখন আমাদেরকে ক্ষমতা দিবেন এবং আমরা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিব এবং (চার দিকে) ইনসাফ ছড়িয়ে পড়বে তখন মুমিনরা হবে অত্যন্ত কোমল। তখন তারা লোকদেরকে বলবে, যাও, তোমরা মুক্ত।

এসব কিছু এ কথা বিবেচনা করেই হবে যে, কঠোরতা ও নির্মমতার ক্ষেত্রে শরিয়তের নির্ধারিত সীমা লংঘন করা হবে না এবং তার ওই সব উপকারিতা ও ক্ষতির দিকগুলো অবশ্যই বিবেচনায় রাখা হবে শরিয়ত যেগুলোকে জিহাদের বিধানাবলীর ক্ষেত্রে বিবেচনায় রেখেছে। যা মানুষকে হেদায়েতের পথে আনার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না হলেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি অবশ্যই।

উপকারিতা ও ক্ষতির দিকগুলো বিবেচনা করার ক্ষেত্রে আরেকটি কথা হল, আমরা যখন শত্রুদের মধ্যে এমন কিছু বুদ্ধিমান লোক দেখতে পাবো যারা সত্যকে চিনতে পারে - যে সত্যকে বুদ্ধিমান মাত্রই চিনতে সক্ষম- তখন আমরা তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতা কিছুটা হালকা করতে পারি। কিন্তু উদ্ধত অহংকারী শত্রু এবং তাদের সেনা ও সমর্থকদের ব্যাপারটি আলাদা। (তাদের সাথে কঠোরতা যথারীতি বহালই রাখতে হবে)

[পাওনা পরিশোধের নীতি]

কঠোরতা ও নির্মমতার সাথে জড়িত বিষয়াবলীর মধ্যে রয়েছে ‘পাওনা পরিশোধের নীতি’। মুসলিম উম্মাহকে কোনও ধরণের কষ্ট দেয়া হলে অবশ্যই শত্রুকে তার পাওনা পরিশোধ করা হবে। এভাবে ‘তটস্থঃকরণ ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ’ ধাপে ‘পাওনা পরিশোধের নীতি’ অনুসরণের ফলে শত্রুর অন্তরে নিরাশা ছড়িয়ে পড়বে। তটস্থঃকরণ কারী গ্রুপের বিরুদ্ধে নেয়া শত্রুর যে কোনো একশনের পাওনা এমনভাবে পরিশোধ করতে হবে যেন তারা পুনরায় এ ধরণের কিছু করা থেকে বিরত থাকে এবং সামনে যেন আমাদের বিরুদ্ধে যে কোনো একশনে যাওয়ার পূর্বে হাজার বার ভাবে। এভাবে তাদের নতুন করে যে কোনো অন্যায় করার বিষয়টি থেমে যাবে এবং তাদের প্রচেষ্টাগুলো নিজেদের আত্মরক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে।

দীর্ঘ সময় পরে হলেও (শত্রুকে তার) পাওনা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে, এমনকি কয়েক বছর পরে হলেও। পাওনা পরিশোধের জন্য চালানো অপারেশনের যৌক্তিকতা একটি বার্তার মাধ্যমে শত্রুকে মনেও করিয়ে দেয়া চাই। যা শত্রুর নেতৃবৃন্দের অন্তরে গভীর ছাপ ফেলবে। শত্রুর নেতৃবৃন্দ বুঝবে যে, ইসলাম ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে বা বিরুদ্ধে নেয়া তাদের যে কোনও বৈরি পদক্ষেপের পাওনা -স্বল্প সময়ের মধ্যে হোক বা দীর্ঘ সময় পরে হোক- অবশ্যই তাদেরকে, তাদের সমর্থকদেরদেরকে কিংবা তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের জায়গাগুলোকে কড়ায়-গণ্ডায় পরিশোধ করতে হবে।

এতে করে মুজাহিদদের মুখোমুখি হলে শত্রুদের অন্তরে হতাশা ভর করতে শুরু করবে এবং দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ার কারণে তারা ময়দান ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা চিন্তা করবে। মুজাহিদদের প্রজন্ম এমনই, যে তারা লড়াই অব্যাহত রাখতে সংকল্পবদ্ধ। কঠিন কঠিন পরিস্থিতিও তাদেরকে নিজ অবস্থান থেকে টলাতে পারে না বরং ওগুলো তাদেরকে আরও কড়া উত্তর দিতে উৎসাহিত করে।

নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার ধাপে আমরা আমাদের মিলিটারি ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোতে এবং আমাদের ব্যবস্থাপনাধীন আবাসিক এলাকাগুলোতে ক্রুসেডার ও মুরতাদদের দ্বারা বিমান হামলার সম্মুখীন হতে পারি। যদিও এই সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য আত্মরক্ষামূলক স্থাপনা এবং সুড়ঙ্গ খনন করা হোক না কেন। এ এসব হামলা সত্ত্বেও আমাদের উচিৎ, শত্রুর অপরাধ মোকাবেলার জন্য ‘পাওনা পরিশোধ নীতি’র অনুসরণ করা। এ অবস্থায় ’পাওনা পরিশোধ নীতি’র অনুসরণ শত্রুকে এ থেকে বিরত রাখবে এবং আমাদের ব্যবস্থাপনাধীন নৈরাজ্যপূর্ন অঞ্চলে আক্রমণের পূর্বে হাজার বার চিন্তা করতে বাধ্য করবে। কারণ, শত্রু জানে, একটু দেরিতে হলেও তাকে তার পাওনা পরিশোধ করা হবে। যার ফলে সে মৈত্রী স্থাপনের দিকে ঝুঁকবে যা নৈরাজ্যপূর্ন অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে নিঃশ্বাস ফেলার এবং সামনে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেবে।

এই মৈত্রীর অর্থ কোন ধরনের চুক্তি ও শর্ত ইত্যাদি ছাড়াই সীমিত সময়ের জন্য লড়াই স্থগিত রাখা। আমরা (মুসলিম নামধারী) মুরতাদদের সাথে সন্ধিতে বিশ্বাস করি না, যদিও আসল (জন্মগত) কাফেরদের সাথে সন্ধি হতে পারে।

[একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়]

সবচেয়ে ভালো হয় যদি পাওনা পরিশোধের জন্য চালানো অপারেশনটি অন্য এলাকার মুজাহিদদের দ্বারা অন্য এলাকাতেই সংঘটিত হয়, শত্রুর আঘাতটি যাদের ওপর আসেনি। এর মধ্যে বেশ কিছু ফায়দা আছে, যা আমি সামনে ‘ক্ষমতা অর্জন’ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত বলব ইনশাআল্লাহ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফায়দাগুলোর একটি হল, শত্রুকে এ কথা বুঝিয়ে দেয়া যে, তারা (সব জায়গাতেই মুজাহিদদের দ্বারা) বেষ্টিত এবং তাদের স্বার্থের জায়গাগুলো (মুজাহিদদের আক্রমণের জন্য) উন্মুক্ত। অতএব শত্রু যদি আরব উপদ্বীপ বা

ইরাকের কোন অঞ্চলে আঘাত করে তবে পাওনা পরিশোধের অপারেশনটি হতে পারে মরক্কো, নাইজেরিয়া কিংবা ইন্দোনেশিয়াতে। এতে শত্রু হতভম্ব হয়ে যাবে, বিশেষ করে যদি পাওনা পরিশোধের জন্য চালানো অপারেশনের অঞ্চলটি কাফের কিংবা মুরতাদদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল হয়। এতে করে শত্রু জবাব দেওয়ার জন্য ভালো কোনো সুযোগ পাবে না। এই অপারেশন আমাদের আঘাতপ্রাপ্ত ভাইদের মনোবলকে চাঙ্গা করবে এবং (বিশ্বের) সব জায়গার মুসলিমদের নিকট একটি প্র্যাকটিক্যাল বার্তা পৌঁছে যাবে যে, আমরা সবাই এক উম্মাহ, আমাদের পারষ্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার বিষয়টি রাষ্ট্রীয় সীমানা দ্বারা আবদ্ধ নয়।

পূর্বে বর্ণিত ‘পাওনা পরিশোধের নীতি’ শুধু ক্রুসেডারদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। (বরং অন্যান্য শত্রুদের ক্ষেত্রেও তাই করা হবে) উদাহরণস্বরূপ, যদি মুরতাদ মিসরীয় সরকার মিশরের কোনো মুজাহিদ গ্রুপকে হত্যা কিংবা বন্দী করার জন্য পদক্ষেপ নেয়, তবে আলজেরিয়া বা মরক্কোর মুজাহিদরা মিসরীয় দূতাবাসে হামলা চালিয়ে হামলার যৌক্তিকতা মিডিয়াতে প্রকাশ করতে পারে অথবা মিসরীয় কূটনীতিকদেরকে অপহরণ করে বন্দী করে রাখতে পারে, যতক্ষণ না মিসরীয় মুজাহিদদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই কঠোরতা ও নির্মমতার নীতি অনুসরণ করতে হবে। (কথামতো) আমাদের দাবী পূরণ করা না হলে অপহৃতদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হবে, এর দ্বারা শত্রুপক্ষ ও তার সমর্থকদের অন্তরে তীব্র ভীতি সঞ্চার হবে।

৫ম পরিচ্ছেদঃ

ক্ষমতা অর্জন

ক্ষমতা অর্জিত হয় ঈমানি ভ্রাতৃত্ব ও সম্পর্কের মাধ্যমে। যখন কোন গ্রুপের বা নৈরাজ্যপূর্ন অঞ্চলের প্রতিটি ব্যক্তি- সমাজে তার অবস্থান যতই নিচে হোক –অন্য ব্যক্তিদের থেকে মহব্বত ও ভালোবাসা পায় তখন সেও অন্যদেরকে এমনভাবে মহব্বত ও করতে শুরু করে যে, সে তাদের জন্য জীবন উৎসর্গকারী হয়ে যায় এবং তারাও তার জন্য জীবন উৎসর্গকারী হয়ে যায়। আর এভাবেই শত্রুর মোকাবেলায় ওই গ্রুপটির ক্ষমতা (ধীরে ধীরে) বৃদ্ধি পেতে থাকে।

শত্রু যখন জানবে যে, সে যদি কোন গ্রুপের একাংশ ভেঙ্গে দেয় তাহলে বাকি অংশ আত্মসমর্পণ করবে তখন আমরা বলতে পারি যে, ওই দলটি আসলে ‘ক্ষমতা’ অর্জন করেনি। পক্ষান্তরে শত্রু যখন জানবে যে, যদি কোন গ্রুপের একটি অংশকে হত্যা করা হয় তবে বাকি অংশ অবশ্যই তাদের রক্তের বদলা নেবে এবং গ্রুপের শেষ সদস্যটির মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হতে থাকবে, তখন (বলা যাবে) সেই গ্রুপটি এমন ক্ষমতা অর্জন করেছে যাকে শত্রুরা ভয় পায়, বিশেষ করে যদি গ্রুপটির সাংগঠনিক কাঠামো এমন হয় যে, একটি মাত্র অপারেশন দ্বারাই তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলা যাবে না।

এই ‘বৃহৎ ক্ষমতা’ যা শত্রুকে হাজার বার ভাবতে বাধ্য করে সেটা বিভিন্ন গ্রুপের ‘ক্ষমতার’ সমন্বিত ফলাফল। গ্রুপগুলো তটস্থঃকরণ কারী বা নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনাকারী যাই হোক না কেন। এই গ্রুপগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ঈমানি ভ্রাতৃত্বের কারণে যে বন্ধন তৈরি হয় তা যেন রক্ত দিয়ে লেখা কোন চুক্তিপত্রের বন্ধন। যে চুক্তিপত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদটি হল, ‘রক্তের বদলে রক্ত এবং ধ্বংসের বদলে ধ্বংস’। ‘বৃহৎ ক্ষমতা’ অর্জিত হয়ে গেলে এর মোকাবেলা করার শক্তি শত্রুর আর থাকে না।

পূর্বের পরিচ্ছেদে শত্রুকে তার পাওনা পরিশোধ করে দেয়া সম্পর্কে বলেছিলাম যে, সবচেয়ে ভাল হয় যদি পাওনা পরিশোধের অপারেশন পরিচালানকারী গ্রুপগুলো হয় যারা আঘাত

প্রাপ্ত হয়েছে তারা ছাড়া (ভিন্ন জায়গার) ভিন্ন কোন গ্রুপ। এর মাধ্যমে আমরা শত্রুকে হতভম্ব করে ফেলতে পারবো এবং তার মনোযোগ ঘুরিয়ে দিয়ে তার চিন্তা ও প্রচেষ্টাসমূহকে বিক্ষিপ্ত করে দিতে পারবো, যতক্ষণ পর্যন্ত না আঘাতপ্রাপ্ত গ্রুপ বা অঞ্চলের ভাইয়েরা নিজেদের বাহিনীগুলোকে পুনর্গঠন করে নিতে পারেন এবং নিজেদের যাবতীয় কার্যক্রমকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসতে পারেন। এর মাধ্যেমে মুসলিম উম্মাহ ঈমানি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের মুল্য অনুধাবন করতে পারবে এবং বৃহৎ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় এ বন্ধনের সক্ষমতাকে অনুধাবন করবে, যে ক্ষমতার সামনে শয়তানী শক্তি কখনোই দাঁড়াতে পারবে না (ইনশাআল্লাহ)

লক্ষণীয় যে, এ পর্যায়ে আমরা আমাদের জিহাদকে গোটা উম্মাহর জিহাদ বলে গণ্য করি। একারণে মুসলিম যে কোনও ব্যক্তি, গ্রুপ কিংবা দলই জিহাদে প্রবেশ করবে এবং ‘রক্তের বদলে রক্ত এবং ধ্বংসের বদলে ধ্বংস’ এই নীতিতে আমাদের সাথে আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হবে তারা সকলেই জিহাদি আন্দোলনের অংশ বলে গণ্য হবে। যদিও ইলমি-আমলি অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে সঠিক পদ্ধতির ব্যাপারে তাদের মতের ভিন্নতা থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের এই মতপার্থক্য ইচ্ছাকৃত না হয়। বরং বুঝার ভুলের কারণে হয় আর অবস্থার প্রেক্ষিতেই তা বুঝা যাবে। তেমনিভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রকাশ্যে মতপার্থক্যের কথা স্বীকার না করবে।

[ইতিহাস থেকে কিছু উদাহরণ]

ইতিহাস জুড়ে এর বেশ কিছু উদাহরণ রয়েছে। যেমন, একদিকে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. তাঁর কিতাবাদিতে আশআরীদের নানান বিদআতি কথাবার্তা, আকীদা-বিশ্বাস ও কার্যকলাপের আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং তাদের আকীদা- বিশ্বাসের নানান ভ্রান্তি তুলে ধরেছেন। অপর দিকে যখন ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও দীনের নুসরত ও সাহায্যের প্রসঙ্গ আসে- যখন এই লোকগুলো কোন ধরণের বিদআতে না জড়িয়ে ইসলাম ও মুসলিমদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে তখন তিনি তাদের ব্যাপারে বলেন, তারাই হল মিশর ও সিরিয়ার তাইফাতুল মানসুরাহ-আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য প্রাপ্ত দল। কারণ, তারা (মিশর ও সিরিয়ার শাসকদের নেতৃত্বে) ইসলামের সাহায্যার্থে তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল, আর নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে যে, মিশর ও সিরিয়ার শাসকরা আশআরীদের সমর্থক ছিল।

শাইখুল ইসলামের এ কথা বলার আরেকটি কারণ হল, (তাতারিদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণকারী) সকল সৈন্যই তাদের নেতাদের সমর্থিত আশআরী মতাদর্শের অনুসারী ছিল না।

একইভাবে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ইসলামকে সাহায্য করা এবং বাতিনীদের বিরুদ্ধে সুন্নাহকে সাহায্য করার কারণে তিনি সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহ.র প্রশংসা করেছেন যদিও সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহ.র রাষ্ট্রে আশআরীদের মতাদর্শই চালু ছিল।

এ প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন, তাকদীর অস্বীকার করার বিষয়টি বসরার অধিবাসীদের মাঝে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখন যদি তাদের থেকে আসা হাদীসগুলো বর্ণনা করা ছেড়ে দেয়া হয় তবে আমরা তাদের দ্বারা সংরক্ষিত ইলম, সুন্নাহ এবং হাদীসগুলো আর অধ্যায়নই করতে পারব না।

[একটি মূলনীতি]

যদি আবশ্যকীয় কোনো কাজ যেমন, ইলম অর্জন করা, জিহাদ করা বা এ জাতীয় অন্য কিছু করা এমন ব্যক্তিদের সাহায্য ছাড়া সম্ভব না হয় যারা ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী তবে তাদের সেই ভ্রান্ত মতবাদের ক্ষতি যদি আবশ্যকীয় কাজটি পরিহারের দরুন ঘটা ক্ষতির

চেয়ে কম হয়, এমতাবস্থায় সামান্য কিছু ক্ষতিসহ আবশ্যকীয় কাজটি করা, সেটি না করার চেয়ে উত্তম। এ প্রসঙ্গে আলোচনা বেশ দীর্ঘ।

এ কারণে কোনো দল বা সাধারণ জনগণের মধ্য হতে যারা জিহাদ করতে চায় এবং আমাদের সাথে আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় আমরা অবশ্যই তাদেরকে গ্রহণ করব, তাদেরকে নিজেদের সঙ্গে মিলিয়ে নেব এবং তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করব। তবে আমরা তাদের কোনও ভুলকে (স্থায়ী ভাবে) মেনে নেব না বরং সেগুলোকে পরিস্থিতি, প্রয়োজন ও সুযোগ অনুযায়ী সংশোধন করার চেষ্টা করতে থাকবো, যতক্ষণ না এই সংশোধন ফিতনার কারণ হয় এবং জিহাদের উপর কোনো প্রভাব ফেলে। কারণ, সাধারণত তাদেরকে সাথে রাখার ফায়দা তাদের থেকে আসা ক্ষতির চেয়ে বেশি হয়। যদি তাদের ভুলগুলোর ওপর আপত্তি করার কারণে তার চেয়ে বড় ধরণের কোন ফেতনা বা ক্ষতির আশংকা দেখা দেয় তাহলে একটি সময়ের জন্য আপত্তি করাও বন্ধ রাখা হবে। তবে তাদের ভুলগুলোর অনুমোদন দেয়া যাবে না, স্পষ্টভাবেও না, ইশারা ইঙ্গিতেও না। যা ইতিমধ্যে কিছু কিছু ইসলামী আন্দোলন করেছে।

এ প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন, কোনো আলেম বা শাসকের তরফ থেকে লোকদেরকে নিষিদ্ধ কোনো কাজ করতে নিষেধ না করা- যখন নিষেধ করলে বেশি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে- আর (সুস্পষ্টভাবে) সেই কাজটি করার অনুমতি দেয়া, এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য আছে। অবস্থার ভিন্নতার কারণে এটি ভিন্ন হয়।

আল্লাহর ইচ্ছায় বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে পারস্পরিক আনুগত্য ও সাহায্য-সহযোগিতা আদান-প্রদান হচ্ছে, বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা হাই কমান্ডকে অনুসরণ করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, যখন অপারেশন এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে যায় এবং শত্রুরা উম্মাহর বিভিন্ন শ্রেণিকে বা ইসলামী আন্দোলনগুলোকে একে অপরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় যারা ইতিপূর্বে বিরোধী ছিল না তখন আমরা সাধারণ জনতা বা আন্দোলনগুলোর মধ্য থেকে বিভিন্ন গ্রুপ প্রকাশ পেতে দেখি, যারা জিহাদী আন্দোলনের সাথে পারস্পরিক আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয় না; এর কারণ উম্মাহর মধ্যে থাকা বিভক্তি, ব্যাপকভাবে বিস্তৃত অজ্ঞতা এবং অপারেশন বা যুদ্ধমঞ্চের [কলাকৌশলে] মতপার্থক্য। তারা শত্রুর মুখোমুখি হয় নির্দিষ্ট কিছু দাবী-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে অথবা শত্রু যেন তাদের (ওপর আক্রমণ করা) থেকে দূরে থাকে বা এ জাতীয় অন্য কোন কারণে, বিশেষ করে যেহেতু তারা হাই কমান্ডের আনুগত্যের ঘোষণা থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেয় এই আশায় যে, এতে করে শত্রু তাদের উপর চাপ এবং অপারেশনের মাত্রা বাড়াবে না।

যদি এমন অবস্থা আমদেরও আসে তাহলে আমাদের ভূমিকা হবে- আমরা যদি সত্যিই এই উম্মাহকে এক পতাকার নিচে সমবেত করতে সচেষ্ট হয়ে থাকি- উম্মাহর সকল শ্রেণির মাঝে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির একতা এবং পারস্পরিক আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হবার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। কারণ, এটিই একমাত্র পথ যা শত্রুকে বাধ্য করে আমাদেরকে ভয় করতে। তখন শত্রু আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। আর এভাবেই আমরা আমাদের কাংক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবো (ইনশাআল্লাহ)।

যখন আমাদের সবার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এক হবে তখন সবগুলো গ্রুপই একত্রিত হবে। এতে আমাদের শক্তি ও ক্ষমতা আরও পাকাপোক্ত হবে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় বাস্তবতাকে কল্যাণকর একটি অবস্থার দিকে পরিবর্তন করতে অধিক প্রভাব বিস্তারকারী হবে। বিশেষ করে যেহেতু এটি হবে শত্রুর বিভিন্ন গ্রুপের মোকাবেলায় যাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন।

যেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যা অর্জনের জন্য আমাদের সবাইকে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ তা সর্বস্তরের জনগণের কাছে অত্যন্ত সহজ, জটিলতাহীন ও শব্দবাহুল্য মুক্ত পরিষ্কার ভাষায় পৌঁছে দিতে হবে। ক্রুসেডার, জায়নিস্ট বা

মুরতাদদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রচেষ্টা এবং আত্মত্যাগের কোন মূল্যই থাকবে না, যদি এসবের মাধ্যমে অর্জিত লক্ষ্য হয় ছোট অথবা সাময়িক ও সীমিত। আরও খারাপ হবে যদি আমাদেরকে ব্যক্তি বা দলরূপী কোন নব্য তাগুতের অধীনস্ত হতে হয় কিংবা কোন মানব রচিত সংবিধানের অধীনস্ত হতে হয় যা আল্লাহ প্রদত্ব জীবনব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, যে [আল্লাহ প্রদত্ত] জীবনব্যবস্থার মাধ্যমেই সমস্ত মানবতা সৃষ্টির দাসত্ব হতে মুক্ত হয়ে মহান স্রষ্টার দাসত্বে আসতে পারে। তিনিই একমাত্র সত্বা যিনি আমাদের সমর্পণ ও ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত এবং আমাদের সকল কুরবানি ও আত্মত্যাগ কেবল তাঁর জন্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

একমাত্র এই লক্ষ্যটাই পারে পুরো উম্মাহকে একত্রিত করতে এবং সুদৃঢ় ভিত্তির উপর তাদের মাঝে পারস্পরিক আনুগত্যের এক মজবুত বন্ধন তৈরি করতে। আমাদের (কর্তব্যের মধ্যে) শুধু বাকি থাকবে, প্রচারমাধ্যমের জন্য উপযুক্ত বিষয়াদি প্রস্তুত করে কার্যকরী ওই দাওয়াতগুলো ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা, যেন সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে মহান স্রষ্টার দাসত্বের আহবান কোনও ধরণের দুর্বোধ্যতা ছাড়া পুরো মুসলিম উম্মাহর কাছে পৌঁছে যায়। একজনও যেন বাদ না থাকে আর এটি করতে হবে ভয়ংকর এক যুদ্ধের পটভূমির মধ্যেই, যার প্রাথমিক লক্ষণগুলো এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

[অর্জিত ক্ষমতার প্রকৃত শক্তি-সামর্থ্যকে অনুমান করা জরুরি]

‘ক্ষমতা অর্জন’ সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাকি রয়ে গেছে, তা হল, অর্জিত ক্ষমতার প্রকৃত শক্তি-সামর্থ্যকে অনুমান করা এবং সে অনুযায়ী সঠিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নিজেদের কার্যক্রম ও পরিকল্পনাগুলো সাজানো।

এ ব্যাপারে যে বিষয়টির ওপর আমরা জোর দিতে চাই তা হল, এমন কোন গ্রুপের কার্যক্রমের উপর নির্ভর করে আমরা আমাদের কার্যক্রম নির্ধারণ করব না যারা আমাদের সাথে আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ নয়, যাদেরকে আমরা ছোট খাট বিষয় ছাড়া তেমন কোন নির্দেশ দিতে পারি না। কারণ মূলনীতি হল, নিজেদের প্রকৃত ক্ষমতার উপর নির্ভর করেই পরিকল্পনা তৈরি করতে হয় আর প্রকৃত ক্ষমতা ওটাই যা আমাদের নিজেদের গ্রুপের মধ্যে আছে এবং ওই সব গ্রুপ ও অঞ্চলের মধ্যে আছে যারা আমাদেরকে আনুগত্যের বাইয়াহ দিয়েছে কিংবা যাদের সাথে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা বিনিময়ের চুক্তি হয়েছে।

বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে মিশরের একটি জিহাদী গ্রুপ এ্যাকশনের জন্য চমৎকার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল। কিন্তু পরিকল্পনাটি করা হয়েছিল এ কথার উপর ভিত্তি করে যে, ‘আল জামাআতুল ইসলামিয়াহ’ ও ‘জামাআতুল জিহাদ’ (নামক দুটি দল) নির্দিষ্ট কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করবে যা ওই গ্রুপটির পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পথ করে দিবে। ওই গ্রুপের নেতা ভেবেছিল যে, ওই কার্যক্রমগুলো দল দুটিকে তার পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে বাধ্য করবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর অনুমান যথাযথ ছিল না। এই ভুল অনুমান ও অন্য আরও কিছু কারণে আন্দোলনটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ থেকে শিক্ষনীয় বিষয় ওটাই যা একটু আগে আমি বলেছি যে, যাদেরকে আমরা (তেমন কোনো) দিক নির্দেশনা দিতে পারি না এবং যারা আমাদের সাথে আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ নয় তাদের কার্যক্রমের উপর ভরসা করে আমাদের কার্যক্রমগুলো দাঁড় করানো উচিত হবে না।

আমি এখানে ‘আনুগত্যের বন্ধন’ বলতে সুনির্দিষ্ট বন্ধন বুঝিয়েছি যা একে অপরকে আশ্রয় প্রদান করা এবং সাহায্য সহযোগিতা করার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আমি এখানে সেই ‘ব্যাপক আনুগত্যের বন্ধনে’র কথা বলছি না, যা সারা বিশ্ব জুড়েই এক মুসলিম ভাইয়ের সাথে অপর মুসলিম ভাইয়ের রয়েছে। ক্রমান্বয়ে উম্মাহ যখন তার উন্নতির চরম শিখরে

[illegible]

[illegible]

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجٰهَدُوا بِأَمْوٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَّنَصَرُوٓا أُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ . وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلٰيَتِهِم مِّن شَىْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوا . وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِى الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثٰقٌ . وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ . إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِى الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ .

[illegible]

[illegible]

**[illegible]**

**[illegible]**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

হয়েছে যে- তারা কাফের ও মুরতাদদের বাহনে পরিণত হয়েছে এবং ওরাই তাদের জিহাদের ফল ভোগ করেছে।

রাজনৈতিক পদক্ষেপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়। কেউ একজন বলেছিল, “একটি রাজনৈতিক ভুল শত সামরিক ভুলের থেকেও অধিকতর ক্ষতি বয়ে আনে”। কথাটিতে যদিও অতিরঞ্জন আছে তথাপি বিষয়টির গুরুত্ব বুঝানোর ক্ষেত্রে তা বেশ যথার্থ।

অবশ্য আমাদের কেউ কেউ যখন রাজনীতিতে লোকদের কদর্যপূর্ণ অবস্থান প্রত্যক্ষ করে এবং দেখে যে রাজনীতিকরা নীতি-নৈতিকতা ও মানবিকতা হারিয়েছে এবং প্রতারণা, মিথ্যা, কূট চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতায় পূর্ণ শয়তানের পথ অনুসরণ করছে, তখন তারা ওদের সেই কূট রাজনীতিকে এড়িয়ে চলার পথ অবলম্বন করে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমাদের রাজনীতি পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

তেমনিভাবে এমন একদল লোকও আছে যারা সামরিক কার্যক্রমের পাশাপাশি নিজেদের জ্ঞানানুপাতে ছকবাঁধা কিছু রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হয়। কিন্তু আফসোসের ব্যাপার হল, এ শ্রেণিটিও আজ পর্যন্ত শত্রুর রাজনৈতিক কলা-কৌশল ও এর বাস্তবতা বুঝতে সক্ষম হয়নি।

শত্রু ও তার সহগামীদের রাজনৈতিক কৌশলগুলো ও তাদের রাজনৈতিক বাস্তব পদক্ষেপগুলো গুরুত্বের সাথে বুঝা, অতঃপর সেগুলো মোকাবেলায় শরিয়াহ পলিসির ভিত্তিতে সঠিক রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ কোনভাবেই সামরিক কর্মকান্ডের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিশেষকরে যদি আমরা জিহাদের ফলাফল সংগ্রহের মুহুর্তটি বিবেচনা করি- যে মুহুর্তটিকে মুজাহিদদের দীর্ঘ সময়ের আত্মত্যাগের ফসল হিসেবে বিবেচনা করা হয়-সেই মুহুর্তটি আসে রাজনৈতিক পদক্ষেপ ও দৃঢ় সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। যদিও এর পূর্বে সামরিক নানা পদক্ষেপ আবশ্যকীয়ভাবে থাকে, তারপরও জিহাদের সর্বশেষ মুহূর্ত ও এর ফলাফল নির্ভর করে দক্ষতাপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার উপর। বরং যুদ্ধের পুরো সময়টাতেই দক্ষ রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন পড়ে, যাতে করে সবচেয়ে ভাল ফলাফল অর্জন করা যায়।

[রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো সামরিক নেতৃত্ব থেকে আসবে]

এছাড়াও একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলঃ রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার ধরণ এমন হওয়া উচিত যে, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো সামরিক নেতৃত্ব থেকে আসবে। বরং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রশাসন অথবা রাজনৈতিক প্রশাসনের অধিকাংশ গঠিত হবে সামরিক নেতাদের এসিস্ট্যান্ট যোদ্ধাদের নিয়ে। আর তাদের উচিত হবে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে রাজনীতি বিষয়টি নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষনা করা। অন্যের সাথে যুদ্ধে জড়ানোর পূর্বে নিজেরা যুদ্ধের একটি কাল্পনিক রূপ তৈরি করতে হবে। সুতরাং যাদের কোন কারণে সামরিক লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা নেই, তাদের হাতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছেঁড়ে দেওয়ার মত ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। কারণ সবশেষে যুদ্ধটা হল মুজাহিদদের যুদ্ধ।

[শত্রুর রাজনৈতিক কিছু কলা-কৌশল]

এখন আমি শত্রু ও তাদের সহগামীদের রাজনৈতিক কলা-কৌশল নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো, । সেগুলো আলোচনার উদ্দেশ্য এই নয় যে, এগুলো থেকে আমরা উপকৃত হতে চাই বা এগুলো প্রয়োগ করতে চাই, যেমনটা করেছিল কিছু ভ্রান্ত দল – আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন-। বরং উদ্দেশ্য হল, আমরা যেন শত্রুর লক্ষ্য জানতে পারি এবং ইসলামী সিয়াসাহ বা রাজনীতি অনুযায়ী তাদের মোকাবেলা করতে পারি। অতঃপর আমরা প্রয়োগযোগ্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করবো। যদিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংখ্যা অনেক, কিন্তু

এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তরুণ মুজাহিদদের অধ্যয়ন ও আমলের জন্য প্রাথমিক কিছু আলোচনাই যথেষ্ট মনে করছি।

• যে লক্ষ্য শত্রুদেরকে যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তা হল বস্তুগত লক্ষ্য। সুতরাং কাফির ও মুরতাদদের [পক্ষ থেকে] অন্যদের সাথে সংঘাতে জড়ানোর নীতিটি বৃহদাংশে একটি বস্তুগত দুনিয়াবী স্বার্থ। তারা তাদের বস্তুগত দুনিয়াবী উদ্দেশ্যকে ধর্মীয় বা বানোয়াট কিছু মিথ্যা সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যের আড়ালে
গোপন করে। শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসই যুদ্ধে একমাত্র কারণ নয়; বরং যুদ্ধে ঠেলে দেয়ার জন্য যেসব কারণ রয়েছে এটি এর একটি মাত্র। তবে কাফির, মুরতাদদের অজ্ঞ অনুসারীদের দৃষ্টিতে ধর্ম একটি শক্তিশালী কারণ। কিন্তু বাস্তবতা হলো,
বস্তুগত স্বার্থ এবং বেঁচে থাকার আকাংখাই তাদের যুদ্ধের পিছনে মূল ইন্ধন,
এ উদ্দেশ্যেই তাদের সংঘাত। আবার শুধু কোনরকম বেঁচে থাকাই নয়; বরং তা হতে
হবে আরাম ও বিলাসিতার গ্যারান্টিযুক্ত বেঁচে থাকা। তাদের মিত্র ও
সমর্থকদের ব্যাপারটা হল, তারা জোটে অবিচল থাকে ততক্ষন, যতক্ষন জোটের কারণে তাদের স্বার্থ পূরণ হয়। এ বিষয়টি আমাদের অবশ্যই ভাল করে বুঝতে হবে।

সুতরাং বুঝা গেল, শত্রুদের রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো স্বার্থনীতি। তাদের এই ‘স্বার্থনীতি’ কখনোই কোনো নৈতিক মূল্যবোধের সামনে মাথানত করে না। বরং তাদের স্বার্থনীতির সামনে অন্যান্য সকল নীতি গৌণ। বন্ধুত্ব-শত্রুতা, শান্তি- যুদ্ধ এ সবই নির্ধারিত হয় স্বার্থের ভিত্তিতে।

পশ্চিমা রাজনীতিকরা একটি স্লোগানের মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরেঃ “রাজনীতিতে কোন স্থায়ী বন্ধুত্ব বা শত্রুতা নেই, আছে শুধু স্থায়ী স্বার্থ।”

এ কারণে স্বার্থের ভিন্নতা তাদের নিজেদের মধ্যে ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কারণ হয়। তবে এই ব্যাপারটা যেন আমাদেরকে এই বাস্তবতাও ভুলিয়ে না দেয় যে, সকল কাফির ও মুরতাদ সম্প্রদায়ের ইসলামের প্রতি থাকা বিদ্বেষই তাদের সকলের একসাথে কাজ করার ভিত্তি। তবে আমারা বলতে পারি, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের আদর্শগত জোট হল একটি দূর্বল জোট এবং এই জোট প্রত্যেক গ্রুপের বস্তুগত স্বার্থ দ্বারা সীমাবদ্ধ। একারণে শত্রুদের কোন জোটের সর্বনিম্ন কী পরিমাণ স্বার্থ থাকলে তাদের জোট সক্রিয় থাকবে, তা আমাদেরকে খুব ভালো ভাবে বুঝে, পরিমাপ করে নিজেদের সামরিক ও রাজনৈতিক পরিকল্পনা করতে হবে এবং ওই জোটের শরিকদের মাঝে বিদ্বেষ বাড়ানোর কাজটি করতে হবে। একারণে জোটের শরিকদের কার, কোথায়, কী পরিমাণ স্বার্থ জড়িত তা আমাদের নেতাদের কাছে স্পষ্ট থাকতে হবে। এই স্বার্থের মানচিত্র সামরিক মানচিত্রের মতই গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা বলতে পারি যে, দর কষাকষি হল শত্রুর রাজনীতির একটি চারিত্রিক দিক। কারণ তারা জানে, সফল দর কষাকষির (যদিও তাতে অর্জন সামান্যই হোক না কেন) বিকল্প যা আছে তা হল অব্যাহত যুদ্ধ, যা তাদের সকল স্বার্থ ধূলির সাথে মিশিয়ে দিতে পারে।

একারণে তারা রাজনীতিকে বলে,“সম্ভব সব কিছুর কলাকৌশল (the art of the possible)”। আর তারা অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যায় তখনই যখন তারা ভাবে যে শত্রু দূর্বল এবং শত্রুর ইচ্ছা শক্তি শেষ করে দেয়া সম্ভব। তাই যখন তারা প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখিন হয় এবং যুদ্ধে খরচ অনেক বেশি হয় এবং কোন ফলাফলই প্রায় অর্জিত হয়না তখন গ্রুপগুলো জোট থেকে একের পর এক নিজেদের সরিয়ে নেয়, নিজেদের নিরাপত্তা বিবেচনা করে অথবা পরবর্তীতে সুবিধাজনক অবস্থা না আসা পর্যন্ত সংঘাত থামিয়ে রাখে।

শত্রুর দর কষাকষির ধরণের স্থায়ী কোনো রূপ নেই। কারণ এই দর কষাকষি একটি নির্দিষ্ট সময়ে উভয় পক্ষের ক্ষমতার পরিমানের উপর নির্ভরশীল। আর বিভিন্ন পক্ষের ক্ষমতা

সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। একারণেই রাজনৈতিক চুক্তি ভাঙ্গতে দেখা যায়, বিধিসম্মত দর কষাকষি বিনষ্ট হয়, স্বাভাবিক ভাবেই যা অনৈতিক। এমনকি কিছু সময় অতিক্রান্ত হতেই যখন দেখা যায়, চুক্তি ভেঙ্গে ফেলা চুক্তি রক্ষা করার চেয়ে অধিক ফলদায়ক তখন সর্বসম্মত চুক্তিও ভেঙ্গে ফেলা হয়। একইভাবে, সাংঘর্ষিক স্বার্থ বিশিষ্ট গ্রুপগলোর সাথে একই সময়ে পারস্পরিক সাংঘর্ষিক চুক্তিও রাজনৈতিক অঙ্গনে স্বাভাবিক একটি ব্যাপার।

একটি গ্রুপ তার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং তার ও তার জাতির সকল স্বার্থ বিভিন্ন কারণে বেচে দিতে পারে। যেমন একটি কারণ হতে পারে- দূর্বলতার দরুণ রাজনৈতিক রণক্ষেত্রে অংশগ্রহণে তার অযোগ্যতা। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো- জরাজীর্ণ সেই ইসলামী আন্দোলনগুলো। আরেকটি কারণ হতে পারে, গ্রুপটি শুধুমাত্র নিজ দলের প্রতিনিধিত্ব করে। এর সুনির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষাগুলো জাতীয় নীতি থেকে ও জনতার আকাঙ্খা থেকে আলাদা থাকে। (এর নিকটতম উদাহরণ হল আরব দেশগুলোর সরকারগুলো।)

এগুলো হচ্ছে শত্রুর কিছু রাজনৈতিক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য, ইসলামের সাথে সংঘাতে যেগুলোর সরাসরি প্রভাব রয়েছে।

[কিছু নামধারী ইসলামী আন্দোলনের রাজনীতি]

আর অন্যান্য কিছু ইসলামী আন্দোলন –যারা তাদেরই সহগামী- তাদের রাজনীতি হল: শরীয়াহ রাজনীতি ও কাফিরদের ‘স্বার্থের রাজনীতির’ মিশ্রণে গড়া। তারা কুরআন বিকৃতির মাধ্যমে লোকজনকে প্রতারণা করে বিশ্বাস করাতে চায় যে তাদের এই মিশ্রিত রাজনীতি শরিয়াহ রাজনীতি থেকে গৃহীত। কোন ধরণের সামরিক সক্ষমতা ছাড়া এসকল গ্রুপ পরিকল্পিত রাজনীতিতে ও দর কষাকষির মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদনে কতটা সক্ষম, এ বিষয়ে যে কেউ বিস্ময় প্রকাশ করতে পারে। তবে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝবে যে, রাজনীতিতে তাদের যৎসামান্য দৌড়-ঝাপের মূলে রয়েছে তাদের যুবকদের সংখ্যা। একটি অবস্থায় এরকম সংগঠনের তরুণরা ইসলামের দুশমনদের নিকট বিপদের কারণ হতে পারে; যখন এসব সংগঠনের নেতারা তাদের মূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়, -কারণ তাদের কোন প্রকৃত মূল্যবোধ নেই- আর সংগঠনের সঙ্গে যুবকদের সম্পর্ক ভেঙ্গে পড়ে। তখন শত্রু ভয় পায় যে, এই যুবকরা হয়তো মুজাহিদদের সাথে যোগ দিবে।

এখানে যে বিষয়টি স্পষ্ট করতে চাই তা হলো, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে নীতিটির কারণে এসব ইসলামী দলগুলো নিজেদের দ্বীন ও সকল শরয়ী স্বার্থ বেচে দেয় তা হলো, দল টিকে থাকুক (এখন তা সে যেভাবেই হোক)।

[তাদের বিপরীতে আমাদের করণীয়]

স্বাভাবিকভাবেই এ পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে তা ছিল কিছুটা আকার ইঙ্গিতে। অথচ শত্রু ও তার সহগামীদের নেতৃত্ব ও নীতি সম্পর্কে যথাসম্ভব বিস্তারিত ব্যাখ্যা থাকা দরকার, যেন একজন মুজাহিদ (শত্রু ও তার সহগামী) উভয় শ্রেণির রাজনীতি গভীরভাবে বুঝতে পারে এবং যেন সে এ ধারণা থেকে সরে আসতে পারে যে, শত্রু শুধু ইসলাম বিদ্বেষের কারণেই সংঘাতে লিপ্ত হয়। সে দেখবে যে, শত্রুর অনেক গ্রুপের কাছেই ধর্মীয় দিকটি দ্বিতীয় পর্যায়ের বা একেবারেই গৌণ। একইভাবে সামরিক কাজের পাশাপাশি রাজনৈতিক কমিটিগুলোতে কাজের যোগ্য হওয়ার জন্য একজন মুজাহিদ ছাত্রকে অবশ্যই প্রচুর ইতিহাস পড়তে হবে; পাশাপাশি তার মাঝে থাকতে হবে, কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল, তা যাচাই করার যোগ্যতা। এছাড়াও মনোবিদ্যার উপরও তার পড়াশুনা থাকতে হবে। তার সমাজ বিজ্ঞান পড়া উচিত এবং আরব ও ইসলামী বিশ্বে গোত্র ও গোষ্ঠীগুলোর ভুমিকা এবং প্রশংসনীয় গোত্রীয় ভ্রাতৃত্ববোধ (টান) ও নিন্দনীয় গোত্রীয় ভ্রাতৃত্ববোধের (আছাবিয়্যাতের) মাঝে কী পার্থক্য, এ সব বিষয়ে তার বেশ ভালো ধারনা

থাকা উচিত। পাশাপাশি আধুনিক জাহিলী নিয়ম কানুন গোত্রগুলোর কাঠামোতে যে পরিবর্তন এনেছে এবং কীভাবে এই জাহেলী ব্যবস্থা গোত্রগুলোকে বিভাজন করে সরকারি- বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে মিশিয়ে দিয়েছে অথবা গোত্রগুলোর একাত্মবোধকে জাহিলী ধারার একাত্মবোধে (আছাবিয়্যাতে) বিবর্তিত করেছে, এ বিষয়েও
তার ধারনা থাকা উচিত।

আমরা জোর দিয়ে পুনরায় উল্লেখ করছি, আমাদের উচিত নিয়মতান্ত্রিক শরিয়াহ রাজনীতির মাধ্যমে শত্রু ও তার সহগামীদের রাজনীতিকে মোকাবিলা করা।

[ইবনুল কাইয়্যিম রহ.র উক্তি ও একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি]

কিন্তু এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষনীয়: ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেনঃ “যুদ্ধ এবং ‘ইসলাম ও তার অনুসারীদের’ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ এবং শরিয়াহ রাজনীতির অন্য লোকদের মতামত হতে নেওয়ার চাইতে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন এবং তার পরিচালিত সামরিক অভিযান গুলো থেকে নেওয়াটা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও উত্তম। অন্যদের মতামত থেকে নেওয়াটা এক ধরণের, আর আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকে নেওয়াটা আরেক ধরণের। তৌফীক
একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে।[14]

এখানে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. স্পষ্ট করেছেন যে, শরিয়াহ রাজনীতির বিষয়গুলো সুন্নাহ থেকে নেওয়াটাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। লক্ষণীয় হল তিনি বলেননি যে, সুন্নাহ থেকে নেওয়া আবশ্যক। বিষয়টি যাতে কেউ ভুল না বুঝে সেজন্য আমরা ইবনুল কাইয়্যিমের অন্য একটি লেখার কিছু অংশ তুলে ধরবো যা ব্যাপারটিকে আরও স্পষ্ট করবেঃ

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, ‘ইবনে আকীল বলেন, ‘রাজনীতি’ হচ্ছে এমন যে কোনো কাজ, যা দ্বারা মানুষ কল্যাণের নিকটবর্তী হয় এবং অকল্যাণ ও ক্ষতি থেকে দূরে থাকে, যদিও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাজটি করেননি বা সে বিষয়ে ওহী নাযিল হয়নি। এখন আপনি যদি রাজনীতির এই সংজ্ঞা দ্বারা ওই সকল বিষয়াদিকে রাজনীতির অন্তর্ভূক্ত করেন যা শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক নয় তাহলে কথাটি সঠিক। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে, শরীয়াহ যা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে তার বাইরে কোন রাজনীতি নাই, তবে আপনি ভুল করেছেন এবং এটা হবে সাহাবীদেরকেও ভুল প্রতিপন্ন করা।’ [15]

এ থেকে শরয়ী রাজনীতির (সিয়াসাতের) বিষয়গুলোতে আমীরের এমন প্রতিটি সিদ্ধান্তের জন্য যা শরীয়ার সাথে সাঙ্ঘর্ষিক নয়, শরীয়া থেকে দলিল চাওয়া যে ভুল, তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। কারণ এসব ব্যাপারে তিনি দুনিয়াবী ঘটনাবলিতে অভিজ্ঞ উলামাদের সাথে পরামর্শ করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

[ইসলামী রাজনীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক]

এখন আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করবো, অতঃপর একটি বাস্তব প্রয়োগযোগ্য উদাহরণ টেনে পরিচ্ছেদটি শেষ করব ইনশাআল্লাহ। আমি মনে করি উদাহরণে উল্লিখিত বিষয়টি যুদ্ধ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক বিভিন্ন দিক বুঝার জন্য ও অধ্যয়নের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি। অবশ্য সতর্ক থাকতে হবে যে, প্রয়োগযোগ্য উদাহরণটি শুধুমাত্র একটি উদাহরণ। একারণে উদাহরণটি প্রয়োগের সময় এর যথাযোগ্যতা বিবেচনা করা অথবা উদাহরণটির সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলোর সাথে আরো বিভিন্ন উপাদান সংযোজনের কাজটি ফিল্ড কমান্ডার বা তারও উপরস্থ কমান্ডারদের উপর বর্তাবে।

১। শুধু এটাই যথেষ্ট না যে, মুসলিম পলিটিক্যাল লিডাররা এমন উচ্চ পর্যায়ে থাকবে যেখান থেকে উঁচু পর্যায়ের রাজনৈতিক কর্মকান্ড সম্পাদনে তারা সক্ষম হবে। বরং রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য উচ্চ পর্যায়ের ইসলামী নীতিমালাও থাকতে হবে, এর সঙ্গে থাকতে হবে উচ্চ পর্যায়ের উপলব্ধি। পাশাপাশি রাজনৈতিক সিদ্বান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা থাকাও জরুরি। বিশেষকরে যে সব বিষয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের ঝুঁকি রয়েছে বা যেসব বিষয়ের পরিণতি বেশ কঠিন।

অধিকাংশ সময় নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কঠিন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা রাখে। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে এই বিষয়টি আমরা দেখতে পাই। [যেখানে সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন, যদিও সিদ্ধান্তটি তাঁদের মনের বিপরীত ছিল] । স্বভাবতই বর্তমান সময়ে নেতৃবৃন্দের প্রতি আস্থাশীলতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উচিত, তা এমন সব তথ্যের ভিত্তিতে হওয়া যেগুলোর সত্যতা কার্যত বিভিন্ন ফিল্ডে যাচাই করা হয়েছে। কেননা সরাসরি ফিল্ড থেকে অর্জিত আত্মবিশ্বাস সেসব সুযোগ সন্ধানী চাটুকার নেতাদের আত্মবিশ্বাস থেকে আলাদা, যাদের ফিল্ড অভিজ্ঞতা নেই, বরং তারা ভান-ভনিতায় পারদর্শী এবং মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে অন্যদের নমনীয় করতে দক্ষ।

তেমনিভাবে রাজনৈতিক নীতিমালা অবলম্বন করে আরও উন্নত পর্যায়ে উন্নিত হওয়ার জন্য এমনভাবে কাজ করা যে, রাজনৈতিক সচেতনতার ক্ষেত্রে উন্নত উপলব্ধি তৈরি হয়। এভাবে কাজ করলে নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো বুঝতে ও মেনে নিতে সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

২। সহগামী দল যেমন মুসলিম ব্রাদারহুড এবং তাদের নতুন অনুসারীরা যারা নিজেদেরকে সালাফি সংস্কারপন্থী বলে দাবী করে, তারা পরস্পরে অনেক রাজনৈতিক বিষয়ে ঐক্যমত্য পোষণ করে, আবার কিছু বিষয়ে মতবিরোধ করে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে এসব বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো ভালভাবে বুঝা উচিত। এসব পার্থক্যগুলো বুঝলে সেসব দলের অবস্থান বুঝা যায় এবং বিভিন্ন ঘটনায় তাদের পদক্ষেপগুলো অনুমান করা যায়। তাছাড়া শরিয়াহ রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার কিছু উদাহরণও তাদের রয়েছে।

৩। রাজনীতি অধ্যয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতাগুলোর একটি হলো, কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা নির্ধারণ করা যায়। অর্থাৎ তা কি এই মুহূর্তেই বাস্তবায়ন করবে, নাকি উপযুক্ত সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করবে, নাকি এর জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করবে? শত্রুর মধ্যকার কোন্ শ্রেণীকে আমরা প্রথমে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানাবো, এ বিষয়টিও রাজনীতি অধ্যয়নের দ্বারা লাভ হবে। একারণে, প্রত্যেক গ্রুপের উচিত তার আয়ত্ত্বের মধ্যে থাকা টার্গেটকৃত সকল শত্রুর তালিকা তৈরি করা এবং ঝুঁকির মাত্রা বুঝে ও প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ধারাবাহিক তালিকা তৈরি করা। অপারেশন চালালে শত্রুর কোন্ পক্ষের সম্ভাব্য কি প্রতিক্রিয়া হবে তা বিবেচনা করে তালিকা করা এবং কীভাবে আমরা লক্ষ্যবস্তু হিসাবে চিহ্নিত শত্রুপক্ষকে দোষ স্বীকার করাতে পারি –যা তারা গোপন করে আসছিলো- তা বিবেচনায় রাখা। এর ফলে জনতার নিকট শত্রুকে আক্রমন করার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

৪। এই পরিচ্ছেদে আমি শত্রু ও তার সহগামীদের রাজনৈতিক চাল বুঝা এবং রাজনৈতিক কলা-কৌশলে দক্ষ হওয়ার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। কারণ শরিয়াহ পলিসির মাধ্যমে শত্রুকে মোকাবেলা করার জন্য এগুলো জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একইসাথে বিভিন্ন পর্যায়ের মুজাহিদদের এবং শত্রুপক্ষ থেকে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দেওয়া লোকদের ব্যবস্থাপনা করার জন্য শরীয়াহ রাজনীতি অধ্যয়ন ও বুঝার বিষয়টিও অবহেলা করা উচিত নয়। অনেক সময় দেখা যায়, ওরা হঠাৎ করে মুজাহিদদের সাথে এসে যোগ দেয়। তেমনিভাবে যখন প্রকাশ পাবে যে, আমাদেরই মাঝে রয়েছে খারেজী, রাষ্ট্রদ্রোহী, ধর্মত্যাগী বা

পদ প্রত্যাশী বা শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক কোন আইন প্রণয়নে প্রত্যাশী কিংবা জাতিসংঘের সাথে যুক্ত হতে ইচ্ছুক এমন সব গোষ্ঠী- সেক্ষেত্রে তাদের সাথে আচরণ কীরূপ হবে তা আমাদের শিখতে হবে। একইভাবে যখন প্রকাশ পাবে যে, আমাদের মাঝে রয়েছে মদ পানকারী বা এমন ব্যক্তি যার অপকর্মের দরুণ হদ (শরয়ী শাস্তি) আসে; এই সব ধরণের লোকই আমাদের সারিতে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। (তাই তাদের সবাইকে কীভাবে ম্যানেজ করতে হবে তা আমাদেরকে শিখতে হবে) বিশেষ করে যখন আমাদের সকল কর্মকান্ডের ভিত্তি হল এই একটি কথা যে, বর্তমান জিহাদ পুরো উম্মাহর জিহাদ, বিশেষ কোনো দল বা গোষ্ঠীর নয়। সুতরাং যুদ্ধ চলাকালীন এসব দল প্রকাশ পাওয়ার ফলে খুবই স্পর্শকাতর ও জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়। প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য প্রযোজ্য শরীয়াহ বিধান ও দলিলাদি দ্বারা এসব দলের মোকাবেলা করা যায় না। বরং তা মোকাবেলা করতে হবে অতি সূক্ষ্ণ শরয়ী রাজনৈতিক উপায়ে, যা আমরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ও সাহাবীদের অনুসৃত পথ থেকে পেতে পারি। তবে এটি করতে হবে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে, যাতে করে যারা দ্বীন ইসলামের বিধি-বিধানকে হালকাভাবে নেয় আমরা যেন এসব বিষয়ে তাদের পথে না হাঁটি। বরং এ বিষয়ে সার্বক্ষণিক সতর্কতা আরোপ করতে হবে যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যে গুটি কয়েক মাসআলা আমরা নিরূপণ করেছি এটা বিশেষ পরিস্থিতি ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সাথে সীমিত।

৫। যুদ্ধের ব্যাপারে শত্রুর মানসিক অবস্থা দূর্বল থাকে। তাই তারা অস্ত্র ও মেশিনারী জিনিসের মাধ্যমে এই দূর্বলতা পূরণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু এসব যন্ত্রপাতির উপর স্থায়ীভাবে নির্ভর করা শত্রুর পক্ষে সম্ভব হয় না। এ কারণেই তারা প্রতারণাপূর্ণ প্রচার মাধ্যমের আশ্রয় নেয় এবং মুজাহিদদের পক্ষ থেকে যে কোন একশনের মোকাবেলায় মিডিয়ায় প্রতারণার আশ্রয় নেয়।

একারণে শত্রুর মিডিয়া পলিটিক্স বুঝা এবং তার মোকাবিলা করা সামরিক এবং রাজনৈতিক যুদ্ধে জয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই কাংখিত শ্রোতাদের নিকট আমাদের প্রচারণাগুলো পৌঁছে দেওয়া, মিডিয়া পলিসি বাস্তবায়নে সাহায্যকারী সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের একটি। কিছু কিছু প্রচার মাধ্যমের ব্যাপারে লক্ষ্য করা যায় যে, পূর্বের ধাপগুলোতে তারা কাংখিত লোকদের কাছে তাদের প্রচারণা চালাতে ব্যর্থ হয়েছিল। বিশেষকরে যে প্রচারণাগুলো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী এবং জাতিকে উদ্দেশ্য করে চালানো হয়েছিল। ব্যাপারটা এমন হয়েছিল যে, প্রচারণাগুলো বেশিরভাগ সমাজের অভিজাত শ্রেনীর নিকট পৌঁছানো হয়েছিল। অপরদিকে কিছু অনৈসলামিক সংগঠন তাদের বক্তব্য ও প্রচারণাগুলো প্রতিটি জনপদে এবং প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিল। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি অবহেলা করা উচিত নয়। বিশেষতঃ আমরা যখন শরয়ীভাবে আমাদের সামরিক ও রাজনৈতিক অবস্থানগুলো কী, তা স্পষ্টভাবে লোকদের জানাতে চাই এবং এর পক্ষে শরয়ী সমর্থন ও বুদ্ধিবৃত্তিক যৌক্তিকতা তাদের সামনে তুলে ধরতে চাই এবং দেখাতে চাই যে, এর মধ্যে রয়েছে উম্মাহর কল্যাণ। সুতরাং আমাদের উচিত, আমাদের বক্তব্যগুলো জনতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি গ্রুপ তৈরি করা এবং এ ব্যাপারটিকে খুব গুরুত্ব দেয়া। এমনকি যদিও এই কাজ করতে গিয়ে তারা একটি সামরিক অপারেশান চালানোর সমপর্যায়ের বিপদের মুখোমুখি হয়। এ ক্ষেত্রে একটি গ্রুপ প্রচারণাগুলো ছড়িয়ে দেয়ার কাজ করতে পারে এবং আরেকটি সশস্ত্র গ্রুপ তাদেরকে দূর থেকে ব্যাকআপ দিতে পারে। এমনকি এই উদ্দেশ্যে সামরিক অপারেশনও চালাতে হতে পারে। উদাহরণত, আমরা একজনকে অপহরণ করে বন্দী করতে পারি এবং পরে তাকে নিয়ে দেশজুড়ে হৈচৈ শুরু হলে আমরা টিভি রিপোর্টার এবং মিডিয়া নেটওয়ার্কগুলোকে বলতে পারি যে, আমরা বন্দীকে ছাড়তে পারি যদি আমদের বক্তব্য পুরোপুরিভাবে জনগণের নিকট প্রচার করা হয়। এটি একটি সম্ভাব্য উদাহরণ মাত্র। সুতরাং আমরা যা ঘোষণা করতে চাই তা হতে পারে কোনো সতর্ক বার্তা কিংবা কোনো গুরুত্বপূর্ণ জটিল অপারেশনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে বিবৃতি বা এরকম অন্য কিছু।

৬। এখানে আমি সামরিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপের একটি প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ তুলে ধরব, যেখানে শত্রুর নীতিসমূহ বুঝে সে অনুযায়ী একশন নেওয়া হয়েছে, যে সব নীতি

অনুসারে শত্রুর সামরিক এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। মনে রাখতে হবে এটি একটি উদাহরণ মাত্র।

“তটস্থঃকরণ ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ” পর্বে আমরা যেসব টার্গেটগুলোতে সামরিক অভিযান চালাবো তারই ধারাবাহিকতায় এ একশনগুলো চালানো হবে। বিশেষকরে যখন আমাদের টার্গেট হবে শত্রুকে এবং তার সাহায্যকারী মুরতাদ ফোর্সগুলোকে তাদের শক্তি সামর্থসহ গুটিয়ে নির্দিষ্ট কিছু টার্গেটের আশপাশে সমবেত করা এবং তাদেরকে তাদের এলাকা থেকে প্রত্যাহারে বাধ্য করা, বিশেষকরে সাধারণ লোকালয় থেকে প্রত্যাহারে বাধ্য করা, যেন আমরা নৈরাজ্যপূর্ন পরিস্থিতির ব্যবস্থাপনা কাজ শুরু করতে পারি।

[সামরিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপের একটি প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ]

একইভাবে শত্রুর ‘স্বার্থনীতি’র প্রেক্ষিতে আমরা তাদের অর্থনৈতিক সেক্টরগুলোকে টার্গেট বানাবো। সুতরাং আমাদের উচিত তাদের পেট্রোলিয়াম সেক্টরগুলোকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানানো। কেননা পেট্রোল হল পশ্চিমাদের জীবনের ধমনীস্বরূপ। তেল আবিষ্কারের পর থেকেই আমেরিকা একে যুদ্ধের মৌলিক সরঞ্জাম এবং জীবনীশক্তি হিসেবে দেখে আসছে এবং তারা এটিকে শান্তি ও আন্তর্জাতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য আবশ্যক মনে করে। শত্রুর অর্থনীতিকে টার্গেট বানানো একটি সামরিক কৌশল, যার সফলতা ঐতিহাসিকভাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত। বিশেষকরে আক্রমণকারীর নিকট যদি অর্থনৈতিক স্বার্থ ও বস্তুগত স্বার্থের চেয়ে ধর্মীয় স্বার্থ বা অন্য যেকোন স্বার্থ অগ্রগণ্য হয় অথবা কোনো কারণে যদি তারা এ পরিমাণ বস্তুগত সুবিধা হারায় যে তাদের আর হারানোর কিছু না থাকে- এসব ক্ষেত্রে শত্রুর অর্থনীতিকে টার্গেট বানানো একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। যুদ্ধের এই কৌশল শরীয়াহ অনুমোদিত নীতিগুলো থেকেই পাওয়া।

এখানে আমরা যে প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণটি পেশ করবো, তাতে আমরা দেখাব কীভাবে পর্যাপ্ত জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি না করে অপারেশন চালাতে পারি এবং কীভাবে আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুর মিডিয়ার অপপ্রচারণা এড়াতে পারি। কেননা শুরুতেই আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষ মিডিয়ার মাধ্যমে সব ধরণের মিথ্যা অভিযোগ দিতে শুরু করবে। বলবে যে, আমরা নাকি শ্রম শক্তি নষ্ট করছি এবং জাতীয় অর্থনীতিকে দূর্বল করার জন্য কাজ করছি ইত্যাদি ইত্যাদি। আর স্বাভাবিকভাবেই দেখা যাবে, তাদের সাথে কিছু দরবারি আলেম, দরবেশ টাইপের লোক এবং কিছু কিছু ইসলামী ব্যক্তিত্ব সুর মিলাবে। মিশরের ‘আল জামাআতুল ইসলামিয়াহ’ যখন পর্যটন ও ব্যাংকিং খাতে আক্রমণ চালিয়েছিল তখন আমরা এমনই দেখেছি। অবশ্য ওই দলটি তাদের সামরিক কৌশলের দূর্বলতার দরুণ খাত দুটিতে কার্যকর আক্রমণ পরিচালনা করতে পারেনি। যদিও তারা যে খাত দুটিকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল (ব্যাংক, পর্যটন) সেগুলো ছিল হারাম কর্মকান্ডে ভরপুর, তথাপি তারা তাদের বিরুদ্ধে করা মিডিয়ার অপপ্রচারের মোকাবিলা করতে স্পষ্টভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। তাহলে আমরা যদি পেট্রোলের মত অর্থনৈতিক খাতকে টার্গেট বানাই সেক্ষেত্রে কী পরিমাণ অপপ্রচারের শিকার হতে হবে? যেখানে এটি একটি বৈধ খাত, আবার সকলের মাথায় এ কথা বদ্ধমূল যে, এর মাধ্যমে আরব ও মুসলিম বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জীবিকা নির্বাহ হয়।

উপরোক্ত জটিল প্রশ্নগুলোর উত্তর যখন আমরা দিতে পারবো তখন যে কোন অর্থনৈতিক খাতকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করার পথ মসৃণ করতে পারবো। হোক তা পেট্রোল খাত বা অন্য কোন খাত। সুতরাং সমস্যাটি সমাধেনের যথাযথ উপায় কী?

[মিশরের ‘আল জামাআতুল ইসলামিয়্যাহ’র ব্যর্থতার কারণ]

মিশরের ‘আল জামাআতুল ইসলামিয়্যাহ’ যখন পর্যটন ও ব্যাংকিং খাতে হামলা করেছিল, তারা তাদের এ হামলার পক্ষে দুটি যুক্তি তুলে ধরেছিল। এক. তারা সেসব খাতকেই

টার্গেট করেছে যেগুলো হারাম। দুই. শত্রুর অর্থনীতিকে টার্গেট করার পক্ষে গঠণমূলক রাজনৈতিক যুক্তি পেশ করেছে।

কিন্তু আমরা দেখেছি- এরপরও তারা তাদের বিরুদ্ধে হওয়া মিডিয়ার অপপ্রচার মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। অথচ হামলার যৌক্তিকতা হিসেবে তাদের যুক্তিগুলো একটা পর্যায়ে যথেষ্টও ছিল। কিন্তু সমস্যা হয়েছিল, তারা এই যুক্তিগুলো জনতার কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারেনি। অবশ্য মানুষের মুখে মুখে এ কথা ছিল যে, টার্গেটকৃত খাতগুলো হারাম ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় যুক্তিটি যা ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, সেটা কেবল সমাজের কিছু সংখ্যক অভিজাত লোকদের কাছে পৌঁছেছিল। যার ফলে সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারেনি, এ দলটির উদ্দেশ্য আসলে কী? তারা এও বুঝতে পারেনি যে, এই দলটি কি কিছু গৌণ বিষয়কে মৌলিক বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছিল, নাকি তাদের উদ্দেশ্য আরও পরোক্ষ কিছু ছিল?

[পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দু‘টি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে]

এ কারণে যে কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত-শরয়ী প্রমাণাদি ও বুদ্ধিবৃত্তিক যৌক্তিকতার মাধ্যমে নিজেদের কার্যাবলীর বৈধতা প্রতিষ্ঠা করা এবং এ কথাও বুঝানো যে, আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ রয়েছে। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হল, আমাদের কাজের যৌক্তিকতা পরিস্কারভাবে লোকদের কাছে এবং সমাজের সকল স্তরে পৌঁছে দেওয়া, যাতে করে মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের কাজকে বিকৃতভাবে প্রচার করার যেকোন প্রচেষ্টা নস্যাৎ হয়ে যায়। সুতরাং বুঝা গেল, মিডিয়ার দিকটা এ কাজের জন্য পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাজ করে, যার মাধ্যমে আমরা (আল্লাহর ইচ্ছায়) নিজেদের আত্মরক্ষা করে থাকি।

প্রথম পদক্ষেপঃ একটি মিডিয়া বিভাগ গবেষণা চালিয়ে একটি সমীক্ষা তৈরি করবে। যে বিভাগের কর্মীরা হবে অর্থনৈতিক পলিটিক্সে বিশেষজ্ঞ। সমীক্ষায় তারা পেট্রোলের প্রকৃত মূল্য ও গুরুত্ব তুলে ধরবে এবং দেখাবে যে, কীভাবে বহু গবেষণার পরও এখনো এর বিকল্প খুঁজে পাওয়া যায়নি। অথচ এই পেট্রোলই হলো একমাত্র পণ্য, যার মূল্য এ জাতীয় অন্যান্য পণ্যের তুলনায় অনেক কম। এমনকি লোকমুখে প্রচলিত আছে, মঞ্চে একজন কৌতুক অভিনেতার কৌতুকের মূল্য হাজার ব্যারেল পেট্রোলের চেয়েও বেশি। সুস্থ অর্থনৈতিক মানদণ্ডের আলোকে প্রতি ব্যারেল পেট্রোলের প্রকৃত মূল্য বা কাছাকাছি মূল্য কী হবে- তাও ওই গবেষণায় থাকবে। পাশাপাশি পেট্রোলের রাজনৈতিক গুরুত্বের কথা এবং যুগ যুগ ধরে এর স্বল্প মূল্যের দরুণ মুসলিম উম্মাহ কী পরিমাণ ক্ষতি ও লুটতরাজের শিকার হচ্ছে তাও ওই গবেষণায় থাকবে। এরপর গবেষণাপত্রটি মিডিয়া বিভাগের এমন একজন সদস্যের হাতে ন্যস্ত করতে হবে যিনি যৌক্তিক আলোচনাগুলো সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করবেন। তিনি এ ধরণের যুক্তিকে সেখানে স্থান দিবেন না যে, আমরা পেট্রোল খাতে আক্রমণ করছি কারণ, পেট্রোল কাফেরদের কাছে বেচা হয়। কেননা এটি একটি অমিমাংসিত বা বিরোধপূর্ণ বিষয়, যা আমাদের বিরুদ্ধে মিডিয়াতে সমালোচনার দরজা উন্মুক্ত করবে, ফলে আমাদের কাজকে লক্ষ্যচ্যূত করে দিবে।

উক্ত বিবৃতিতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলো থাকা উচিত

১। অর্থনীতিতে অবিজ্ঞ সেই মুজাহিদ কর্মী যিনি গবেষণা প্রবন্ধটি তৈরি করবেন তিনি অল্প কয়েক লাইনে তার একটি সার-সংক্ষেপও প্রস্তুত করে দিবেন, যেখানে পেট্রোলের স্বল্প মূল্যের দরুণ উম্মাহ যে জুলুমের শিকার হয়েছে তার বিবরণও থাকবে। এতে বিশ্লেষিত হবে যুগ যুগ ধরে অর্জিত এই সম্পদ –স্বল্পমূল্যের পাশাপাশি- কীভাবে উম্মাহর গঠনে কাজে না লাগিয়ে এর বৃহত্তর অংশ আরবদের মধ্যে থাকা পশ্চিমাদের গুটিকয়েক দোসর ও এজেন্টদের স্বার্থে কাজে লাগানো হয়েছে। ফলে মুসলিম উম্মাহর জন্য অতি ক্ষুদ্র অংশই অবশিষ্ট রয়েছে, যা ঝর্ণার পানিতে ছাই সমতুল্য। বর্তমানে ব্যারেল প্রতি তেলের মূল্য কত হওয়া উচিত তারও একটা ব্যাখ্যা

ওখানে দেয়া হবে। এসবকিছুই হচ্ছে সূক্ষ্ণ অর্থনৈতিক গবেষণার ফসল। এগুলো মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কাছে এবং বড় বড় মিডিয়াগুলোর কাছে বিতরণ করতে হবে।

২। মুসলমানদের কাছ থেকে যেসব রাষ্ট্র পেট্রোল নেয় তাদের নিকট ঘোষণা করতে হবে যে, আমাদের গবেষণা ও বিবৃতিতে এর যেই প্রকৃত মূল্য ধার্য্য করা হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই সেই মূল্য পরিশোধ করতে হবে। একইভাবে পূর্বে স্বল্পমূল্যে যে পরিমাণ পেট্রোল তারা নিয়েছিল তার সত্যিকার মূল্য পাওয়ার অধিকারও মুসলমানদের রয়েছে। যারাই পেট্রোলের উক্ত দাম নিয়ে মতবিরোধ করবে তাদেরকে আমরা বলে দিবো, মুসলিমরা তাদের সম্পদ এই মূল্যেই বেচবে। যারা এই দাম দিতে চাইবে না তারা কিনবে না এবং মুসলিমদের পেট্রোলের বিনিময়ে যে অর্থ পরিশোধ করা হবে তা আজকের পর আর রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে না, যে কোষাগারের বিভিন্ন ফাঁক গলে তা মূলত গিয়ে সুইস ব্যাংকে জমা হয়। বরং জাতীয় কমিটি এ অর্থ গ্রহণ করবে এবং এরাই সমাজের বিভিন্ন স্তরে অভাবীদের মাঝে তা খরচ করবে। আর তা হবে পেট্রোলিয়াম সেক্টরে যারা কর্মরত তাদের যথাযথ বেতন পরিশোধ করার পর। জাতীয় কমিটি গঠিত হবে এমন ব্যক্তিদের দিয়ে যাদের বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী সবার কাছে স্বীকৃত। তারা দেশের ব্যবসায়ী এবং (দেশের ও অন্যান্য। মুসলিম বিশ্বের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ হতে পারে। বিবৃতিতে এ কথাও উল্লেখ থাকবে যে, এটি উম্মাহর সামনের সারির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে, যারা কোনভাবেই নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রমাগত পিষ্ট হতে চায় না।

৩। একটি যুক্তিসঙ্গত সময় দেওয়া; যাতে করে এ বিবৃতির ফলে তাদের কী পরিমাণ প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তা স্পষ্ট হয় এবং সিরিয়াস পদক্ষেপ নেওয়া যায়। অন্যথায় পেট্রোলিয়াম প্লান্টগুলোতে হামলা পরিচালনা করা হবে, বিশেষকরে পাইপলাইনে আঘাত হানা, কেননা এতে কারো প্রাণহানী হবে না অথবা কাফিরদের নিয়ন্ত্রণাধীন ট্যাংকারগুলোতে আঘাত হানা। এভাবে যে সময়ে শ্রমিকরা থাকে না তখন প্লান্ট ও ফ্যাক্টরিগুলোতে আঘাত হানা, যাতে করে মুসলিমদের ক্ষতি এড়ানো যায় এবং মুসলমানদের জান ও মালের প্রতি আমাদের সম্মানের মনোভাবও জনতার নিকট জোরদার হয়। ওখানকার প্রহরীরা যদি মুরতাদ সরকারের সরকারি বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয় তবে আমরা তাদেরকে উম্মাহর বিশ্বাসঘাতক হিসেবে গণ্য করব, তাদের কোন সম্মান আমাদের কাছে নেই। আর যদি প্রহরীরা বেসরকারি সিকিউরিটি প্রদানকারী কোন কোম্পানির সদস্য হয় তাহলে আমরা তখনই তাদেরকে প্রতিহত করব যখন তারা কোন মুজাহিদকে হত্যা কিংবা বন্দী করে মুরতাদ সরকারের হাতে তুলে দিতে চাইবে।

৪। সমাজের সর্ব স্তরের মানুষের সামনে একথা খুব ভালোভাবে স্পষ্ট করতে হবে যে, এটি একটি সংকটময় অবস্থায় করতে হয়েছে, যা করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায়ও ছিল না এবং এটাও স্পষ্ট করতে হবে যে, সাময়িকভাবে পেট্রোল খাতগুলো বন্ধ থাকলে এ কারণে আমাদের সমাজে ক্ষতিকর কোনও প্রভাবই পড়বে না ইনশাআল্লাহ। কারণঃ

ক। পেট্রোল থেকে আসা অর্থের অধিকাংশ যায় কাফিরদের দোসর মুরতাদ সরকার ও
তার সহযোগীদের ব্যাংক একাউন্টে। সেখান থেকে জাতির জন্য কেবল ততটুকুই খরচ
হয় যাকে ঝর্ণার পানিতে পড়া ছাইয়ের সাথে তুলনা করা যায়।

খ। পেট্রোল বেচা বন্ধ হয়ে গেলে তা রিজার্ভে থেকে যাবে, যা আমরা ন্যায্য
মূল্যে বর্তমানের চেয়ে বহুগুণ মূল্যে বেচতে পারবো, যা দিয়ে ফ্যাক্টোরিগুলোর বহুগুণে পুষিয়ে ফেলা যাবে ইনশাআল্লাহ্‌। আর এটা আল্লাহর ইচ্ছায় অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে যাবে। আর আমরা আশা করি এর ফলে পরবর্তীতে পুরো উম্মাহর অবস্থা পাল্টে যাবে। তাছাড়া উম্মাহ তার স্বাধীনতা, অধিকার ও সম্পদ ফিরে পাবে, যা পশ্চিমারা এবং উম্মাহর মধ্যে থাকা পশ্চিমাদের দোসর মুরতাদ সরকারগুলো ছিনিয়ে নিয়েছিল। আমাদের এই কাজ শুধুই উম্মাহর কল্যাণের জন্য এবং আমাদের লক্ষ্যসমূহ ও কার্যাবলীকে

ভন্ডুল করার সরকারি সকল প্রোপাগান্ডাকে অবশ্যই মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে হবে। যদি আমরা একটু ধৈয্যের সাথে কাজটি সম্পাদন করতে পারি তাহলে উম্মাহ তাদের অতীত অবস্থান ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার পারবে ইনশাআল্লাহ্।

দ্বিতীয় পদক্ষেপঃ অর্থনীতি সংক্রান্ত এ গবেষণাপত্রটি মুসলিম বিশ্বের অর্থনীতি, রাজনীতি ও মিডিয়া সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে যত বেশি সম্ভব পৌঁছে দেওয়া যায় সে চেষ্টা আমরা করবো। পাশাপাশি বহির্বিশ্বেও তা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো, যেন উম্মাহর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর চালানো অবিচার সম্পর্কে সবাই অবগত হতে পারে এবং পেট্রোল সমৃদ্ধ অন্যান্য দেশগুলোও যেন তাদের পেট্রোলের দাম বাড়াতে উৎসাহিত হয়। অপরদিকে সংক্ষিপ্ত একটি বিবৃতি যেভাবেই হোক উম্মাহর প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। এমনকি তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যদি একজন ক্রুসেডার ম্যানেজার বা ইঞ্জিনিয়ারকে অপহরণ করতে হয় তাহলে তাই করতে হবে। অপহৃত ক্রুসেডার পেট্রোলিয়াম খাতের চাকুরিজীবী হলে আরও ভালো। (আমরা ঘোষণা দেব,) তাকে মুক্তি দেওয়া হবে না যতক্ষণ না আমাদের গবেষণা পত্রটি পত্রপত্রিকা ও টিভি চ্যানেলগুলোতে পুরোপুরিভাবে সম্প্রচার করা হবে। অপহরণ অপারেশনটি চালানো যেতে পারে (উদাহরণস্বরূপ) নাইজেরিয়া, সেনেগাল কিংবা পেট্রোল সমৃদ্ধ অন্য কোনো মুসলিম দেশে। এরপরও যদি আরো পরিকল্পিত অপারেশন চালাতে হয় তাহলে তা আরো বিভিন্ন স্থানে হতে পারে, যেমন উপসাগরীয় অঞ্চলে। যদি পশ্চিমা কোনো ক্রুসেডারকে অপহরণ করা কঠিন হয় তাহলে পেট্রোল খাতে কর্মরত কোনো আরব খ্রিষ্টানকে অপহরণ করা যেতে পারে। একইভাবে কোন পশ্চিমা রিপোর্টার বা পেট্রোল খাতের বাইরেও এমন যে কোনো ব্যক্তিকে অপরহরণ করা যেতে পারে যাকে অপরহরণ করলে আমাদের মিডিয়া বিষয়ক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। আবার অপহরণের পরিবর্তে অন্য এমন কাজও করা যেতে পারে যা বিশ্ববাসীর নজর কাড়বে এবং সবার মধ্যে অপারেশন পরবর্তী বিবৃতি শোনার জন্য আগ্রহ তৈরি করবে।

[এ অপারেশনের মাধ্যমে আমাদের মূল লক্ষ্য]

কেউ কেউ হয়তো অবাক হবে, যদি বলি, এই বিবৃতিতে উল্লিখিত সকল দাবি পূরণ হওয়া আমাদের মূল লক্ষ্য নয়। বরং সম্ভাবনা রয়েছে, উপরোল্লিখিত ‘দুটি পদক্ষেপ’ নেয়ার পরও পশ্চিমারা বা মুরতাদ সরকারগুলো কোনও দাবি পূরণেই সাড়া দিবে না। বরং হুমকি ধমকি দিয়ে বিষয়টিকে শিথিল করে ফেলারও চেষ্টা তারা করবে, যদিও তারা ব্যাপারটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে নিবে, বিশেষকরে যখন অপহরণের মাধ্যমে বিবৃতি সম্প্রচার করা হবে। বরং এ সম্ভাবনাও আছে, বিবৃতিতে আমাদের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা শেষ হওয়ার পর সীমিত মাত্রায় অপারেশন পরিচালনা করা সত্ত্বেও পশ্চিমা দেশগুলোতে পেট্রোল দেওয়া বন্ধ হবেনা। কিন্তু এর ফলে আর কিছু না হোক পেট্রোলের দাম বাড়বে। কমপক্ষে ডিজিটাল নিরাপত্তা ব্যবস্থা, তেলের পাইপ লাইন ও তেলের ফ্যাক্টোরিসহ আরো আনুষাঙ্গিক বিষয়াদির নিরাপত্তার জন্য মোতায়েনকৃত সৈন্য ও প্রহরীদের বেতন বাবদ পেট্রোলের দাম বাড়াতে হবে। বরং আমাদের আশা, অপারেশনের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক অচলাবস্থার কারণে তেলের মূল্য আরও বাড়বে। বরং আমরা আশা করি, অপারেশন চালানোর পূর্বে শুধু বিবৃতি ও গবেষণাপত্র প্রকাশের ফলেই তেলের দাম বেড়ে যাবে। এর ফলে এ কথা খুব ভালভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে, আমরা শুধু বিবৃতির মাধ্যমেই পেট্রোলের দাম বাড়াতে সক্ষম হয়েছি এবং এও ছড়বে যে, পরবর্তীতে সিকিউরিটি ব্যবস্থা দূর্বল এমন কিছু পেট্রোল স্থাপনায় গুটিকয়েক অপারেশনের মাধ্যমে দ্বিতীয় দফায় দাম বাড়াতে সক্ষম হয়েছি।

[গোলযোগ পরিস্থিতি তৈরি করে ‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা’র দিকে আগানোই আমাদের মূল লক্ষ্য]

কিছু লোক খুবই অবাক হবে, যদি তুমি বল যে, উপরোল্লিখিত কোনো ফলাফলই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। চাই ফলাফলগুলো নেতিবাচক হোক -যেমনটা আমরা পূর্বেই ধারণা

করেছিলাম- বা ইতিবাচক, যদিও এর সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তবে আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল, শত্রুর এলিট ফোর্সগুলোকে অধিক পরিমাণে বিভিন্ন জায়গা হতে প্রত্যাহার করে অর্থনৈতিক লক্ষ্যবস্তুগুলোর নিরাপত্তা প্রদানে নিয়োজিত করা। যখন একটি দেশের সবচেয়ে ভালো ফোর্সগুলোকে হাজার হাজার অর্থনৈতিক স্থাপনা রক্ষার কাজে নিয়োজিত করা হবে, তখন দূরবর্তী এলাকাগুলো ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলো ফোর্স শূন্য হয়ে যাবে। যদি কিছু থাকেও তাহলে সেগুলো হবে খুবই দূর্বল, যাদেরকে সহজেই মোকাবিলা করা যাবে এবং তাদের উপস্থিতিতেই অলিখিত চুক্তির মাধ্যমে সহজেই সমাজের বিভিন্ন স্তরে মুজাহিদ সংগ্রহ করা যাবে এবং সমাজকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা যাবে। আমরা সেখানে মুরতাদ সরকারের সেনাবাহিনী ও পুলিশ অফিসারদের সাথে কোনো ধরণের চুক্তি বা ঐক্যমতে যাবো না। আবার তাদেরকে হত্যাও করবো না, যদি তারা আমাদেরকে প্রশিক্ষণ নিতে, দাওয়াহ ছড়াতে ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলো এবং সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো হতে স্বাধীনভাবে মুজাহিদ সংগ্রহ করতে কোনো ধরণের বাধা না দেয়। যদি তারা আমাদের জন্য বাধা সৃষ্টি করে, তবে তরবারির মাধ্যমেই আমরা এর জবাব দিবো। এভাবেই আমরা ‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা’ পর্বের দিকে ব্যাপকভাবে অগ্রসর হতে পারবো। এ পর্বের শুরুতেই সীমান্ত এলাকায় এবং ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় অবস্থানরত মুরতাদ বাহিনীর অবহেলিত সেনা সদস্যদেরকে যে কোনো একটি পথ বেছে নিতে বাধ্য করা হবে। যেহেতু সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ মুরতাদ সরকার ও খৃস্টানদের নিরাপত্তায় নিয়োজিত এবং অর্থনৈতিক, বিনোদন ও পর্যটন এলাকায় নিয়োজিত, তাই সীমান্তবর্তী ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা তুলনামূলক দূর্বল থাকবে। ফলে আমরা দূর্বল শক্তিগুলোকে বাধ্য করবো- হয় আমাদের বিরুদ্ধে লড়বে অথবা আমাদের সাথে যোগ দিবে অথবা অস্ত্র রেখে পালাবে। এবং তারা সেসব অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে ছেড়ে দিবে যেখানে তাদের দূর্বল আধিপত্যের কারণে নৈরাজ্যপূর্ন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তেমনিভাবে যেখানে বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর বিস্তার ঘটেছে এবং জনজীবন অনিরাপদ হয়ে গেছে। সেসব অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার পর আমরা সমস্যা নিরসনে কাজ করবো এবং এই নৈরাজ্য ম্যানেজ করবো।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর উত্থানের ফলে সৃষ্ট নৈরাজ্য ও অনিরাপদ পরিস্থিতি- শরিয়াহ এবং বাস্তবিক বিবেচনায় পরিস্থিতির উপর মুরতাদ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের চাইতে অধিকতর শ্রেয়। কেননা (এসব পরিস্থিতিতে) মুরতাদরা জনসাধারণকে থানা-জেলে বন্দী করে অপমানিত করে, কুফরী মেনে নিতে বাধ্য করে, নিজেদের বানানো আইনে বিচার করে এবং তাগুতের সামনে নত হতে বাধ্য করে। আর এগুলোই মানুষের সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তা বিনষ্ট করে। কেননা শিরক-কুফর-ই হল নিরাপত্তাহীনতার সবচেয়ে বড় প্রকাশ। কারণ, জাহান্নামের আগুন হতে অনিরাপদ থাকাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি, সবচেয়ে বড় ফেতনা।

একারণে আমাদের ইমামগণ বলেছেন, “যদি কোন শহরবাসী ও গ্রামবাসী একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং এক পর্যায়ে একজনও জীবিত না থাকে, তবে এটাও শরিয়ত বিরোধী তাগুত শাসকের অধীনে থাকার চেয়ে বহুগুণে ভালো।”

আর সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসী গ্রুপের সংখ্যা খুব বেশি হবে না, আর সাধারণ মানুষ আত্মরক্ষার্থে নিজেরাই অস্ত্র হাতে তুলে নিবে। অথচ মুরতাদদের অধীনে পরিস্থিতি এর বিপরীত ছিল। সাধারণ মানুষ তাগুত বাহিনীর সামনে আত্মসমর্পণ করতো। এখন স্থানীয়রা মসজিদের খতীবদের নছিহতের ফলে নিজেদের বিচারাচারে শরয়ী আইন মানতে শুরু করবে। তাগুত সরকারের কর্তৃত্ব দূর্বল হয়ে যাওয়া কিংবা তাদের নিয়ন্ত্রণ না থাকার ফলে তাদের বিচারিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লেই এটা সম্ভব হবে। তখন আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের আকাংখা অনুযায়ী সব কিছু হতে থাকবে, কারণ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে আমরাই হবো সর্ববৃহৎ সংঘবদ্ধ শক্তি এবং নিরাপত্তা ও বিচারিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম সবচেয়ে বড় ক্ষমতার অধিকারী ইনশাআল্লাহ।

[উদ্বেগ-উৎকন্ঠা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে]

অর্থনৈতিক লক্ষবস্তুকে বা পেট্রোলিয়াম খাতকে টার্গেট করে চালানো হামলাগুলোর কারণে আমাদের বিরুদ্ধে চালানো মিডিয়ার অপপ্রচারের কথা চিন্তা করে যারা আমাদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন, তাদেরকে বলতে চাই, বিষয়টিকে সহজভাবে নিন এবং এর চাইতেও ভয়ংকর কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকুন, অন্যথায় জিহাদের পরিস্থিতি কখনোই তৈরি হবে না। যদি এখন থেকেই আমরা বিলাপ করা শুরু করি তাহলে বাড়িতে বসে থাকাই আমাদের জন্য উত্তম হবে। একারণে আমাদের উচিত, এ ধরণের মিডিয়া ক্যাম্পেইনে কান না দেওয়া এবং যতদূর সম্ভব এগুলো প্রতিহত করার চেষ্টা করা। যদি এখন এগুলো করতে না পারি তাহলে কখন পারবো? যে জিহাদের পথে পা রাখবে তার জানা উচিত, আমাদের উপর এমন একদিন আসবে যখন যুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে -আমরা কাছে ক্ষমা চাই এবং দীন, দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুক্তি চাই- সেদিন আমরা দেখব, লাখ লাখ লোক মুরতাদ বা ইহুদী- খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা থেকে পালিয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। যেমনটি ঘটেছিল আফগানিস্তানে ও চেচনিয়ায়, যুদ্ধের ডংকা বেজে ওঠার পর।

আমরা মিডিয়া হামলার শিকারও হবো, বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দরাই তাতে অংশ নিবে আর বলবে, মুজাহিদদের কারণেই ওরা আজ উদ্বাস্তু। মুরতাদ এবং ক্রুসেডার সেনাবাহিনীর অনবরত বোমা বর্ষণের ফলে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হবে। (এর জন্য আমাদেরকে দোষারোপ করা হবে) এসব কিছুর জন্য আমাদের নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখতে হবে।

[এক আফগান কমান্ডারের মনোবল]

একবার এক আফগান কমান্ডার শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.র সাথে বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় সেই কমান্ডারের কাছে একটি পত্র আসলো, যেখানে একটি গ্রামে বোমা হামলায় তার পরিবারের ২০ সদস্যের অধিক মারা গেছে মর্মে সংবাদ ছিল। এই খবর পাওয়ার পরও সেই কমান্ডার শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.র সাথে কথা চালিয়ে গেলেন। শায়খ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনার কাছে কী সংবাদ এসেছে?” কমান্ডার তখন শাইখকে খবরটি জানালেন। শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. বলেন, “সে আমাকে তার আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ এমনভাবে শোনাচ্ছিল মনে হচ্ছিলো যেন তিনি বলছিলেন যে, বাদশাহ হারূনুর রশীদ এক বছর হজ করতেন, আরেক বছর যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। এমনকি সেই কমান্ডার তার পূর্বের আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই শেষ করলেন। মনে হচ্ছিলো যেন কিছুই ঘটেনি। এটাই হল যুদ্ধ। মুসলিম জনতাকে এর উপর অভ্যস্ত হতে হবে। যদি এখনই না হয়, তবে আর কখন হবে? কীভাবে আমরা ময়দানে তীহ থেকে বের হবো?

এ সবের পাশাপাশি আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা ঠেকাতে যথাসম্ভব প্রস্তুতি নিতে হবে। যদি আমরা নিষ্ঠার সাথে ও যত্নের সাথে আমাদের কাজ করতে পারি তাহলে আমাদের কথা জনসাধারণের অন্তরে পৌঁছবে এবং আমাদের বিরুদ্ধে করা তাদের যাবতীয় প্রোপাগান্ডা ও ভেলকি আমাদের ‘লাঠি’ ঠিকই গিলে খাবে লোকজন আমাদের প্রতি সহনশীল থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা উন্নত সহনশীলতার পরিচয় দিবো। কিন্তু আমরা যদি এখন থেকেই নানা অজুহাত দেখাতে থাকি, বিলাপ করি, আর উদ্বিগ্ন হই, তবে লোকজনেরও আমাদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হওয়ার অধিকার আছে।

আমি পুনরায় উল্লেখ করতে চাই যে, পেট্রোলিয়াম সম্পর্কে এখানে আমি যা উল্লেখ করলাম তা একটি উদাহরণ মাত্র, যার উদ্দেশ্য আমাদের বিবেচনাবোধকে [বোধ-বুদ্ধি- কৌশলজ্ঞান] শাণিত করা। তবে এটা বাস্তব যে, সাধারণভাবে শত্রুর অর্থনীতিকে লক্ষ্যবস্তু করার কৌশলটি রাজনৈতিক, সামরিক উভয়দিক থেকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। একটি যথার্থ আন্দোলনে এ কৌশলটি অনুপস্থিত থাকা উচিত নয়। মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের একাধিক গবেষণা এবং বক্তব্যে এ বিষয়টি উঠে এসেছে।

৭ম পরিচ্ছেদঃ

মেরুকরণ

লেলিহান যুদ্ধ, মিডিয়া, ব্যবস্থাপনা কৌশল আয়ত্তকরণ, ঈমানী অবস্থার উৎকর্ষসাধণ, সরাসরি আলোচনা, ক্ষমা, অর্থ দিয়ে ঐক্য আনয়ন ও বন্ধুত্ব স্থাপন...

বর্তমান সময়ে সংস্কার আন্দোলনের কৌশল থেকে –যার সূচনা হয়েছে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে- সর্বাধিক চমকপ্রদ যে লক্ষ্যটি অর্জিত হয়েছে তা হলো, এসব আন্দোলনের ফলে উম্মাহ‘র মাঝে একটি চূড়ান্ত পর্যায়ের মেরুকরণ ঘটবে, এই পরিণতির কথা ভেবে আমরা শংকিত নই। সন্দেহ নেই যে আমাদের উচিত ছিল যুদ্ধে ইতিপূর্বের প্রতিটি ধাপে উম্মাহকে নিজেদের পক্ষে ভিড়ানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখা, যাতে করে যুদ্ধ আশানুরূপভাবে সামনে অগ্রসর হয়। কিছু কিছু দেশে এমনটা করাও হয়েছিল এবং এতে উৎসাহব্যঞ্জক ফলাফলও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু, অনেক দেশে জিহাদী আন্দোলনগুলো উম্মাহর মেরুকরণ তথা তাদেরকে নিজেদের পক্ষে ভিড়ানোর ব্যাপারে এই ভেবে শংকিত ছিল যে, তারা মেরুকরণের বিষয়টি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে কি না। এর পিছনে কারণ ছিল, উম্মাহর ব্যাপক অজ্ঞতা, মিডিয়ার অপপ্রচার, আলেমদের অপব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন ইসলামী দলের দাঈগণ, যারা তাদের (দাওয়ার) পুরোটা সময় জাতীয়তাবাদের দিকে আহবান করে অতিবাহিত করছে। এসব দল অনেকটা আরব খ্রিস্টান ও ধর্মনিরপেক্ষ মুরতাদ রাজনৈতিক দলগুলোর মতো, যারা জাতীয়তাবাদের আহবান করে থাকে। এর দৃষ্টান্ত ভুড়িভুড়ি। এমনকি নামধারী এসব ইসলামী দল আরব খ্রিষ্টান এবং ধর্মনিরপেক্ষ মুরতাদ দলগুলোর সাথে মিটিংয়েরও আয়োজন করেছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল মুজাহিদ গ্রুপগুলোর বিভিন্ন কাজের নিন্দা করা, তাদের দাবী, এই মুজাহিদরা জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলবে। কিন্তু আল্লাহ তা’আলাই আমাদের জন্য যথেষ্ট তিনিই উত্তম অভিভাবক।

[মেরুকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য]

উম্মাহর মেরুকরণ দ্বারা আমি এখানে জাতিকে যুদ্ধে টেনে আনা বুঝাচ্ছি, যাতে করে এর ফলে উম্মাহর মাঝে পূর্ণ মেরুকরণ ও বিভক্তি পার্থক্য প্রকাশ পায়। ফলে একদল লোক হকের পক্ষে আসবে, আরেকদল লোক বাতিলপন্থীদের সাথে গিয়ে মিশবে। তৃতীয় আরেকটি দল থাকবে নিরপেক্ষ, যারা বিজয়ী দলের সাথে যোগদান করার অপেক্ষায় থাকবে। আমরা অবশ্যই এই নিরপেক্ষ দলটির সহানুভূতি লাভ করার চেষ্টা করব, যেন তারা হক পন্থীদের বিজয় কামনা করে। কারণ, বর্তমান যুদ্ধের পরবর্তী ধাপগুলোতে এই নিরপেক্ষ লোকগুলোর স্পষ্ট ভুমিকা রয়েছে।

[লেলিহান যুদ্ধই পারে সর্বাধিক মেরুকরণ ঘটাতে]

জনতাকে যুদ্ধে টেনে আনতে বিভিন্ন ধরণের কাজ করতে হবে, যেগুলো যুদ্ধকে উসকে দিবে এবং যার ফলে তারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। ব্যাপারটা এমন হবে যে, প্রত্যেকে যে কোনো একটি পক্ষ নিয়ে ওটার সমর্থনে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে। আমরা এই যুদ্ধকে খুব তীব্র করে তুলবো, যেন প্রত্যেকের কাছেই মৃত্যু খুব কাছাকাছি মনে হয়। দুই পক্ষই যেন বোঝে যে, যুদ্ধে জড়ালে মৃত্যুর সম্ভাবনাই প্রবল। আর এই ব্যাপারটি প্রতিটি ব্যক্তিকে হকের পক্ষে লড়াই করে শহীদ হিসেবে মৃত্যু বরণ করতে ভীষণভাবে উৎসাহিত করবে। কারণ, বাতিলের পক্ষে মৃত্যুবরণ করে দুনিয়া-আখিরাত বরবাদ করার চেয়ে ওই মৃত্যু অনেক অনেক ভাল। এটাই ছিল (এ পথের) অগ্রদুতদের যুদ্ধনীতি, সমাজকে পরস্পর বিরোধী দুটি গ্রুপে বিভক্ত করে একটা ভয়ংকর যুদ্ধের সূচনা করা, যার শেষ হবে বিজয় অথবা শাহাদাতের মাধ্যমে। যে যুদ্ধে বেছে নিতে হবে- হয় বীরত্বপূর্ণ

যুদ্ধ অথবা লাঞ্ছনাকর সন্ধি। যেখানে দুটি দলের একটি জান্নাতী , অপরটি জাহান্নামী। ‘মোদের মৃতরা জান্নাতে , আর তোদের মৃতরা জাহান্নামে ’। ( قتلانا في الجنة وقتلاكم في السعير)

এই ভয়াবহ যুদ্ধ এবং বিভক্তি ঘটানোর মাধ্যমেই কেবল আমরা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোককে মুজাহিদ বাহিনীতে টেনে আনতে সক্ষম হবো। এরপর অপর সারিতে থেকে কে ধ্বংসের পথ বেছে নিল তা নিয়ে আফসোস করার সুযোগও আমাদের নেই। হকপন্থীদের সারিতে যাদেরকে আল্লাহ শহীদ হিসেবে কবুল করবেন তাদেরকে নিয়ে আমরা উল্লসিত হবো। এই ভয়ংকর যুদ্ধ এবং বিভক্তিই (এক সময়) কাঙ্খিত ফল বয়ে আনবে ইনশাআল্লাহ। আমরা যদি জাতীয়তাবাদীদের মিথ্যা প্রবঞ্চনায় কান দেই তাহলে পরবর্তীতে ব্যর্থতার পর যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে তার চেয়ে প্রথম থেকেই ঘরে বসে থাকা ভালো।

নিঃসন্দেহে যুদ্ধ যতই তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে ততই সাধারণ মানুষ ও সমাজের উপর এর প্রচন্ড প্রভাব পড়তে থাকে , এটি শত্রুপক্ষে যেমন পড়ে তেমনি আমাদের পক্ষেও পড়ে। যুদ্ধ প্রত্যেকের মন -মস্তিষ্ককে প্রচন্ডভাবে নাড়া দেয় এবং এই তাণ্ডবলীলাই জনতার নিকট সবচেয়ে বড় প্রমাণ হিসেবে প্রতিভাত হয়। আর তখনই মানুষের মাঝে চূড়ান্ত পর্যায়ের মেরুকরণ সংঘটিত হয়। তবে একদিকে যুদ্ধ যখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে , তখন অপরদিকে আমরা দেখবো যে, যুদ্ধের প্রতিটি ধাপে আমাদেরকে কোমল ও যুক্তিযুক্ত কিছু কৌশল অবলম্বণ করতে হবে। যেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে। বিশেষকরে যেসব দলকে আমরা নিজেদের সাথে ভিড়াতে চাই যুদ্ধের প্রতিটি ধাপে তাদের মাঝে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং এর বাইরে আরো অন্যান্য দলের প্রতিও নজর রেখে আমাদেরকে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বণ করতে হবে।

**[তরুণ প্রজন্মকে দলে ভিড়াতে হবে ]**

“তটস্থঃকরণ ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ ” পর্বে উম্মাহর বিশেষ বিশেষ তরুণ -যুবকদের দলে ভিড়াতে হবে। এর জন্য সবচেয়ে ভাল উপায় হলো , অপেরেশনগুলোকে শরীয়া দলিল ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির আলোকে তাদের সামনে পেশ করা। একটি কাজ সবচেয়ে বেশি পরিমাণ যৌক্তিক তখনই হয় যখন কাজটির মধ্যেই কাজটির যৌক্তিকতা স্পষ্ট থাকে। কিন্তু মিডিয়ার অপপ্রচারের কারণে এ ধরণের যৌক্তিক অপারেশনগুলো পরিচালনা করা খুবই কষ্টকর হয়। তবে আমরা যদি মিডিয়াকে অকার্যকর করার পর্যায়ে পৌঁছাতে পারি তখন এরকম অপেরেশন চালানো সম্ভব।

এটা সম্ভব হয় তখনই যখন গ্রুপগুলো উন্নতি সাধন করে ও শক্তিশালী হয় এবং অপারেশনগুলো সমন্বিত হয়। তখন মিডিয়াগুলো তাদের নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে পারে না। তাদের অপারেশন ও টার্গেটের ব্যাপারে অপপ্রচার চালানোর সক্ষমতা রাখে না। কিন্তু যে ক্ষেত্রে বিরোধী মিডিয়াগুলো তাদের নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে উৎসুক থাকে সেক্ষেত্রে তাদের অপারেশনগুলোর যৌক্তিকতা উল্লেখ করে লিখিত বক্তব্য প্রকাশ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। অপারেশনের পূর্বেই যে কোনো আগাম অডিও বা ভিডিও বার্তা লোকজনকে অপারেশনের জন্য প্রস্তুত করে। তবে স্বভাবতই তাতে নির্দিষ্ট করে কিছু উল্লেখ থাকবে না। অতঃপর অপারেশনের পর এর পক্ষে শক্তিশালী শরয়ী দলিলের পাশাপাশি এমনকিছু বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি তুলে ধরতে হবে , যাতে করে যেসব গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে তা প্রস্তুত করা হয়েছে তারা এই যৌক্তিকতায় কান দেয়। এই বিবৃতি যেন সমাজের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে তা নিশ্চিত করতে হবে। শুধু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছলে চলবে না। অধিকাংশ বিবৃতিতে ঐ সমস্ত সাধারণ টার্গেটগুলোর কথা থাকবে যেগুলো সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য , এমনকি যদি তা অস্পষ্ট শব্দেও হয়। যেমন বলবে, “আমরা লড়াই করি উম্মাহর শত্রু ও তাদের এজেন্টদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য , যারা দেশের আদর্শ ও সংস্কৃতি ধ্বংস করছে , সম্পদ লুটপাট করছে এবং আমাদেরকে তাদের দাসে পরিণত করছে। প্রত্যেকেই তা দেখে এবং জানে যে , তারা স্পষ্টতই সব কিছু

ধ্বংস করছে। এমনকি তারা আমাদের হত্যা ও ধ্বংস করার জন্য যা খরচ হয় তা পর্যন্ত আমাদের কাছ থেকে উঠিয়ে নিচ্ছে।”

‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার’ ধাপে মেরুকরণ এক ভিন্ন ধরণের গুরুত্ব বহন করে

যখন বেশ কিছু অঞ্চলে নৈরাজ্য তৈরি হয়- আমরা সেগুলোর ব্যবস্থাপনা করি বা না করি অথবা অঞ্চলগুলো কাছের হোক বা দূরের- তখন গোলযোগপূর্ণ এলাকায় বসবাসরত লোকদের মাঝে একধরণের স্বতঃস্ফূর্ত মেরুকরণ পরিলক্ষিত হয়। নিরাপত্তার স্বার্থে তারা দেশের বড় বড় ব্যক্তিত্ব বা দলীয় সংগঠন বা জিহাদী সংগঠন অথবা মুরতাদ সরকারের পুলিশ বা সেনাবাহিনীর অবশিষ্টাংশ থেকে গঠিত কোনো সামরিক সংগঠনের সাথে গিয়ে যোগ দেয়। এই জনতাকে মেরুকরণের জন্য তখনই আমরা প্রথম পদক্ষেপ নিবো। যেন তারা বিভিন্ন দল গঠনের মাধ্যমে হকপন্থীদের পক্ষাবলম্বন করে, যেসব দল তাদের কর্তৃত্বাধীন এলাকাগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমাদের অনুগত থাকবে। পাশাপাশি তারা মিডিয়াতে সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম তৈরি করবে, যেখানে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলগুলোর নিরাপত্তা, শরয়ী আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ন্যায়বিচার, অসহায়দের দায়িত্ব গ্রহণ, জিহাদের প্রস্তুতি, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, উৎকর্ষতা- ইত্যাদি তুলে ধরা হবে আল্লাহ্র ইচ্ছায় এই প্রথম ধাপের সাথে সাথেই আমরা দেখবো যে, অন্যান্য এলাকা থেকে যুবকরা আমাদের এলাকায় আসছে, এসব এলাকার সহযোগিতার জন্য এবং এখানে বসবাসের জন্য। যদিও এ কারণে তাদের জীবন ও সম্পদহানির সমূহ আশংকা থাকবে অথবা শত্রুদের পক্ষ থেকে এসব এলাকায় চাপ বৃদ্ধি পাবে।

সারকথা

নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার ধাপে মেরুকরণের প্রথম পদক্ষেপ হলো আমাদের নিয়ন্ত্রনাধীন অঞ্চলগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবস্থপনা করা। এই ধাপে মেরুকরণের অন্যান্য পদক্ষেপগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলো নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি-

ঈমানী অবস্থার উৎকর্ষসাধনঃ

আমাদের ব্যবস্থাপনাধীন নৈরাজ্যপূর্ন অঞ্চলগুলোর লোকদের মেরুকরণের জন্য সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত উপায় হচ্ছে ঈমানী অবস্থার উৎকর্ষসাধন করা। যেসব লোক আমাদের প্রশাসন (ব্যবস্থাপনা) মেনে নেয় আমরা যেন তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারি এবং আরো অন্যান্য বিষয় দেখাশুনা করতে পারি- এসব লোক ওই সমস্ত লোকদের মতো নয় যারা সরাসরি আমাদের সারিতে এসে যোগ দেয়, আমাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করে, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং আমাদের সাথে যুদ্ধসহ আরো অন্যান্য কাজে অংশ নেয়। সুতরাং এমন নৈরাজ্যপূর্ন পরিস্থিতিতে সমাজের ঈমানী অবস্থার উৎকর্ষসাধন ওখানকার সাধারণ লোকদেরকে আমাদের প্রতি আকৃষ্ট করবে ও তাদেরকে আমাদের কর্মীতে পরিণত করবে ইনশাআল্লাহ।

সরাসরি আলোচনাঃ

অন্যান্য সংগঠনগুলো পার্শ্ববর্তী যেসব অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করছে সেসব অঞ্চলের নিয়ন্ত্রকদের কাছে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে আমরা দূত পাঠাবো, যেন ওই পক্ষের লোকেরা তাওহীদপন্থী মুজাহিদীনের সাথে মৈত্রী স্থাপন করে। আমরা দেখবো যে, তারা আমাদের সাথে পুরোপুরি মৈত্রী স্থাপনে শংকিত থাকবে। কারণ তারা আশংকা করে, এতে করে শত্রু পক্ষ তাদের সাথেও ওইরূপ আচরণই করবে যা আমাদের সাথে করছে। একারণে এই অবস্থায় আমাদের দাওয়াতের উদ্দেশ্য হবে, কমপক্ষে যেন ন্যূনতম কিছু শরীয়াহ উদ্দেশ্য ও স্বার্থের উপর আমাদের মৈত্রী সংঘটিত হয়। সম্ভবত, পূর্বের মত এতেও তাদের অনেকে

ভীত থাকবে। যদি আমরা বুঝি যে, তারা দুটি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করছে তাহলে আমরা তাদের সাথে সর্বশেষ ধাপের দিকে আগাবো। তবে [শেষ ধাপে এসেও] তাদের অঞ্চলে শরীয়া ব্যতীত ভিন্ন কোনো আইনে শাসন চলার বিষয়টি এক দিনের জন্যও আমরা মেনে নিবো না। যদি তারা এমন কিছু বলে তাহলে এ পরিস্থিতিতে তাদের নিয়ন্ত্রণকে আমরা সম্পূর্ণভাবে শত্রুদের নিয়ন্ত্রণের মতই ধরে নিবো। সুতরাং সর্বশেষ ধাপে এসে যদি তাদের সাথে ন্যূনতম কোনো বিষয়ের উপরও সমঝোতা হয়, আশা করা যায় অচিরেই -আল্লাহর অনুগ্রহে- এ অঞ্চলের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে।

এর সাথে সম্পর্কিত আরেকটি বিষয় হলো, আমরা দেখব যে কিছু কিছু এলাকা গোত্রীয় নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। এরা গোত্রীয় টানে আশপাশের বিভিন্ন শক্তি যেমন, মুরতাদ সরকারের বিভিন্ন বাহিনীর অবশিষ্টাংশ, বিভিন্ন সাংগঠনিক দল ও ক্রুসেডার লুটেরাদের মোকাবেলায় নিজেরা শক্তি সঞ্চয় করবে। এসব গোত্রের সাথে যখন আমরা আলোচনা করবো, তাদেরকে আমরা ‘গোত্রীয় টান’ (আছাবিয়্যাত) পরিত্যাগ করতে বলবো না। বরং আমাদের উচিত হবে এসব গোত্রীয় টান ও গোত্রপ্রীতির মাঝে মেরুকরণ ঘটানো। ফলে এই প্রীতি ও টান যেন গোত্রের পরিবর্তে শরীয়া সমর্থিত বিষয়ের প্রতি ঘুরে যায়। তাদের কাছে ক্ষমতা ও সামর্থ রয়েছে, সুতরাং এই ক্ষমতা ও সামর্থকে চূর্ণ করা আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। তাছাড়া সেটা যে কতটা কঠিন তা তো বলাই বাহুল্য। তাই উত্তম হলো, এই গোত্রপ্রীতির পথ ঘুরিয়ে দেওয়া, যাতে তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় হয়। বিশেষ করে যেহেতু তারা তাদের লালিত আদর্শ ও মূল্যবোধের জন্য জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত। আর এই কাজ শুরু করা যেতে পারে অর্থ বা এ জাতীয় অন্য কিছু দ্বারা গোত্রীয় লিডারদের মনোরঞ্জনের মাধ্যমে। অতঃপর কিছুদিন পর যখন গোত্রের সাধারণ মানুষগুলো আমাদের সাধারণ মানুষের সাথে মিশবে এবং ঈমানী দৃশ্যপটের সাথে তাদের অন্তরগুলো মিলবে, তখন আমরা দেখবো যে, তাদের লিডারদের এমন যে কোনো নির্দেশ যা শরিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক তা তারা মানছে না। হ্যাঁ, গোত্রপ্রীতি থাকবেই। কিন্তু ধীরে ধীরে তা নিন্দনীয় পর্যায় থেকে প্রশংসনীয় পর্যায়ে রূপান্তরিত হবে।

ক্ষমাঃ

যদি গোত্রীয় কোনো লিডার অথবা কাফের বা মুরতাদদের কোনো একটি গ্রুপ আমাদের হাতে আটক হয় আর আমরা দেখি যে, তাদেরকে ক্ষমা করে দিলে বড় কোনো সমস্যা নাই বরং অধিক সম্ভাবনা আছে, এতে করে তাদের মনোরঞ্জন হবে, হয়তো তারা ঈমানদারদের সাথে যোগ দিবে এবং তাদের অনুসরণ করবে অথবা কমপক্ষে আমাদের উপর তাদের অনুসারীদের খারাবি পড়তে দেবে না। (অবশ্য, ইসলামে প্রবেশ করা ব্যতীত একজন মুরতাদের কোনো ক্ষমা নাই। এমনকি যখন সে ইসলামে ফিরে আসবে তখনও আমাদের এখতিয়ার আছে, ইচ্ছা হলে ক্ষমা করে দিতে পারি, আবার হত্যাও করতে পারি। কারণ সে আমাদের বাগে আসার আগে তওবা করেনি, বরং বাগে আসার পর তওবা করেছে।) মোটকথা যদি অধিক সম্ভাবনা থাকে যে, ক্ষমা করে দিলে তাদের মনোরঞ্জন হবে এবং ক্ষমা করার চেয়ে তাদেরকে হত্যা করার মধ্যে বেশি ফায়েদাও নেই, তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া তাদের মেরুকরণের জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে মনোরঞ্জনঃ

ইচ্ছায় যখন আমরা কিছু নৈরাজ্যপূর্ন অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিবো ও ব্যবস্থাপনা শুরু করবো, তখন সাদাকার মাল হতে আমাদের নিকট প্রচুর পরিমাণে আর্থিক রাজস্ব আসতে থাকবে, যেগুলো বর্তমানের চেয়ে আরও উত্তম পন্থায় নিরাপদে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। একইভাবে এই অঞ্চলগুলোতে মুরতাদ সরকারের ছেড়ে যাওয়া আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকেও অর্থ আসবে। স্বাভাবিকভাবেই, এই প্রতিষ্ঠানগুলো ছোট বা মাঝারি ধরণের হবে। আর বড় বড় কোম্পানি, ফ্যাক্টোরি ও বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন তেল-গ্যাস কোম্পানি ইত্যাদি- এগুলো রক্ষার জন্য মুরতাদ সরকার তাদের ফোর্সগুলোকে কেন্দ্রীভূত করবে, যেমনটা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

স্বাভাবিকভাবেই সর্বপ্রথম লোকজনের প্রাপ্য অর্থ, ন্যায্য অধিকার ও শোষণ করে নেওয়া বিভিন্ন সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এরপরও দেখা যাবে, সুন্দর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিভিন্ন ইসলামী কর্মকান্ডের জন্য পর্যাপ্ত রাজস্ব সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে এসে তাওহীদ ও জিহাদপন্থী বিজ্ঞ আলেমগণ কিছু কিছু লিডারদের মনোরঞ্জনের জন্য [16] কিছু অর্থ-কড়ি খরচ করার বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করবেন এবং বিষয়টি সবার মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। ফলে দেখা যাবে তারা আমাদের প্রশাসনকে বাইয়াহ দিবে। এ বিষয়ক শরয়ী নীতিমালা ও বিস্তারিত বিবরণ ঘোষণাকারে সকলের সামনে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে, যাতে লোকজনের অন্তরে কোন সংশয় না থাকে।

শুরুতে আমরা জোর দিয়েছিলাম এ বিষয়ে যে, আমাদের লড়াই হলো কুফরের বিরুদ্ধে ঈমানের লড়াই এবং শিরকের বিরুদ্ধে তাওহীদের লড়াই। এটা কোন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক লড়াই নয়।

তবে আমাদের এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে, শরিয়াহ রাজনীতির একটি অংশ হলো, সমাজের বিভিন্ন দূর্বলমনা লোকদেরকে লক্ষ্য করে কথা বলার সময় আমরা তাদেরকে আমাদের তাদের অর্থ-সম্পদ ও অধিকার (শত্রুর কাছ থেকে) ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিবো। বরং সমাজের নিকৃষ্ট দখলদার-দুর্বৃত্ত লোকেরা যেসব রাষ্ট্রীয় সম্পদ জব্দ করে রেখেছে ওগুলোও তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি দিবো।

আমরা মনে করি না যে, এই ধরণের প্রতিশ্রুতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিল। বরং এটা ছিল শুধুই লোকদের মনের সান্ত্বনা এবং দূর্বলমনা লোকদেরকে একটু চাঙ্গা করা, যাতে করে তারা ইসলামের দিকে ধাবিত হয়। পরবর্তীতে, ঈমানদারদের সাথে মিশে এবং জিহাদের আগুনে পরিক্ষিত হয়ে এসব দূর্বল অন্তরওয়ালাদের ঈমানী অবস্থার উন্নতি হয়েছিল এবং শেষমেশ, অন্য যে কোন কিছুর পূর্বে তাওহীদই তাদের অনুপ্রেরণা ছিল।

এজন্যই আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ তাআলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি যেন যুদ্ধবন্দীদেরকে সম্বোধন করে বলেন, ‘আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কল্যাণকর কিছু রয়েছে বলে জানেন তাহলে তোমাদের কাছ থেকে (মুক্তিপণ হিসেবে) যা নেয়া হয়েছে তার চেয়ে উত্তম জিনিস তিনি তোমাদেরকে দান করবেন’।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيٓ أَيۡدِيكُم مِّنَ ٱلۡأَسۡرَىٰٓ إِن يَعۡلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمۡ خَيۡرٗا يُؤۡتِكُمۡ خَيۡرٗا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

হে নবী, আপনার হাতে যে সব বন্দীরা আছে আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কল্যাণকর কিছু রয়েছে বলে জানেন তাহলে তোমাদের কাছ থেকে (মুক্তিপণ হিসেবে) যা নেয়া হয়েছে তার চেয়ে উত্তম জিনিস তিনি তোমাদেরকে দান করবেন এবং তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা আনফাল: ৭০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে শরিয়াহ রাজনীতির এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যেখানে নির্দিষ্ট নীতির আলোকে কিছু লোকদের মনোরঞ্জনে সম্পদ খরচ করা হয়েছিল। সম্পদের মাধ্যমে মনোরঞ্জনের বিষয়টির সাথে জড়িত আরেকটি বিষয় হলো কিছু বাহ্যিক পদ প্রদানের মাধ্যমে মনোরঞ্জন করা, যে পদ প্রদানের কারণে মুসলমানদের কাজে কোন ব্যাঘাত ঘটবে না। অথচ এই পদটি দেয়ার ফলে গোত্রের কোনো বড় ব্যক্তিত্বের

বা নেতার প্রতি এক ধরণের সম্মান দেখানো হয়। যার ফলে দেখা যাবে তার অনুসারীরা ও আশপাশের লোকেরা জিহাদী সংগঠনের লক্ষ্য -উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে জিহাদী নেতৃত্বেরই অধীনে যোগ দিবে। আমরা বলি যে , পরবর্তীতে এসব লোক তরুণ মুজাহিদদের সাথে উঠাবসার আল্লাহর ইচ্ছায় ঈমানের আলোতে আলোকিত হবে। আর তখনই তারা তাদের পূর্বের নেতাকে - বাহ্যত তারা সাথে থাকলেও - ঝেড়ে ফেলবে, যদি ওই নেতা নিজের মধ্যে হেদায়েতের আলো ওভাবে ধারণ করতে না পারে। এক্ষেত্রে আমরা মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ রা . এর কথা স্মরণ করতে পারি। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিতেন তাহলে তিনি তার পিতাকে হত্যা করার জন্যও প্রস্তুত ছিলেন।

বাকি রইলো, আমাদের (পূর্ব থেকে গড়া ) শক্ত ঘাঁটি ও তরুণ মুজাহিদীনের সমন্বয়ে গঠিত হক্বের কাফেলাকে সম্পদের মাধ্যমে মনোরঞ্জনের বিধানাবলী বিস্তারিত জানা তে হবে।

তন্মধ্যে কিছু বিধান হলো , (১) যে ব্যক্তি শুধু সম্পদের জন্য যুদ্ধ করবে আখেরাতে সে কোনও প্রতিদান পাবে না (২) আর যার মূল উদ্দেশ্য থাকবে আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করা তবে সাথে গনিমত লাভ করার নিয়তও থাকবে কিন্তু সেটি দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে তার প্রতিদান কিছুটা কমে যাবে। (৩) যে ব্যক্তি (যুদ্ধের ময়দান থেকে ) নিরাপদে ফিরে আসে এবং গনিমতও লাভ করে তাকে তার প্রতিদানের দুই তৃতীয়াংশ নগদ দিয়ে দেয়া হয় (৪) আর যে ব্যক্তির রক্ত ঝরে অর্থাৎ যে শহীদ হয়ে যায় এবং সম্পদও ধ্বংস হয়ে যায় সে পূর্ণ প্রতিদান লাভ করে।

মক্কা বিজয়ের পরপরই হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হুনাইনের যুদ্ধে আনসাররা নিজেদের প্রাপ্য গনিমত ছেড়ে দেন। মক্কা বিজয়ের পর যারা ইসলামে নতুন প্রবেশ করেছে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য তারা সেসব গনিমত ছেড়ে দেন।

হক্বের কাফেলাকে এ কথা ভালোভাবে বুঝতে হবে যে , পরবর্তীতে তাদের হাতে সম্পদ আসার সম্ভাবনা আছে , সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের সন্তানাদি ও তাবেয়ীদের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল। তবে এ কথা ঠিক যে , সম্পদের ফেতনা অভাব অনটনের ফেতনার চেয়ে ভয়ংকর। তাছাড়া সম্পদ হাতে পেয়ে আমরা সাহাবায়ে কেরামের মতো দৃঢ় ও স্থির থাকতে পারবো সেই যোগ্যতা তো আমাদের নেই। যেমন হাদিসে এসেছে , আমি তোমাদের ব্যাপারে অভাব অনটনের আশংকা করি না। আমি আশংকা করি, দুনিয়া তোমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়া হবে (আর তোমরা দুনিয়ার পিছনে ছুটবে ) পরিণামে দুনিয়া তোমাদেরকে ধবংস করে ছাড়বে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধবংস করে ছেড়েছে।

৮ম পরিচ্ছেদঃ

- সম্বন্ধীকরণের মূলনীতি **(Rules of Affiliation)**

কোনো একটি অঞ্চল ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে যখন বাধাপ্রাপ্ত হয় বা যখন পাশাপাশি দুই বা ততোধিক অঞ্চলকে সংযুক্তকরণের সম্বন্ধে আবদ্ধের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন অঞ্চলের অন্য অঞ্চলের সাথে যোগ দেওয়া উচিত এবং এর প্রশাসনকে অপর প্রশাসনের অধীনস্ত করা উচিত ? এ বিষয়গুলোর নিষ্পত্তি হবে কিসের ভিত্তিতে , জিহাদ ও আল্লাহর দীনের কাজে কারা পুরাতন - সে ভিত্তিতে ? নাকি বস্তুগত শ্রেষ্ঠত্ব এবং নেতৃত্বের যোগ্যতার ভিত্তিতে ? নাকি অন্য কিছুর ভিত্তিতে ? তেমনিভাবে আমরা লোকদের মাঝে থাকা জুলুমের প্রবণতা , হিংসা ইত্যাদির নিরাময় কিভাবে করবো ? (আমরা কাছে ক্ষমা চাই এবং দ্বীন , দুনিয়া ও আখিরাতের সকল বিপদ থেকে পরিত্রাণ চাই )

[illegible] -[illegible] ‘[illegible]’- [illegible], [illegible] ‘[illegible]’ [illegible] ‘[illegible]’ [illegible] ‘[illegible]’ [illegible] ‘[illegible]’ [illegible] ‘[illegible]’ [illegible]

[illegible] ([illegible]) [illegible]-[illegible] ([illegible]’[illegible]-[illegible]) [illegible], [illegible]-[illegible]-[illegible]; [illegible]-[illegible], [illegible]-[illegible]?

**[[illegible]]**

[illegible], [illegible], [illegible]

[illegible], [illegible] ‘[illegible]’ [illegible]-[illegible] ‘[illegible]’ [illegible][17] [illegible], (…[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], ‘[illegible], [illegible]’ [illegible], [illegible], [illegible], ‘[illegible]’ [illegible]

এমন কিছু গুণ রয়েছে যা তাকে আগে বাড়িয়ে দিচ্ছে, যে গুণগুলো অন্যদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না...)

আমি মনে করি, ‘আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ’ আর ‘সর্বাধিক যোগ্য’- উভয়টির মর্ম একই। [সুতরাং উপরের ইবারতে ‘আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ’ বলে ‘সর্বাধিক যোগ্য’- এটাই বুঝানো হয়েছে। অনুবাদক।] কিন্তু যদি ‘সর্বাধিক যোগ্যতা’র বিষয়টি সাংঘর্ষিক হয় এমন একটি গ্রুপের সাথে যারা ইতিমধ্যে জিহাদী হাই-কমান্ডের নিকট বাইয়াত দিয়ে রেখেছে, অথচ যোগ্যতার বিচারে তাদের অপর এমন একটি গ্রুপের অধীনে কাজ করা উত্তম মনে হচ্ছে যারা হাই-কমান্ডের অধীনে নয়, সেক্ষেত্রে এ গ্রুপটির জন্য অপর গ্রুপের নেতৃত্বকে বুঝানো উচিত যে, তারা তাদের নেতৃত্বে সবসময়ের জন্য নয় বরং সাময়িক সময়ের জন্য কাজ করবে, কেননা এই গ্রুপ এবং গ্রুপের সকল সদস্য ইতিমধ্যে হাই-কমান্ডকে বাইয়াত দিয়ে রেখেছে এবং যতক্ষণ গ্রুপটি অপর গ্রুপটির নিয়ন্ত্রিত এলাকাতে থাকবে এবং ওই গ্রুপটি এ এলাকাকে কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা শাসন করবে, ততক্ষণ তারা অপর গ্রুপের আমীরকে মান্য করবে এবং তাঁর পাশে থেকে লড়াই করবে এবং শরিয়াহ আইনের সাপোর্টে তাকে সহযোগিতা করবে যতক্ষণ না তাঁরা অন্য ভূমিতে জিহাদের জন্য যায়।

সন্দেহ নেই, বিষয়টির অন্যান্য দিকও রয়েছে। বিশেষকরে যেহেতু এর অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ই শরিয়াহ রাজনীতির মধ্যে পড়ে। বিষয়টির আরও শক্ত শরিয়াহ ভিত্তি প্রদান করা দরকার এবং দরকার বিস্তারিত বিবরণের, যা এই লেখার সীমিত পরিসরে আঁটবে না। এই কারণে আমি আমার লেখায় তাওহীদ ও জিহাদপন্থী যোগ্য আলেমদের কাছে আবেদন জানাবো, তারা যেন এর সমস্যাকর দিকগুলো আমাদেরকে গ্রাস করার পূর্বেই বাস্তবতার নিরিখে এর আরও সম্ভাব্য দিকগুলো নিয়ে একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রস্তুত করেন। বিশেষকরে এখনও যেহেতু সে ধরণের ব্যাপক বাইয়াহ শুরু হয়নি তাই এর আগে আগেই তা প্রস্তুত করা দরকার। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে যে কোনো মছিবত থেকে নিরাপদে রাখেন এবং অন্তরগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে দেন। আমীন।

৯ম পরিচ্ছেদঃ

নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণঃ নজরদারী করা, অনুপ্রবেশ বা গুপ্তচরবৃত্তি করা ও এ সংক্রান্ত সমস্যা এবং শত্রুপক্ষের গুপ্তচর থেকে বেঁচে থাকা

আমাদের এ লড়াই বেশ দীর্ঘ, এখনো তা প্রাথমিক পর্যায়েই আছে। অবশ্য আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে আমাদের এমন কিছু ইলাহী তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ অর্জিত হয় যেগুলোর মাধ্যমে আমরা কিছু কিছু ধাপ সহজেই উতরে যেতে পারি। তবে বাহ্যিক ঘটনাবলী ও পর্যায়ক্রমে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো আমাদেরকে দীর্ঘ লড়াইয়ের বার্তাই দেয়। আর লড়াইয়ের দীর্ঘতাই প্রতিপক্ষ ও তাদের সহগামীদের মাঝে ফাটল তৈরির জন্য আমাদেরকে সুযোগ তৈরি করে দেয়। আর শক্তিশালী ‘নিরাপত্তা ব্যবস্থা’ চলমান আন্দোলনের নিরাপত্তার জন্য এবং পরবর্তীতে কাঙ্খিত রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য বড় ধরণের ভিত হিসেবে কাজ করে। সুতরাং আমাদের উচিত পুলিশ বিভাগ, সেনাবাহিনী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, বিভিন্ন ইসলামিক দল ও পেট্রোল কোম্পানিগুলোতে কর্মী বা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে গুপ্তচর ঢুকিয়ে দেয়া। তেমনিভাবে বেসরকারি নিরাপত্তাপ্রদানকারী কোম্পানিগুলোতে ও স্পর্শকাতর পাবলিক প্রতিষ্ঠানসহ আরও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিজেদের লোক ঢুকিয়ে দেওয়া। এই প্রক্রিয়া কার্যত কয়েক দশক আগেই শুরু হয়েছে, কিন্তু বর্তমান ঘটনাবলীর আলোকে আমাদের এই কাজে আরও বেশি জোর দেওয়া উচিৎ। তেমনিভাবে একইস্থানে ভবনের বিভিন্ন তলার জন্য বা প্রয়োজনে একই তলার জন্য একাধিক লোক নিয়োগের প্রয়োজনও দেখা দিতে পারে, যেখানে একজন আরেকজনকে চিনবে না বা এর ব্যতিক্রমও হতে পারে।

[কিছু সমস্যা]

এই কাজে আমাদের বেশ কিছু সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে। তন্মধ্যে একটি হলো, গুপ্তচর নির্বাচেনের বিষয়টি। এ কাজের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি সম্পর্কে অবশ্যই এ আস্থা থাকতে হবে যে, সে কুফর-শিরকে পূর্ণ বা শরিয়াহ বিরোধী কর্মকান্ডে ভরপুর কোনো পরিবেশে নিজের দ্বীনকে হেফাজত করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে হতে পারে, পূর্ব থেকে ওই ব্যক্তির ধার্মিকতা সম্পর্কে আমাদের জানা নাও থাকতে পারে এবং সে এমন কেউও হতে পারে, যে পূর্বে কখনও কোন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি। মোটকথা, আমরা কখনো (এ কাজের জন্য) এমন কোনো মুসলিমকে নির্ধারণ করে ফেলি যে নতুন দ্বীনদার বনেছে, ফলে সেক্ষেত্রে বড় ধরণের জটিলতা তৈরি হয়।

অবশ্য আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি ও সম্ভাব্য ভবিষ্যত পরিস্থিতি এমন একটি বাহ্যিক অবস্থা তৈরি করেছে যা সমস্যা নিরসনে ভূমিকা রাখবে (ইনশাআল্লাহ)। আর তা হলো, অধিক পরিমাণে জিহাদী জযবাওয়ালা যুবকদের আগমন, যারা খুব দ্রুত জিহাদী কর্মকান্ডে এমনকি ফিদায়ী হামলায়ও নিজেকে শামিল করতে চায়। অল্পকিছু হালাত পর্যালোচনা করেই আমরা এ শ্রেণির যুবকদের চিহ্নিত করতে পারি এবং তাদের অন্তরের সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারি। তাদের শাহাদাতের তামান্না তাদের উত্তম ঈমানী অবস্থার প্রমাণ বহন করে। তানজীমের অধীনে কিছু ইলমী ঘষামাজা আর দিক-নির্দেশনারই শুধু প্রয়োজন হয়। আর এটাই স্বাভাবিক যে, তাদের অধিকাংশকে তাদের শক্তি, জযবা উভয়টি নিবারণের জন্য সরাসরি জিহাদ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করা হবে। তবে বিভিন্ন গ্রুপের নেতৃবৃন্দের গভীর দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণের পর তাদের গুণাবলী ও সামর্থ্য যাচাই করে তাদের কাউকে কাউকে নিরাপত্তা বিভাগের সদস্য হিসেবে নির্বাচন করা যেতে পারে; যাদের কাজ হবে সেসব প্রতিষ্ঠানে গুপ্তচর হিসেবে কাজ করা। তবে প্রথমেই তাদেরকে এর গুরুত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে। বুঝাতে হবে যে, তার কাজটি ফিদায়ী হামলার পর্যায়েই। বরং হতে পারে তার কাজের পূর্ণতা লাভ হবে ফিদায়ী হামলার মাধ্যমেই। যার মাধ্যমে এক পর্যায়ে সে ওই প্রতিষ্ঠানে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে, যদি তা শরয়ীভাবে বৈধ হয় অথবা সেখানকার কিছু বিশেষ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপারেশন পরিচালনা করবে, যদি তারা এমন দলের অন্তর্ভূক্ত হয় যাদেরকে টার্গেট করা বৈধ। তাদের জন্য আলাদা শিক্ষামূলক কার্যক্রম চালু করতে হবে, যা তাদেরকে শিক্ষা দিবে কীভাবে নিজেকে প্রকাশ না করেও নিজের ঈমান-আমল হেফাজত করা যায়। তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন কাজে জড়িত হওয়ার ফলে (বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের কারণে) তাদের উপর যখন চাপ বৃদ্ধি পায়, তখন এই শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম সেসব চাপ লাঘব করে তাদের ঈমানী উৎকর্ষতা অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। অধিকাংশ সময়েই গুপ্তচরবৃত্তির প্রক্রিয়ায় এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য একটা ভাল পর্যায়ে পৌঁছুতে বেশ দীর্ঘ সময় লাগে, যাতে করে যে প্রতিষ্ঠানে সে গুপ্তচরবৃত্তি করছে সেখানে তার ভূমিকাকে সে পাকাপোক্ত করতে পারে। এক্ষেত্রে (আমাদের পক্ষ থেকে) সেই সদস্যকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা দেয়ার পর তার স্বাধীনভাবে চলাফেরা পরিত্যাগ করা লাগতে পারে। আর তা হতে পারে কাজের স্বার্থেই এবং কাঙ্খিত বিভিন্ন ধরণের তথ্যের স্বার্থে এবং যখন তার কাছে সেসব তথ্য তলব করা হবে তখন সেগুলো সে কীভাবে লিপিবদ্ধ করবে এবং কীভাবে নিরাপদ রাখবে তা বিবেচনা করে অথবা ক্রিটিক্যাল কিছু তথ্য যেগুলো অনতিবিলম্বে খুব দ্রুত পৌঁছানো দরকার- তা বিবেচনা করে।

সন্দেহ নেই, একাধিকবার তার পক্ষ থেকে আগত তথ্য যাচাইয়ের পর যখন সেসব তথ্যের যথার্থতা ও সত্যতা স্পষ্ট হয়, তখন সেই সদস্যের বিশ্বস্ততা ও সামর্থের ব্যাপারে উত্তরোত্তর আস্থা বৃদ্ধি পায়। কেননা শুরুতে আমরা তার ব্যাপারে ভালভাবে জানি না। একারণে তাকে তার কাজের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি তথ্যও দেওয়া হয় না এবং যোগাযোগে নিয়োজিত ব্যক্তি (এজেন্ট) ছাড়া আর কারো সাথেই তার যোগাযোগ থাকে না। যেকোন পরিস্থিতিতে ‘কাজ’ই তার বাসনা, তাকে এমন মনোভাবের হতে হয়।

[যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে]

যদি সে এজেন্টের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হারিয়ে ফেলে -এটা হতে পারে এজেন্টের শাহাদাত বরণের কারণে বা জরুরি প্রয়োজনে অন্য কোথাও স্থানান্তর হওয়ার কারণে বা অন্য কোন কারণে- এরকম পরিস্থিতিতে সেই সদস্য তার কাজ চালিয়ে যাবে, যতক্ষণ না মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে নৈরাজ্যপূর্ন এলাকার উদ্ভব হয়। এরপর স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো নিকটাত্মীয়ের সাথে দেখা করার বাহানা করে বা ব্যবসার বাহানায় বা অত্যন্ত গোপনে সে সেসব এলাকায় একটু ঘুরে আসবে। সে তখন বাহ্যিক প্রশাসনের সাথে সাক্ষাত করে বলবে তাকে যেন নিরাপত্তা বিভাগে দায়িত্বরত এমন কারো কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। অতঃপর তার যদি সনাক্ত করার মতো কোনো গোপন কোড থাকে তাহলে তা ওই ব্যক্তিকে জানাবে। আর যদি সেই কোড দায়িত্বরত ব্যক্তির পরিচিত না হয় তাহলে কোড ছাড়াই তার কাছে থাকা তথ্যগুলো দায়িত্বরত সেই সদস্যকে জানাবে। অতঃপর তার দেয়া তথ্যের ধরণ অনুযায়ী নিরাপত্তা বিভাগের নিকট থেকে কী জবাব আসে, সে এর অপেক্ষায় থাকবে যে, সে কি আগের মতই তথ্য সংগ্রহ চালিয়ে যাবে, নাকি নৈরাজ্যপূর্ন এলাকায় পালিয়ে চলে আসবে, নাকি তার কর্মস্থলে সে নিজেই বা সেখানে পাঠানো কোনো বিশেষ টিমের সহযোগিতায় ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে?

[কাজ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে উঠলে]

পূর্বে বর্ণিত পরিস্থিতিতে সে যে এলাকায় অবস্থান করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলো সেখানে বা তার কাছাকাছি এলাকায় নৈরাজ্যপূর্ন এলাকার উত্থান হতে বিলম্ব হতে পারে। আবার তার জন্য ওই কাজ চালিয়ে যাওয়াও কঠিন হয়ে উঠতে পারে। যেমন, হতে পারে চাকরি চালিয়ে গেলে তা তার দ্বীনকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে বা তার গুপ্তচরবৃত্তি প্রকাশ পেয়ে যাওয়ার উপক্রম হতে পারে ইত্যাদি। এমন পরিস্থিতিতে সে তার কর্মস্থল ত্যাগ করবে এবং সর্বাত্বক চেষ্টা করবে পাহাড়ে বা অন্য যে কোন স্থানে মুজাহিদদের সাথে যোগ দিতে অথবা যদি পরিস্থিতি অনুকূলে হয় তবে সে তার কর্মস্থলে একটা ধ্বংসাত্বক অপারেশন চালাবে, যদি কাজটি করা বৈধ হয় অথবা যদি উক্ত কাজের দ্বারা এক বা একাধিক শত্রু বিনাশ করা সম্ভব হয়। কাজটি করার পর নিরাপদস্থানে সরে এসে মুজাহিদদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে।

অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু জায়গায় কোনো সংগঠন বা মুজাহিদ গ্রুপের সামরিক বা দাওয়াহ সংক্রান্ত কর্মকান্ডে ফাটল তৈরি করা সম্ভব হয়, ওই সদস্যের কর্মস্থলে ব্যাঘাত ঘটা ছাড়াই।

[ইসলামী দলগুলোতে গুপ্তচরবৃত্তি]

যেসকল ব্যক্তির ব্যাপারে আস্থা রয়েছে যে, তারা ইলমী সংশয় মোকাবিলার পাশাপাশি নফসানিয়্যাত থেকেও বেঁচে থাকতে পারবে, তাদের মাধ্যমে অন্যান্য ইসলামী দলগুলোতে গুপ্তচরবৃত্তি করালে বরং নেতৃত্বের সিঁড়ি বেয়ে তাদেরকে উপরের দিকে উঠাতে পারলে অনেক ধরণের উপকারিতা আসতে পারে। এর সফল কিছু দৃষ্টান্তও রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ‘মুসলিমদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি হারাম’ এ প্রশ্নটি আসে। তাহলে তাদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ কীভাবে সম্ভব? আমার বিশ্বাস, যেসকল ইসলামী আন্দোলন মুজাহিদদের ক্ষতি করে কিংবা তাগুতের সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদের উপর গোয়েন্দাগিরি বৈধ হবে। আর যেসকল আন্দোলন মুজাহিদদের ক্ষতি করে না, তাদের মাঝে গুপ্তচরবৃত্তি তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হবে না বরং সেখানে উদ্দেশ্য হবে, তাদের মাঝে সঠিক বুঝ সৃষ্টি করা, তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করা এবং কঠিন পরিস্থিতিতে ও কঠিন সিদ্ধান্তগুলোর ক্ষেত্রে জিহাদের স্বার্থের অনুকূলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা।

অবশ্য পূর্বের আলোচনাটি একটি সাধারণ ধারণা মাত্র, যা পরিবর্তনযোগ্য। তবে যেসব ‘নীতিমালা’ পূর্বের ধাপগুলোর সঠিক সম্পাদনকে নিয়মানুগ ও নিরাপদ করে এবং অন্যান্য দিক নিয়েও আলোচনা করে, সেসব ‘নীতিমালা’ একটি নিরাপত্তা সিস্টেম গড়ে

তোলার ক্ষেত্রে এবং গোয়েন্দা নজরদারি ও তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির ক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

**[শত্রুর গুপ্তচরবৃত্তি থেকে বাঁচতে হলে করণীয় ]**

অন্যদিকে রয়েছে আমাদের আন্দোলনকে অন্যদের গুপ্তচরবৃত্তি থেকে নিরাপদ রাখার ‘নীতিমালা ’। এ বিষয়টি নিয়ে যিনি গবেষণা করবেন তাঁকে মুজাহিদদের নিরাপত্তা বিষয়ক যেসব প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় সেগুলো দেখতে হবে। তেমনিভাবে নিরাপত্তা এনসাইক্লোপেডিয়া এবং জিহাদী এনসাইক্লোপেডিয়ার মধ্যে প্রকাশিত অনুসন্ধানী রিপোর্টগুলো দেখতে হবে। তেমনিভাবে ‘মুআসকার আল-বাত্তার ’ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ধারাবাহিক সিরিজগুলোও দেখতে হবে। এছাড়াও বিভিন্ন লাইব্রেরিতে থাকা সাধারণ গ্রন্থগুলোও দেখতে হবে , যদি গবেষক ওগুলোতে থাকা শরয়ী ভুলগুলো চিহ্নিত করার সক্ষমতা রাখেন , বিশেষকরে নীতিমালা সংক্রান্ত ভুলগুলো। তবে বাজারে প্রচলিত কমার্শিয়াল বইগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে , কারণ ওগুলো পড়লে সময় নষ্ট করা ছাড়া তেমন কোনও লাভ হবে না বা হলেও ভাসাভাসা ও ভুল কিছু পদ্ধতি জানতে পারবেন।

১০ম পরিচ্ছেদঃ

আন্দোলন পরিস্থিতির মাঝেও সঠিক জ্ঞানচর্চা ও দীক্ষা অব্যাহত রাখা তে হবে - , যেমনটা ছিল ইসলামের প্রথম যুগে

পূর্বে একটি গবেষণায় এর কিছু নির্বাচিত অংশ প্রকাশ করা হয়েছিল -আল্লাহ তা পুর্ণাঙ্গপ্রকাশের তাওফিক দান করুন - যেখানে আমি তরবিয়ত তথা দীক্ষার বিষয়টি আলোচনা করেছিলাম এবং বিশ্লেষণ করেছিলাম কীভাবে ইসলামের প্রথম প্রজন্ম (সাহাবায়ে কেরাম রাযি .) দুর্যোগ পরিস্থিতিতে দীক্ষা লাভ করেছিলেন। ওই গবেষণা প্রবন্ধের কিছু পয়েন্ট যা আমাদের এ আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিক , তা এখানে তুলে ধরছি,

তরবিয়ত তথা দীক্ষা প্রদানের বিভিন্ন পদ্ধতি

১। التربية بالموعظة - উপদেশের মাধ্যমে তরবিয়ত

ক। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে বেশিরভাগ নছিহতই করেছেন আল্লাহর কিতাব থেকে। কেউ কেউ একে স্বতন্ত্র একটি শিক্ষা পদ্ধতি বিবেচনা করেন এবং এর নাম দেন **‘কুরআনের মাধ্যমে শিক্ষাদান বা দীক্ষাদান ’**। যদিও আমার মতে ‘কুরআনের মাধ্যমে দীক্ষা প্রদান ’- এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে , যা আমি সামনে স্পষ্ট করবো। সেই বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করলে আবার (নছিহত হিসাবে ) এই শ্রেণীতে ভাগ করা প্রকারভেদকে আমরা গ্রহণ করতে পারি না।

খ। ‘উপদেশের মাধ্যমে দীক্ষা প্রদান ’ এর আওতায় **‘ঘটনা বলার মাধ্যমে শিক্ষাদান ’,** এ বিষয়টিও রয়েছে। অনেকে এটিকেও শিক্ষাদানের স্বতন্ত্র একটি পদ্ধতি বলে থাকেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে যেসব ঘটনা শুনিয়েছেন তন্মধ্যে কয়েকটি হলো , ‘বালক ও যাজকের ঘটনা’, ‘গুহায় আটকে পড়া তিন ব্যক্তির ঘটনা ’ এছাড়া আরও নানা ঘটনা। তাছাড়া কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী তো আছেই।

গ। ‘উপদেশের মাধ্যমে দীক্ষা প্রদান ’ এর আওতায় আরও পড়ে **‘দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান ’**। কেউ কেউ এটিকেও একটি শিক্ষাদানের স্বতন্ত্র পদ্ধতি বলেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সামনে যেসব দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন এর একটি হলো, ‘পরস্পর মিল -মহব্বতের ক্ষেত্রে মুমিনদের দৃষ্টান্ত হলো ....’।

এছাড়াও আরও নানা দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন। তাছাড়া মুমিনদের জন্য কুরআনে তো বিস্তর দৃষ্টান্ত রয়েছেই।

২। التربية بالعادة - অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে তরবিয়ত

এর অর্থ হলো প্রত্যেককে বিভিন্ন আচার -ব্যবহার ও চারিত্রিক গুণাবলীতে অভ্যস্ত করে তোলা, যদিও প্রথম দিকে তারা ওই শিক্ষার মর্ম উপলব্ধি করতে না পারে। যেমন আমাদের শরিয়তে এসেছে, শিশুদেরকে সালাত ও অন্যান্য ইবাদাতে অভ্যস্ত করার বিষয়টি। এই পদ্ধতি শুধু শিশুদের জন্যই সীমাবদ্ধ না। বরং একজন নেতা এবং দীক্ষক এটা বয়স্কদের ক্ষেত্রেও খাটাতে পারেন। এমনকি আমাদের কিছু সালাফ (পূর্বপুরুষ ) নিজেদেরকেও এ পদ্ধতিতে তরবিয়ত করেছেন।

৩। التربية بالطاعة - নেক আমলের মাধ্যমে তরবিয়ত

যদিও মহৎ কার্যাবলীর সম্পাদন যেমন সালাত , সিয়াম , সাদাকা প্রদান - এগুলোকে পূর্বের উপোরেল্লিখিত পদ্ধতিগুলোর লক্ষ্য ও ফলাফল বিবেচনা করা হয় , তথাপি এটা নিজেও মানব আত্মাকে এগিয়ে নেওয়ার একটি আদর্শ পদ্ধতি।

৪। التربية بالقدوة - অনুসরনীয় ব্যক্তিদের মাধ্যমে তরবিয়ত

সেসব মহামানবদের দৃষ্টান্ত নিয়ে চিন্তা -ভাবনা করা যারা আল্লাহর নির্দেশ শুনার সাথে সাথেই সাড়া দিয়েছেন এবং আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজেদের সমস্ত দামী ও প্রিয় বস্তু বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের উদাহরণগুলো নিয়ে চিন্তা -ভাবনা করাকে ব্যক্তির নৈতিক উৎকর্ষের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপায়ের মধ্যে বিবেচনা করা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ এবং তাঁদের পরবর্তী মনীষীগণ নিজ নিজ সময়ে উম্মতের জন্য এবং সকল মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিলেন। বরং তারা সর্বকালের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ ছিলেন। এমনকি যুদ্ধে সেনাপতিরা যখন খলীফার কাছে বড় ধরণের সাহায্য চেয়ে পাঠাতেন তখন খলীফা তাদের সাহায্যে এমন গুটিকয়েক সাহাবীদের পাঠাতেন যাদের সংখ্যা গুনলে এক হাতে আঙ্গুলির বেশি হবে না। সাথে এই বার্তাও পাঠিয়ে দিতেন যে , এদের একেকজন এক হাজারের সমান, বলে দিতেন তাদের কীর্তি ও গুণাবলী। যখন এসব সাহাবীদের জীবন ধারা সেনাশিবিরে ছড়িয়ে পড়তো –যে সেনাশিবিরের অধিকাংশই থাকত বিজীত দেশের অধিবাসী - তখন তাদের মাঝে ব্যাপকভাবে ইবাদতে আত্মনিয়োগের এক নবচেতনা জাগ্রত হতো , বিশেষকরে জিহাদে আত্মোৎসর্গের উদ্যম সকলের মাঝে ছড়িয়ে পড়তো। যুদ্ধের সারিতে এমন অনুসরণীয় ব্যক্তিদের উপস্থিতিই শুধু এর পিছনে কারণ ছিল। একারণে যখন আমাদের সারিতে এমন লোকদের থাকবে যারা আল্লাহ্র যে কোনো নির্দেশ বাস্তবায়নে নিজেদের দামী ও প্রিয় বস্তু বিলিয়ে দিবে , তখন তাদের এই উপস্থিতি -ই ঈমানী আন্দোলনের শিবিরে আত্মিক উৎকর্ষের সর্বোত্তম উপায় হবে ইনশাআল্লাহ। বিশেষত যারা ইসলামী কাজে নতুন জড়িত হয়েছে তাদের জন্য।

হযরত সা‘দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি . একবার তাঁর প্রদেশের জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন। খলীফা তাকে এখানকার গভর্ণর নিযুক্ত করেছেন। ভাষণে তিনি তাদেরকে বললেন, ‘আমার মনে পড়ে, একবার আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাতজনের একজন ছিলাম , আমাদের কাছে গাছের পাতা ছাড়া খাবার মত কিছুই ছিল না ... এক পর্যায়ে তিনি বললেন , সে সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকা আমাদের প্রত্যেককেই বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি , তারা কোনো

না কোনো শহরের গভর্ণর। আমি ওই অবস্থা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই যে, আমি নিজেকে নিজে উঁচু মনে করবো অথচ আল্লাহর কাছে আমি নিচু' (সাহাবীর কথা হয়তো এমনই ছিল বা এর কাছাকাছি, আল্লাহ্ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন)

তাঁরা ছিলেন ইসলামে নবদীক্ষিত জাতির জন্য দৃষ্টান্ত ও আদর্শ। ইসলামে নতুন দীক্ষিত হয়েও কীভাবে তারা আল্লাহর আদেশকে বাস্তবায়িত করবে এবং যেসব বিজয়াভিযানে তারা অংশ নিয়েছে তাতে কীভাবে উত্তম প্রতিদান পেতে পারবে - এর জন্য সেসব সাহাবী ছিলেন জীবন্ত এবং উজ্জল নমুনা। সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন শক্তি, ক্ষমতা ও ন্যায়পরায়ণতার পাশাপাশি সবর, দৃঢ়তা, সুউচ্চ মনোবল, বীরত্ব ও বিনয়ে সকলের জন্য জীবন্ত আদর্শ ও নমুনা।

**[একটি আজব সংশয়]**

এপ্রসঙ্গে একটি সংশয় দেখে আমি বিস্মিত হই, যা কয়েকটি ইসলামী দলের মাঝে বেশ প্রসার লাভ করেছে। যদিও এ সংশয়ের উৎস ছিল ব্রাদারহুড আন্দোলনের নেতারা, কিন্তু বর্তমানে এই ব্যাধি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সংশয়ের বক্তব্যটি এমন, 'আমরা বর্তমানে (জিহাদের প্রস্তুতিমূলক) কাজ করে যাচ্ছি, এখন জিহাদ ও অন্যান্য জটিল বিষয়গুলোর প্রয়োজন নেই। আমাদের বর্তমান প্রস্তুতি মূলত আগত জিহাদি প্রজন্মের জন্য, যে প্রজন্মে থাকবে আমাদের সন্তানেরা, আমাদের পৌত্ররা'।

আমরা এই সংশয়ের আবিস্কারক ও তার অনুসারীদের প্রতি -যারা শরয়ী নির্দেশনা বাস্তবায়ন থেকে পালিয়ে বেড়ায় - নিচের প্রশ্নটি ছুড়ে দিলাম, 'তবে সেই জীবন্ত মানব নমুনাগুলো কোথায়, যাদেরকে সেই সন্তানেরা আদর্শ বানাবে? তোমরাই তো তোমাদের সন্তানদের নমুনা [বা মডেল], যদি তোমরা বসে থাক তাহলে তারাও বসে থাকবে। আর তারাও (তোমাদের মতো) প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের আকারে জিহাদ করবে এবং পূর্বপুরুষদের মতো কিতালকে পরিত্যাগ করবে'।

৫। التربية بالأحداث - কঠিন পরিস্থিতির মাধ্যমে তরবিয়ত

মানুষের উপর দিয়ে অতিবাহিত বিভিন্ন অবস্থা বা পরিস্থিতি তাদের মাঝে উপলব্ধি তৈরিতে বড় ধরণের ভূমিকা রাখে। তোমার জীবনে যখন ধারাবাহিক এমন বড় বড় ঘটনা বা পরিস্থিতি আসে [যেসব পরিস্থিতি তুমি অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে -যেমন সন্তান, সম্পদ, স্ত্রী, শত্রু দ্বারা ফেতনাগ্রস্ত হয়ে - নিজের জন্য বরণ করে নিয়েছো], এবং এসব পরিস্থিতি যখন আবার এমন বিরাট বিরাট দূর্ঘটনার সাথে যুক্ত হয় যেসব দূর্ঘটনা বিবেককে কেড়ে নেয় এবং সার্বক্ষণিকভাবে মনের সাথে তোমাকে এক ধরণের যুদ্ধে লিপ্ত করে, [যেই যুদ্ধ কখনো চলে কোনো দূর্ঘটনার আশংকাকে সামনে রেখে, আবার কখনো চলে কোনো ভুল বা বিচ্যুতির শিকার হয়ে, ধিক্কার হিসেবে] এবং তুমি যখন এসকল পরিস্থিতি ও ঘটনাগুলোর পারস্পরিক যোগসূত্র খুঁজে পাবে -- তখন তোমার নিজের সাথে বা তোমার সম্পদ বা অন্য কিছুর সাথে ঘটে যাওয়া যে কোনো পদস্খলনই তোমার মাঝে উপলব্ধি তৈরি করবে এবং কখনো কখনো শত্রুর সম্মুখে যে কোনো পদস্খলন ও বিচ্যুতি ঘটার ক্ষেত্রে তোমাকে পথ দেখাবে।

**[আদর্শ মুসলিম ব্যক্তিত্ব গঠনের দুটি পদ্ধতি]**

তরবিয়তের পূর্বোক্ত পদ্ধতিগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মুসলিম জাতির আত্মিক উৎকর্ষ সাধনে 'ঐশী পদ্ধতি' কোনটি, সে দিকে আমরা যদি একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকাই তাহলে দেখব যে, তা পূর্বের সবগুলো পদ্ধতির মধ্যে দুটি পদ্ধতিকে অন্যান্য পদ্ধতির কার্যকারিতার জন্য মূল নিয়ামক সাব্যস্ত করেছে। বরং

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

[illegible]

[illegible]

যদিও উপরের আয়াতটি জিহাদকে নির্দেশ করে, যেমনটি আয়াতের তাফসীরে এসেছে, তবে সাধারণভাবে এটি আল্লাহর সমস্ত নির্দেশে সাড়া দেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে। কারণ, আল্লাহর সমস্ত নির্দেশের মধ্যেই (আমাদের জন্য প্রকৃত) জীবন রয়েছে।

লক্ষ্য করুন, যদি মদ হারাম করার আয়াতটি বা পর্দা ফরয হওয়ার বিধানটি মুমিনদের ঘিরে রাখা বিভীষিকাময় কঠিন পরিস্থিতিতে না এসে স্বাভাবিক সময়ে আসতো তাহলে এসব বিধানের প্রতি সাড়া দানের হার কেমন হতো?

সাইয়্যিদ কুতুবের প্রতি আল্লাহ রহম করুন, তিনি বলেন, ‘নিশ্চয়ই কোরআন তার ভেদ শুধু ওই সকল লোকদের কাছেই প্রকাশ করে যারা কোরআনকে সাথে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং যারা এমন পরিবেশে বসবাস করে যে পরিবেশে কোরআন প্রথমে নাযিল হয়েছিল’।

[শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ‘র অনন্য বাণী]

এই কারণে পূর্ববর্তী আলেমগণ এবং সমসাময়িক বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ‘র এই উক্তির প্রতি বেশ সজাগ হয়েছেন। তিনি বলেন, ‘যার গুনাহ অনেক বেশি তার সর্বোত্তম চিকিৎসা হল জিহাদ’।

এই ব্যাপারে ইমাম ইবনুল কাইয়্যুম রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘যেসব লোকে জিহাদ করা এবং খোলাখুলিভাবে সত্য প্রকাশ করা বাদ দিয়ে নামায, রোযা, কুরআন তিলাওয়াত এবং জিকিরে মশগুল থাকে, মোটকথা প্রত্যেক এমন কাজে মশগুল থাকে যেগুলো নরম তরবিয়ত ওয়ালাদের কাছে চূড়ান্ত লক্ষ্য, সেই লোকদের অন্তর মৃত এবং আল্লাহ তাদেরকে ঘৃণা করেন। [আমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং দ্বীন, দুনিয়া ও আখেরাতে সকল বিপদ থেকে পরিত্রাণ কামনা করি]

এই ব্যাপারে শাইখ মুহাম্মদ আমীন মিসরী রহ.[18] বলেন, ‘যারা বলে, বর্তমানে জিহাদ করা কীভাবে সম্ভব? যেখানে মুসলিম জাতি শতধা বিভক্ত, অজ্ঞ এবং দীনের প্রকৃত বুঝ থেকে বহু দূরে? তাদের উত্তর হল, এ সব কিছুর সমাধান হল, যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করা...’ এক পর্যায়ে তিনি এটাও বলেছেন, ‘তরবিয়তের জন্য সর্বোত্তম ক্ষেত্র হল, যুদ্ধ ক্ষেত্র...’

এবং তিনি আরও বলেছেন, ‘আত্মশুদ্ধি ও আমলের মধ্যে ইখলাস অর্জনের ট্রেনিং ‘আল জামাআতুল ইসলামিয়্যাহ’[19] কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে এবং জিহাদের ময়দানে হওয়া উচিত। প্রথম যুগের মুসলমানদের তরবিয়ত এভাবেই হয়েছিল’।

তিনি আরও বলেন, ‘গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আমরা স্পষ্ট করতে চাই তা হল, মুসলিমদের তরবিয়তের ক্ষেত্রে এবং তাদের প্রত্যেক সদস্যের আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যাল [ময়দানের] জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।... যে জাতি ভীষণ বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয় এবং নানা প্রতিকূলতা ও কষ্ট বরদাশত করে এবং যে জাতির সন্তানেরা ধারাবাহিক সংগ্রাম ও জিহাদের মাঝে বড় হয়, সেই জাতিই বেঁচে থাকার যোগ্য। স্থায়িত্ব ও বিজয় এদের ভাগ্যেই লিখা থাকে’।

তিনি আরও বলেন, ‘প্রথমযুগের মুসলিমদের কাছে ময়দানের জিহাদ নফসের জিহাদের সাথে জড়িত ছিল। একটি আরেকটি থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্ছিন্ন ছিল না। আর ময়দানের জিহাদ মুসলিমদের তরবিয়তের জন্য এবং অন্তরে উন্নত গুণাবলী ও উচ্চ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বোত্তম উপায়’।

... وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

মৃত্যু যখন তার ভয়ংকর ছায়া দিয়ে সকলকে বেষ্টন করে , সেই মুহূর্তগুলোতেই অন্তরে উন্নত মানবিক গুণাবলীর চারা রোপণ হয়।

বিপদের মুহূর্তে ও কঠিন পরিস্থিতিতেই ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার প্রেরণা জাগ্রত হয়। আল্লাহর প্রতি আস্থা , বিশ্বাস , আমলে ইখলাস ও বিপদ থেকে উদ্ধারের অপেক্ষা এবং পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার প্রেরণা - এসবই জিহাদের ময়দানে জাগ্রত হয়। জাগ্রত হয় সেসব মুমিনের মাঝে যারা শুধুই আল্লাহর জন্য নিজেদের রূহকে উৎসর্গ করে। জিহাদী জীবন হল সেই জীবন যেখানে মু 'মিন মানবিক পবিত্র গুণগুলো আল্লাহর সামনে পেশ করে। ফলে তার জন্য অপরকে প্রাধান্য দেয়া সহজ হয়ে যায় , নিজের আমিত্ব ঝরে পড়ে এবং স্বার্থপরতা দূরীভূত হয়।

স্বাচ্ছন্দময় , নিরাপদ ও শান্ত পরিবেশে নফসের জিহাদ করা যায় , নফসকে দমানো যায়- এই দাবিটি বহু প্রতারণা মিশ্রিত একটি দাবি।

এই ধরণের শিক্ষাই প্রস্তুত করবে এমন এক প্রজন্ম যারা দীনি আমানত বহন করতে সক্ষম হবে এবং এরাই উম্মাহকে জিহাদ চর্চার সাথে যুক্ত করবে। এর মাধ্যমেই উম্মাহর জন্য সত্যিকারের নেতা তৈরি হবে। কারণ মিম্বরে খুতবা দেয়া সহজ , পত্রিকায় লেখা আরও সহজ , আর পুস্তকে লেখা আরও অধিক সহজ। পক্ষান্তরে বাড়ি ধ্বংস হওয়া , পরিবার গৃহহীন হওয়া , মা বোনের দেহ টুকরো টুকরো হওয়া , এগুলো উম্মাহর অসাধারণ ব্যক্তিরাই সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। এই ধরণের পরিবেশ ছাড়া বড় বড় নেতৃত্ব এবং ইস্পাত কঠিন সেনাবাহিনী তৈরি হয় না।

উম্মাহ তো কেবল এমন নেতার অপেক্ষায় আছে যে কঠিন তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম , যে তথাকথিত ফেতনা-ফাসাদকে ভয় করে না , ঠিক যেমনটি করেছিলেন হযরত আবু বকর রাযি .। তাঁকে বলা হয়েছিল , 'সকলেই আমাদের বিরুদ্ধে , আমাদের সামনে রয়েছে মুরতাদ বাহিনী , রয়েছে রোমীয় ও পার্সিয়ান বাহিনী। সুতরাং আপনি উসামার বাহিনীকে পাঠাবেন না। যদি পাঠাতেই হয় –যেহেতু তা নববী নির্দেশ - তবে যাকাত দিতে অনিচ্ছুক এমন অপ্রকাশ্য মুরতাদদের সাথে প্রথমে একটি সমঝোতায় এসে নিন '। আবু বকর রাযি . তখন ওমর রাযি.র কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন ,

أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام واالله لو حدث من المفاسد أن جرت الكلاب نساء المؤمنين لأنفذن بعث أسامة ولأقاتلن من منع عقالاً

জাহিলী যুগের দাপুটে ব্যক্তিটি আজ ইসলামে এসে ভীতু হয়ে গেল ! আল্লাহর শপথ ! যদি (মদিনায় ) এমন অস্থির পরিস্থিতিও দেখা দেয় যে , কুকুরের দল মুসলিম নারীদের [20] (পা কামড়ে) টেনে -হেঁচড়ে নিয়ে যায় , তবুও আমি উসামার বাহিনী পাঠাবো এবং যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে কেউ উটের রশিটুকু দিতে অস্বীকার করলে তার বিরুদ্ধেও আমি লড়াই করব '।

আবু বকর রা. কি এমন (বলিষ্ঠ ) নেতৃত্ব এ কারণে লাভ করেছিলেন যে তার খিলাফাহ 'র দায়িত্বটি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়েছিল , যে ধরণের প্রক্রিয়া অন্যান্য খলীফাদের ক্ষেত্রে হয়নি ? এমন কঠিন সিদ্ধান্ত তিনি কিভাবে নিতে পেরেছিলেন ? সাহাবীদের মন -মস্তিষ্কে এবং ওহীর মাপকাঠিতে তাঁর কাজ ও যোগ্যতাই কি তাঁকে অন্যদের চেয়ে আগে বাড়িয়ে দেয়নি ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে থেকে সফরের সকল কষ্টকর পরিস্থিতি থেকে তিনি কি তাঁকে আগলে রাখেননি ? ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহ , খুলি আর রক্তক্ষয়ী বড় বড় যুদ্ধের সফরগুলোতে তিনিই কি তাঁর পাশে থেকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েননি ? একমাত্র এ ধরণের ব্যক্তিরাই যে কোনও পরিস্থিতি বুঝতে সক্ষম হন এবং সঠিক বিষয়টি নির্ণয় করতে পারেন এবং তারাই তীব্র সঙ্কটের মুহূর্তে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

[কঠিন সিদ্ধান্ত বলে কী উদ্দেশ্য]

সমরবিদরা তাদের গ্রন্থে ‘কঠিন সিদ্ধান্ত’কে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, ‘কঠিন সিদ্ধান্ত’ হচ্ছে এমন সিদ্ধান্ত যা গ্রহণ করলে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার শুধু সুযোগই নয় বরং ক্ষেত্রবিশেষে প্রবল সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু তারপরও অন্যান্য দিক বিবেচনা করে তা নিতে হয় আর এই সিদ্ধান্ত কেবল একজন সত্যিকারের নেতাই নিতে পারেন’।

দীর্ঘ অনেক বছর যাবত ব্যাপক মুসলিম নিধন শুরু হওয়ার পর থেকে পুরো মুসলিম উম্মাহ এ ধরণের নেতৃত্বের অপেক্ষায় আছে। আর এ ধরণের নেতৃত্ব তরবিয়তের সেই বিশেষ পদ্ধতিতেই কেবল আবির্ভূত হবে। ইতিমধ্যে এর কিছু অগ্রপথিক প্রকাশও পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। তবে আমরা আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুগ্রহে আরও নেতৃত্বের অপেক্ষায় আছি।

এ ধরণের পরিস্থিতিতেই আমরা এবং আমাদের সাথে পুরো মুসলিম উম্মাহ ভয়াবহ যুদ্ধপরিস্থিতি কঠোরভাবে ও বীরত্বের সাথে মোকাবেলা করতে শিখব। যদিও ভয়াবহ পরিস্থিতির কিছু তিক্ত স্বাদ লাঞ্ছনা সহকারে ইতিমধ্যে আমরা কিছুটা গলধঃকরণ করেছি। কিন্তু এখন সময় এসেছে সেগুলো অত্যন্ত কঠোরভাবে সম্মানের সাথে মোকাবেলা করার, হয়তো আল্লাহর ইচ্ছায় কোনো একদিন আমরা সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি থামিয়ে দিতে পারবো।

[যুদ্ধ এমনই হয়]

রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে আফগানদের কোনো এক যুদ্ধে এক এলাকার পুরুষরা তাঁদের নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে বোমা হামলা থেকে বাঁচাতে একটি মসজিদে জড়ো করে রেখেছিল। কিন্তু দেখা গেল, সেই মসজিদেই বোমা হামলা হয় এবং সবাই শহিদ হয়ে যায়। একটি মাত্র ছোট্ট মেয়ে বেঁচে যায়। বাচ্চাটি তার দাদীর কোলে ছিল। দাদীর মাথার খুলি ভাগ হয়ে ভেতরের মগজ তার সামনে ঝুলছিল। বাচ্চাটি ভয়ে চিৎকার করছিল। এক আরব মুজাহিদ বাচ্চাটিকে শান্ত করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সে নিজেই কাঁদছিল। তখন এক আফগান মুজাহিদ ওই আরব মুজাহিদকে বলল, আপনি কাঁদছেন কেন? আরব মুজাহিদ তাকে বলল, তোমার কি কোন অনুভূতি নেই? তারা তো তোমারই পরিবার, তোমারই আত্মীয়-স্বজন। তখন ওই আফগান মুজাহিদ উত্তর দিল, যুদ্ধ এমনই হয়। একদিন আমি, আপনি সকলেই তাদের মতো চলে যাবো।

[জ্ঞানগত উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রেও যুদ্ধ পরিস্থিতির বিরাট অবদান রয়েছে]

এতক্ষণ আমি ঈমানী স্তরের উৎকর্ষ সাধনে যা কিছু বলেছি, একই কথা ইলমী দিক দিয়ে উন্নতি করার ক্ষেত্রেও বলবো। কোরআনের আয়াত ও হাদীসের প্রেক্ষাপট যদি কেউ ঘেঁটে দেখে, দেখবে যে, মক্কা, মদীনা উভয় জায়গাতেই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল বা হাদীস বর্ণিত হয়েছিল শঙ্কাপূর্ণ সব ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে; হয়তো কোনো দুর্যোগের বা যুদ্ধের পূর্বে, অথবা কোনো দুর্যোগ বা যুদ্ধ চলাকালে, অথবা কোনো দুর্যোগের বা যুদ্ধের পর। বরং কিছু সাহাবী আক্বীদা সংক্রান্ত বিষয়াদিও যুদ্ধ চলাকালে শিখেছেন। যেমন, আক্বীদা সংক্রান্ত একটি মাসআলা হলো, একজন ব্যক্তি কিভাবে মুসলিম হয়? উসামা বিন যায়েদ রা. এর ক্ষেত্রে এমনই একটি ব্যাপার ঘটেছিলো, যখন তিনি এমন একজনকে হত্যা করেছিলেন যে কালিমায়ে শাহাদাতের দুটি সাক্ষ্য মুখে উচ্চারণ করেছিল। এমনই আরেকটি মাসআলা হলো, যাতুল আনওয়াতের মাসআলা। [‘যাতুল আনওয়াত’ একটি গাছ, যেখানে ইসলামের পূর্বে আরবরা তাদের ট্রফি ও অলঙ্কারগুলো বরকত লাভের আশায় ঝুলিয়ে রাখতো, কিছু সাহাবী তাদের নিজেদের জন্য এমন একটি গাছের আবদার জানালে কাজটি শিরক বিধায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ আবদার প্রত্যাখ্যান করলেন] এ ধরণের শঙ্কাপূর্ণ পরিস্থিতিতে বিষয়গুলো লোকদের অন্তরে ভালভাবে গেঁথে যায়। এ

কারণে আমাদের উচিত এ ধরণের শঙ্কাপূর্ণ পরিস্থিতি -যা আমাদের দলগুলোর উপর দিয়ে এবং উম্মাহ‘র উপর দিয়ে অতিক্রান্ত হয়- সেগুলোকে লোকদের ইলমী উন্নতির জন্য সুবর্ণ সুযোগ মনে করা।

পূর্বের আলোচনায় আমি যা বুঝাতে চেয়েছি তা হল, ‘তটস্থঃকরণ ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ’ ও ‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা’ এ দু‘টি ধাপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি লক্ষ্য হল, ‘ঈমান’ এবং ‘ইলম’ উভয়দিক থেকে লোকদের মাঝে উৎকর্ষসাধণ করা। এই দুই ধাপে যে পরিস্থিতি ও উত্তাপ বিরাজ করে এরচেয়ে ভালো পরিবেশ-পরিস্থিতিতে তা কিছুতেই অর্জিত হবে না। আমরা আল্লাহর কাছে দৃঢ়তা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করি।

[যুবকরা দলে দলে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিবে]

বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতির উত্তাপ তরবিয়তের জন্য যেমন সবচেয়ে উপযুক্ত পরিবেশ, তেমনি এর ফলে যুবকরা দলে দলে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগও দিবে। আর বাস্তবেও আমরা দেখছি যে, জিহাদের সাহায্যার্থে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যুবকরা আসছে। যেমন মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া থেকে এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের দেশগুলো থেকেও আসছে। আবার কিছু সংখ্যক আসছে ফালুজা ও আরও অন্যান্য শহর থেকে। এসব জায়গা থেকে প্রতিদিনই জিহাদের আনসাররা আসছে। অথচ তারা বড় বড় আলেমদের চিনে না, সেসব পরিস্থিতি সম্পর্কেও জানে না যার কারণে আরব বিশ্বের কোন কোন এলাকার যুবকরা বিচ্যুতির শিকার হয়েছে।

তারা একটি সাদা কাগজের মতো, তাদের এবং বিশুদ্ধ আবেগই তাদেরকে আল্লাহ্র দ্বীনের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করেছে। অবশ্য এর কারণে একটা নেতিবাচক প্রভাবও পড়তে পারে, যেমন শরিয়াহ শৃঙ্খলার ঘাটতি। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব হল এই পূরণ করা। এসব যুবক কখনোই আল্লাহ্র অনুগ্রহে জিহাদ ছাড়বে না। কারণ, এর ভেতরেই তারা মানবিক ফিতরাত খুঁজে পেয়েছে। এখন সে জিহাদের যে কোনো জীবন্ত কিংবদন্তী ও অনুসরনীয় ব্যক্তির নির্দেশ মেনে নিবে। এটা আমাদের উপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যে, বর্তমানে জিহাদের উপরের সারিতে ও এর আশপাশে যেসব অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব প্রতিনিধিত্ব করছেন তাঁরা ইলমীভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁদের চারপাশে রয়েছে সর্বোচ্চ মানের ইলমী ও শরয়ী কমিটি। আমাদের করণীয় যা তা হলো, এসব যুবকদের প্রতি মনযোগ দেওয়া, যাতে করে আন্দোলন ও যুদ্ধ চলাকালে তাদের দ্বীনি উৎকর্ষের জন্য শিক্ষা-দীক্ষার পথ খোলা থাকে। হয়তোবা আল্লাহ তাদের মধ্য থেকে আমাদের জন্য কোনো যোগ্য নেতা ও পথপ্রদর্শক বের করে আনবেন, যারা আল্লাহর দয়ায় ও অনুগ্রহে বিজয়ী হবে।

পাশাপাশি এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, কোন কোন দেশে যেমন মালেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের দেশগুলোতে ইসলামী আন্দোলনের কিছু মাথা রয়েছে এবং এমন কিছু ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যাদের ইলম সবার কাছে স্বীকৃত। তবে এসব স্বীকৃত ব্যক্তিরা -বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে যারা খুবই মুখলিস- দীর্ঘদিন থেকে অপেক্ষায় আছেন আরব বিশ্বে কখন ইসলামী জাগরণ তৈরি হবে। এমনকিছু ইলমী ও জিহাদী নেতৃত্বের অপেক্ষা করছেন যাদেরকে তাঁরা অনুসরণ করবেন এবং ওখানকার যুবকরা তাদের বিশুদ্ধ ফিতরতের কারণে ইসলামের সুমহান ইতিহাসের সৌরভ লাভ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। তারা শুধু এমন একজন নেতার অপেক্ষা করছে যিনি তাদেরকে গাইড করবেন, তাদের আন্দোলনের লক্ষ্য চিহ্নিত করে দিবেন এবং কোন্ শত্রুকে আগে টার্গেট করা উচিত তা নির্ধারণ করে দিবেন।

[তরবিয়ত বিষয়ক কিছু গ্রন্থ]

‘তরবিয়ত’ বিষয়ে নিচের গ্রন্থগুলো দেখা যেতে পারে,

১। শাইখ মুহাম্মাদ আমীন মিসরী রহ.র রচিত سبيل الدعوة الإسلامية ‘সাবীলুদ দা‘ওয়াতুল ইসলামিয়্যাহ’ (The method of Islamic proselytizing) من هدي سورة الأنفال ‘মিন হাদয়ি সূরাতিল আনফাল’ (From the guidance of surah al Anfal.)

২। ‘ফী যিলালিল কুরআন’ থেকে পরীক্ষা-বিপদাপদ ও যুদ্ধ সংক্রান্ত আয়াতের তাফসীর, বিশেষকরে ‘সূরা আহযাব’ এর তাফসীর।

৩। শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ‘র গ্রন্থ ও অডিও বয়ান।

## তৃতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্টে কয়েকটি কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি

ক। এই অধ্যায়ে এবং এর পূর্বের অধ্যায়ে আমি ইচ্ছে করেই কর্ম পরিকল্পনাগুলোকে একাধিক বার পুনরাবৃত্তি করেছি এবং কর্ম পরিকল্পনার কিছু বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখ করেছি। যাতে করে চলমান কাজ ও এর লক্ষ্যের ব্যাপারে পাঠক স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে। আমি এ বিষয়ে সতর্ক করতে চাই যে, কর্ম পরিকল্পনাকে একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করার কারণে যে পাঠক দ্রুত নজর বুলাবে তার কাছে মনে হতে পারে, এই কর্ম পরিকল্পনাটি স্পষ্ট নয়। তাই দ্রুততার সাথে পাঠ করলে এই কর্ম পরিকল্পনা পরিপূর্ণ বুঝা যাবে না। পাঠকের উচিত হবে, ধীরে ধীরে মনোযোগের সাথে কিতাবটি পড়া এবং অগ্রগণ্য রাষ্ট্রগুলোর অঞ্চলগুলোতে যেভাবে কাজ করা হবে তার সাথে অবশিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর কাজের ধরণের পার্থক্য বুঝা। পাশাপাশি এও বুঝা যে, ওই অগ্রগণ্য রাষ্ট্রগুলোতে দুটি পর্বে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে, যে দুটি পর্ব মুজাহিদদেরকে চূড়ান্ত পর্ব তথা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পর্বে নিয়ে যাবে। প্রথম পর্বের পদক্ষেপগুলো কখনো কখনো দ্বিতীয় পর্বের পদক্ষেপ থেকে ভিন্ন হবে, কখনো আবার সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। পক্ষান্তরে অবশিষ্ট রাষ্ট্রগুলো অধিকাংশ সময়ই একটি পর্বের ধারায় কাজ করে যাবে, যতক্ষণ না ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বাহির থেকে আসবে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয় অর্জিত হবে। তবে এটা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, অনগ্রগণ্য রাষ্ট্রের পদক্ষেপগুলো অগ্রগণ্য রাষ্ট্রের ঘটনাপ্রবাহ দ্বারা প্রভাবিত হবে।

খ। আমরা এসব নীতিমালা যত ভালোভাবেই আয়ত্ব করি না কেন এবং আমাদের অপারেশনগুলো যত নিখুঁত ভাবেই করে থাকি না কেন এবং ওগুলোর ফলাফল লাভ করি না কেন, এ সবের কারণে এক দিনের জন্যেও যেন গর্ব অহংকার এবং আত্মতুষ্টি আমাদেরকে না পেয়ে বসে। আল্লাহর করুণা ব্যতীত আমাদের আর কী-ই বা আছে? যারা আমাদের অবস্থা নিয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা করেন, তারা জানেন আমরা কতটা দুর্বল এবং আল্লাহ ছাড়া আমাদের কোনও শক্তি-সামর্থ্য নেই। আমাদের করণীয় হল, সঠিকভাবে কাজ করা, চেষ্টা করা এবং সামর্থ অনুযায়ী উপকরণগুলো অবলম্বন করা, সর্বোপরি আল্লাহ তা’আলার উপর ভরসা করা। তিনিই আমাদের মনিব, তিনি ছাড়া আমাদের কোনও মনিব নেই। যদি তিনি এক পলকের জন্যও আমাদেরকে নিজের কাছে ছেড়ে দেন তাহলে নিশ্চিতভাবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো। এমনকি আমি যখন কিছু কিছু অপারেশনের কথা শুনতাম, মনে হতো যেন, যারা অপারেশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাদের থেকে এটা অনেক দূরবর্তী টার্গেট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরবর্তীতে খুব অবাক হতাম যখন দেখতাম যে, আল্লাহর অনুগ্রহে অপারেশনের ফলাফল সকল প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেছে। অপারেশনের পরিকল্পনাকারী বা সম্পাদনকারী সকলের ধারণার বাইরে সফলতা অর্জিত হয়েছে। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য, যিনি তাওহীদ ও জিহাদের অনুসারীদেরকে তার দীনের সাহায্য করার তাওফিক দিচ্ছেন এবং তাদের কাজগুলোকে সফল করছেন এবং ওগুলোর ফলাফলকে বরকতময় করছেন।

উল্লেখ্য, আমি কখনো কখনো কিছু কিছু যুবকের কথা শুনি ও প্রবন্ধ পড়ি, যাতে অহংকার ও আত্মগরিমার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। হ্যাঁ, কাফিরদের মোকাবিলায় এবং যারা মুসলিমদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে চায় এমন মুনাফিকদের মোকাবিলায় নিজের আত্মমর্যাদাবোধ থেকে যদি এমন হয়ে থাকে তাহলে তা প্রশংসনীয়। কিন্তু যদি এসবের দ্বারা শুধুই গর্ব,

[illegible]

[illegible]

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

যখন তারা ধৈর্য্যধারণ করলো তখন আমি তাদের মধ্য থেকে এমন কিছু ইমাম বানালাম যারা আমার নির্দেশ মোতাবেক (লোকদের) পথ দেখাতো আর তারা ছিল আমার আয়াতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী। [সূরা সিজদাহ : ২৪]

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

যদি তোমরা সবর করো ও তাকওয়া অবলম্বণ করো তাহলে ওদের চক্রান্ত তোমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই তারা যা করে সব আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে। [সূরা আলে ইমরান : ১২০]

এরপর আল্লাহর সাহায্যে সকল দল বাইতুল মোকাদ্দাস ও তার আশপাশের এলাকা বিজয়ের প্রতি মনোনিবেশ করবে। তেমনিভাবে বোখারা, সমরকন্দ ও স্পেনসহ মুসলমানদের সকল ভূমি পুণরুদ্ধারে মনোনিবেশ করবে। এরপর আমরা পুরো বিশ্বকে এবং বিশ্ব মানবতাকে কুফর ও জুলুমের থাবা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আরও অগ্রসর হবো। আল্লাহর জন্য এসব কিছু মোটেই কঠিন নয়। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ এমনই ইঙ্গিত করে।

## চতুর্থ অধ্যায়

## খুবই জটিল কিছু সমস্যা ও বাধা, যার সম্মুখীন আমরা হবো এবং সেগুলো থেকে উত্তরণের উপায়

এ অধ্যায়ে আমি খুবই বেশ জটিল কিছু সমস্যা ও বাধা সম্পর্কে আলোচনা করবো যেগুলোর সম্মুখীন আমরা হবো। তবে আমরা যদি পূর্বের অধ্যায়ে আলোচিত নীতিমালা ও মৌলিক বিষয়গুলো অনুসরণ করি তাহলে দেখা যাবে আল্লাহর ইচ্ছায় অধিকাংশ সমস্যা ও বাধা নিজে নিজেই সমাধান হয়ে যাবে। আমাদের শুধু করনীয় হলো, সেগুলো সমাধানে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। তবে কর্মপরিকল্পনায় এমন কোনো পরিবর্তন আনা যাবে না যার ফলে পূর্বে আলোচিত নীতিমালায় আঘাত আসে [বা ব্যত্যয় ঘটে]।

১ম সমস্যাঃ

সত্যিকার মুমিনদের **(**মুজাহিদদের**)** সংখ্যা ক্রমশ কমে যাওয়া

বিগত শতাব্দির সত্তরের দশকে আফগান জিহাদের শুরুর দিকে জিহাদের উপর দিয়ে বেশ কিছু কঠিন মুহূর্ত অতিবাহিত হয়েছিল। মুজাহিদদের লক্ষ্য করে অনেকগুলো হামলা পরিচালনা করা হয়েছিল, যার ফলে -এক বর্ণনামতে- একটা পর্যায়ে মাত্র ত্রিশ জন মুজাহিদ বাকি ছিল। কিন্তু সরকারের মোকাবেলায় এবং তারও পরে রুশ বাহিনীর মোকাবেলায় এক দশকের বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর দেখা গেল সেই জিহাদে দেড় মিলিয়ন শহীদ হয়েছে। অবশ্য তাদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ ছিল সাধারণ মুসলিম জনগণ, যারা বোমা হামলায় নিহত হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হলো, এত লোক কোত্থেকে এলো? এর উত্তর হল, এটা ঘটেছিল জনতাকে যুদ্ধে টেনে আনার মাধ্যেমে এবং তাদেরকে সেনাবাহিনীতে পরিণত করার মাধ্যেমে।

বিশেষ করে আমরা যখন লড়াইয়ের মাধ্যেমে আমাদের অধিকারে আসা অঞ্চলগুলোকে বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য মুক্ত করতে পারবো এবং বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজন সেই অঞ্চলগুলোতে হিজরত করে আসবে, তখন এসব এলাকায় আমরা দাওয়াহ, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে পারি, অতঃপর তরবিয়তের মাধ্যমে আদর্শ ফলাফল লাভ করতে পারি। যে তরবিয়ত মূলত যুদ্ধপরিস্থিতি ছাড়া পরিপূর্ণ হয় না। যুদ্ধপরিস্থিতির মধ্য দিয়েই লোকেরা যোগ্য হয়ে উঠবে বরং যোগ্যতায় তারা তাদের উস্তাদদেরকেও ছাড়িয়ে যাবে।

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আল হারাকাতুল ইসলামিয়াহ’ তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো যে, তারা আফগান প্রেসিডেন্ট দাউদের সাথে স্বশস্ত্র মোকাবেলা করবে। বরকতময় এ জিহাদের বদৌলতে পরবর্তীতে তারা এমনই এক উচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল, প্রথম দিকে যা কল্পনা করে স্বস্তিবোধ করার মতো পর্যায়েও ছিল না।

শাইখ আরও বলেন, ‘সে সময়ে ইঞ্জিনিয়ার হাবিবুর রহমান শহীদ -যিনি সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন- কাগজে একটি ক্লাসিনকোভের চিত্র এঁকে গোপন এক প্রকোষ্ঠে তা ব্যাখ্যা করছিলেন এবং জিহাদের মহব্বতের উপর কয়েকজনকে তরবিয়ত করছিলেন, তখনকার সেই পরিস্থিতি আর বর্তমান পরিস্থিতির মাঝে বিস্তর পার্থক্য। বর্তমানে বাচ্চারা পর্যন্ত ট্যাংক বিধ্বংসী আর, পি, জি নিয়ে খেলা করে’।

২য় সমস্যা:

ব্যবস্থাপনা কর্মে নিয়োজিত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের স্বল্পতা

পূর্বের সমস্যার সাথে আরেকটি সমস্যাও যুক্ত হবে। আর তা হল, নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার শুরুর দিকে অধিক সংখ্যক অভিজ্ঞ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের চাহিদা দেখা দিবে। যদিও সাংগঠনিক বিভিন্ন গ্রুপকে ব্যবস্থাপনা করার মতো পুর্ব অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে, কিন্তু আমরা যখন নৈরাজ্যপূর্ন অঞ্চলগুলোতে যাবো, তখন তাৎক্ষণিকভাবে এসব অঞ্চলকে সেখানকার অধিবাসীসহ ব্যবস্থাপনা করার জন্য পর্যাপ্ত প্রশাসনিক লোকবল থাকবে না।

নৈরাজ্যপূর্ন অঞ্চলগুলোর ব্যবস্থাপনা করা উচিত আমাদের এবং সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের মাধ্যমে। এমনকি একটি মৌলিক সংশয় যা যুবকদের মাথায় প্রতিনিয়ত ঘুরপাক খায় সেটি আলোচনাকালে উপরোক্ত বিষয়টির অধিকাংশ দিক আমরা স্পষ্ট করবো।

[প্রশাসনিক কাজগুলো আমরা কিভাবে আঞ্জাম দিবো]

আমরা এমন একটা পরিস্থিতিতে ছিলাম যা নিরাশা এবং সংশয়ের জন্ম দিয়েছিল, যার দরুন শান্তিকামিতা এবং ফিতনা-পরীক্ষা এড়ানোর মানসিকতা তৈরি হয়েছিল –আমিও নিজেকে পবিত্র বলছি না, তবে আল্লাহ তা’আলার কাছে দৃঢ়তা প্রার্থনা করি-। তখন এক ভাই আমাকে বলেছিল, এই পন্থা আমাদেরকে আমাদের লক্ষ্য পর্যন্ত নিয়ে যাবে না। ধরুন আমরা আজ মুরতাদ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করলাম, তবে কে কৃষি, বাণিজ্য, অর্থনীতি ইত্যাদি মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব নিবে? উত্তরে আমি স্বাভাবিকভাবে বলেছিলাম, কেন?! আবু সুফিয়ান, ইকরামা... ...। আমি কি বুঝালাম সে তা বুঝতে পারেনি। সে নিজের মত করে চিন্তা করুক এজন্য বিষয়টি তার উপর ছেড়ে দিলাম। সম্ভবত তখন আমার উত্তরটি অপূর্ণাঙ্গ ছিল। পূর্ণাঙ্গ উত্তর হল, তার প্রশ্ন এবং সন্দেহের মূলে থাকা ধারণাটি হল, ‘জিহাদ হল একটি হঠাৎ আঘাত’। মূলত জিহাদ সম্পর্কে জ্ঞানের ঘাটতি থেকেই এমন ধারণা তৈরি হয়। কখনো আবার যেসব কারণে সে জিহাদে এসেছে সেই কারণগুলোই ধোয়াসাচ্ছন্ন থাকে। আমরা আল্লাহ তা’আলার কাছে আমাদের সকলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং যে কোনো বিপদাপদ থেকে মুক্তি চাই।

মূলত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহ, খুলি আর রক্ত ঝরানো দীর্ঘ সফরের মধ্য দিয়েই নেতৃত্ব তৈরি হয়। দ্বিতীয়ত, এটা পূর্বশর্ত নয় যে, একটি জিহাদি তানজিমকে কৃষি, বাণিজ্য এবং শিল্প পরিচালনার জন্য প্রথমেই বিশেষজ্ঞ টিম তৈরি করতে হবে। এমন বহু ঘটনা দেখা যায় যেখানে বিভিন্ন আন্দোলন এবং দল রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করার পর তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে। অতঃপর বিভিন্ন

মন্ত্রনালয়ের ব্যবস্থাপনার জন্য এবং রাষ্ট্রের সাধারণ পলিসির সাথে মিল রেখে প্রত্যেক মন্ত্রনালয়ের সাধারণ পলিসি ঠিক করার জন্য তারা দল বা আন্দোলনের মধ্য থেকেই মন্ত্রীদের নিয়োগ দেয়। আর প্রত্যেক মন্ত্রনালয়ে প্রযুক্তিগত বিষয়গুলো যে দেখবে সে হতে পারে একজন বেতন ভুক্ত লোক, যার পলিসির সাথে কোনো সম্পর্ক থাকবে না এবং সে ওই দলের বা আন্দোলনের সাথেও যুক্ত থাকবে না। এর ভুড়িভুড়ি উদাহরণ রয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে কথা দীর্ঘ হবে।

[একটি সুন্দর সমাধান - নিয়ন্ত্রনাধীন এলাকার জনগণের সাথে মিলিত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম]

বরং আরও গুরুত্বপূর্ণ হল সমস্যাটির এর চেয়েও সুন্দর সমাধান রয়েছে। তা হল, আমরা আমাদের নিয়ন্ত্রনাধীন এলাকার জনতার [জনগণের] সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবো এবং তাদের মধ্য থেকেই কিছু লোককে বেতন-ভাতার বিনিময়ে কিছু বিষয়ের ব্যবস্থাপনার জন্য নিয়োগ দিবো। একই সময়ে তারা তাদের পাশে আমাদের স্বেচ্ছাসেবী এমন মুজাহিদীনদের পাবে যারা কোনো বিনিময় ছাড়াই কাজ করছে। ফলে আবশ্যকীয়ভাবে তারা আমাদের মাঝে ধৈর্য, দুনিয়া বিমুখতা, আত্মত্যাগ এবং মজলুমের প্রতি ইনসাফ ও সুবিচারের এক অনন্য দৃষ্টান্ত দেখতে পাবে। বস্তুত আমাদের সমাজে নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর সংখ্যাই বেশি। পূর্বের জুলুম ও মানুষের হক ফিরিয়ে দেয়ার জন্য বিভিন্ন আলোচনা সভা কায়েম করতে হবে। সেখানে আমাদেরই উপস্থিতিতে নিপীড়িত ব্যক্তি প্রমাণ নিয়ে আসবে, অতঃপর আমরা তার হক নিয়ে দিবো অথবা জালিম ও মজলুমের মধ্যে কোনো সমাধান করে দিবো। আমরা মাজলুম ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়ার প্রতিও উৎসাহিত করবো, তবে ন্যায্য পাওনা আদায় করে নেয়ার পূর্ণ অধিকারও তার থাকবে। আমরা লোকদের মাঝে পারস্পরিক মিল-মহব্বত তৈরির জন্য কাজ করবো। দূর্বল ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠী-যাদের সংখ্যা সমাজে বেশি- তাদের পক্ষ থেকে জুলুম-অত্যাচার প্রতিহত করবো। আমরা তাদেরকে বলবো, ‘আমাদের জান আপনাদের জন্য উৎসর্গ, কারণ আপনারা হলেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত। প্রভাব ও ইনসাফ বজায় রেখে লোকদের সাথে আমরা অত্যন্ত বিনয়ী থাকবো। অবশ্য কিছু সমস্যা ও জটিল পরিস্থিতি আমাদের মোকাবেলা করতে হবে, যেগুলো শত্রু ও মুনাফিকরা উস্কে দিবে। কিন্তু ওই পরিস্থিতিতে বিস্ময়কর অনেক কিছুই দেখতে পাবে। যখন ঈমানের হাওয়া প্রবাহিত হবে তখন বিস্ময়কর নানান বিষয় সামনে আসবে। লোকজন যখন সাহসিকতা, ইয়াক্বিন, মহত্ব, আমানতদারি- এসব চমৎকার গুণাবলী দেখতে পাবে, যখন স্বেচ্ছাশ্রমের মানসিকতা, আখেরাতে পাওয়ার আশা, হৃদয়ের বিশালতার পাশাপাশি চেহারায় বিনয় এবং উন্নত মানসিকতা ও উঁচু হিম্মত দেখতে পাবে, তখন এসবের সাথে আসা বিভীষিকা লোকজনের দৃষ্টিতে কিছুই মনে হবে না। আল্লাহর শপথ! তোমরা দেখবে কাছের ও দূরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যুবক ও প্রাপ্ত বয়স্করা দলে দলে মুজাহিদীনের বিভিন্ন গ্রুপে এসে যোগ দিচ্ছে, বাইয়াহ দিতে ও তওবা করতে। এছাড়াও আরও বিভিন্ন কিছু ঘটতে দেখবে।

আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে, কীভাবে আমরা বিভিন্ন শ্রেণির লোকদের সাথে বসবাস করবো। যদি তারা আমাদের কাছে ‘যাতুল আনওয়াত’ এর মতো কিছু চায় তখন আমাদের করণীয় কী হবে। তারা কোনো বিদআত বা হারাম কাজে লিপ্ত হলে তখন করণীয় কী, উদাহরণত, কেউ মদ পান করলো। এসব অপরাধের ক্ষেত্রে আমরা তাদের শাস্তি কখন কার্যকর করবো এবং কী পরিমাণে করবো? কখন আমরা তাদের সাথে মহব্বত জুড়ে রাখবো এবং কী পরিমাণে রাখবো?

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘যুদ্ধ যা ইসলামী আন্দোলনের সন্তানদের [সদস্যদের] দলিত করে ছিন্নভিন্ন করে, সেই যুদ্ধই আবার তাদেরকে জাতির বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সাথে একত্রে বসবাস করতে বাধ্য করে,

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

‘তাদের কেউ তো নিজের প্রতি অবিচার করে চলেছে, কেউ বা আবার মধ্যপন্থী, আবার কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে, এটাই হচ্ছে মহা অনুগ্রহ। [সুরা ফাতির: ৩২]

[যোগ্য নেতৃত্ব এভাবেই তৈরি হয়]

... সমাজে রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ, -অতিরঞ্জনকারী, শিথিলতাকারী, ভুলে পতিত, পদস্খলিত, সত্যবাদী, দৃঢ় প্রত্যয়ী। এই সকল শ্রেণির সাথে একই ঘাঁটিতে থেকে, একই ছাদের নিচে, একই দস্তরখানে, একটি দেহের মত একই আন্দোলনের সদস্য হয়ে ধারাবাহিক দশটি বছর যখন শত্রুর মোকাবেলা করে, তখন তাদের সাথে কাটানো এই বাধ্য জীবনে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মানোন্নয়ন ঘটাতে গিয়ে এবং বিসদৃশ শ্রেণিগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য আনতে গিয়ে যে তিক্ত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয় এর ফলে মুজাহিদদের নানান অভিজ্ঞতা, দুরদর্শিতা ও দক্ষতা অর্জিত হয়।

পক্ষান্তরে মুসলিম বিশ্বের বহু প্রান্তে বহু ইসলামী দাওয়াত রয়েছে যারা সমাজের বিশেষ কিছু পর্যায়ে ঝামেলামুক্ত পরিবেশে কালযাপন করে। বিভিন্ন মাহফিল, সভা, সেমিনার, খুতবা ছাড়া সমাজের সকল শ্রেণির মুসলমানদের সাথে তাদের কোনো সাক্ষাত হয় না। সুতরাং জিহাদী তানজিমের নেতৃবর্গ সমাজের সকল স্তরের সাথে বাধ্য হয়েই জড়িয়ে থাকার কারণে ধারাবাহিকভাবে তারা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে।

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. বলেন, ‘জিহাদী তানজিমের প্রত্যেক নেতার দায়িত্ব হলো, সামাজিক সমস্যাগুলো এবং যেসব রুক্ষ্ণ সমস্যাগুলো সমাজকে কামড়ে আছে সেগুলোর সমাধান খুঁজে বের করা। এতিম ও বিধবাদের সমস্যাগুলো এবং সমাজের যেসব ক্ষতের রক্তক্ষরণ থামানো যাচ্ছে না ওগুলোর সমাধান আবিস্কার করা। শত-সহস্র শিশু যারা পড়তে পারছে না, তাদেরকে এই অবস্থা থেকে বের করে আনার উপায়ও খুঁজে বের করতে হবে। ফলে অবশ্যই কিছু স্কুল খুলতে হবে, যদিও তা হয় পর্বতের গুহায় বা গাছের নিচে। তাদের প্রত্যেকের অধীনেই যেন একেকটা স্বাধীন সরকার। সে-ই হল প্রধানমন্ত্রী, একই সাথে সে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা, সমাজকল্যাণ, কৃষি, গণমাধ্যম ও ধর্মমন্ত্রী। বস্তুত মৃত্যুর চোয়ালের মাঝে কালযাপন করার মাধ্যমেই তারা রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

যখন কোনো সেনাসদস্য বিপ্লবী সামরিক রাষ্ট্রে প্রথম বিবৃতি দিয়েই ক্ষমতায় এসে যায় -পূর্বে যার শাসন করার কোনও অভিজ্ঞতা নেই, ইসলামিক কোনও নিদর্শন যার মধ্যে নেই, কোনও আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকার ব্যাকগ্রাউন্ড নেই, উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিমত্তা নেই এবং মানুষের মন জয় করার মত নৈতিকতা নেই- সুতরাং এমন সেনাসদস্য পারলে আমাদের নেতারা পারবে না কেন?!!

এক পশ্চিমা সাংবাদিক নব্বইয়ের দশকে কিছু তরুণ আফগান নেতার সাথে সাক্ষাতের পর বলেছিল, ‘আমি তাদেরকে কিছু অদক্ষ, মূর্খ এবং অস্থির চিত্তের যুবক মনে করতাম, যারা শুধু হত্যা করতেই পছন্দ করে, এর বাইরে কিছুই বুঝে না। কিন্তু আমি যখন তাদের সাথে বসলাম ধাক্কা খেলাম, তাদের একেকজনের বয়স চব্বিশও পেরুবে না, অথচ তাদের ভাব-গাম্ভীর্য এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আমেরিকান কংগ্রেসের এক একজন জ্যেষ্ঠ্য সদস্যের চাইতেও ঢেঁর বেশি মনে হয়েছে (!) ’।

৩য় সমস্যা:

ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সদস্যদের পূর্ব সম্পর্ক, বিশেষকরে ভিন্ন ধারার ইসলামী দলগুলোর সাথে থাকা পূর্ব সম্পর্ক

যখন গোলযোগ পরিস্থিতি তৈরি হবে এবং জিহাদ ভয়াবহরূপ ধারণ করবে আর প্রশাসনিক শূন্যতা তৈরি হবে, তখন আমরা দেখবো কিছু দল এবং ইসলামিক বা অনৈসলামিক গ্রুপ এই ঘটনা তরঙ্গে চড়ে বসার চেষ্টা করবে এবং পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে। এক্ষেত্রে দুইটি সম্ভাবনা আছে,

প্রথম সম্ভাবনাঃ এরা কিছু এলাকার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিবে। সেসব এলাকার সাথে কোন্ ধরণের নীতিমালার আলোকে বোঝাপড়া হবে সেগুলো আমরা ইতিপূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। বিশেষকরে ওইসব নীতিমালা যেগুলো শত্রুর রাজনৈতিক কৌশল বুঝার সাথে সংশ্লিষ্ট, তেমনিভাবে মেরুকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট।

দ্বিতীয় সম্ভাবনাঃ আলোচ্য সমস্যাটির ক্ষেত্রেই যে সম্ভাবনাটি আমাদের সামনে আসবে- যখন আমরা কোনো অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা করতে থাকবো এবং প্রশাসনিক কাজে বা জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য ও আমাদের প্রশাসনের প্রতি আনুগত্য প্রদানের জন্য এমন কিছু ব্যক্তিকে বশীভূত করবো যারা পূর্বে অন্য কোনো ইসলামী দল বা গোষ্ঠীর সদস্য ছিল, সেক্ষেত্রে প্রথম কথা হলো, মানুষের অন্তর যাচাই করা আমাদের দায়িত্ব নয়। যারা আমাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে আমরা পরিপূর্ণভাবেই তা গ্রহণ করে নিবো। তবে যদি তার কথা বা কাজে প্রকাশ পায় যে, পূর্বের তানজিমের সাথে তার সম্পর্ক বজায় রয়েছে অথবা ওই দলের কোন ধ্যান-ধারণা বা অবস্থান নিজের মাঝে আঁকড়ে আছে, তাহলে এই অবস্থায় আমাদের একটু ভাবতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি ইখওয়ান বা মুরজিয়া ধারার কোন দলের নেতৃবৃন্দের সাথে তার যোগাযোগ উন্মোচিত হয়, তখন আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করবো, শিরকী পার্লামেন্টে অংশগ্রহণের বিষয়ে তারা যে বিশ্বাস রাখে তুমিও কি একই বিশ্বাস রাখ, বা তুমি কি ‘কুফর বিত তাগূত’ [তাগুতকে অস্বীকৃতি জানানো]‘র বিষয়টি প্রত্যাখ্যান কর? যদি সে বলে, হ্যাঁ, অথবা যদি এমন হয় যে, ওইসব দলের প্রতি তার আনুগত্যের বিষয়টি সে প্রকাশ না করে, কিন্তু যখন আমাদের চারপাশে থাকা মুরতাদ বাহিনী মুজাহিদ ভাইদেরকে কোয়ালিশন গঠনের আমন্ত্রণ জানায়, অথবা গণভোট বা নির্বাচনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানায়, তখন মুজাহিদ ভাইদের সাথে সে এ বিষয়গুলো নিয়ে বাকবিতন্ডায় জড়ায় তাহলে এবিষয়গুলো আমাদের সারি থেকে তাকে বহিষ্কার করার কারণ হতে পারে। যদিও বুঝার ভুলের কারণে তার বিরুদ্ধে আমরা শরীয়তের বিধান কার্যকর করতে পারছি না, কিন্তু আমরা আমাদের সারিতে এরকম লোকদের রাখবো না। বরং সে যা ছড়াচ্ছে এর ঝুঁকি বিবেচনা করে শরীয়ত সম্মত সকল উপায়ে প্রকাশ্যে এই মত প্রকাশ করা থেকে এবং গোলযোগপূর্ণ পরিবেশে তা ছড়ানো থেকে তাকে বিরত রাখতে হবে।

এই সমস্যাটির অনুরূপ একটি সমস্যার ব্যাপারে বিদগ্ধ শাইখ ওমর মাহমুদ আবু ওমর (আল্লাহ তা’আলা তাঁকে তাগুতের বন্দীশালা থেকে মুক্ত করুন) বলেন, ‘যখন কোনো অঞ্চলে জিহাদ ভয়াবহরূপ ধারণ করে তখন জিহাদী তানজিম যে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় তা হল, সে সময়ে বিভিন্ন ঘাঁটিতে জিহাদের আওয়াজ উঁচু হতে থাকে, বিশেষকরে তাদের মধ্যে যাদের সৃষ্টিগত স্বভাব এখনো পুরোপুরি দুষিত হয়ে যায়নি। ফলে তারা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু জটিলতা দেখা দেয় ওই লোকদের ক্ষেত্রে যারা জিহাদী তানজিমের সাথে থেকেও ময়দানের বাইরে থাকা মাশায়েখদের ফতোয়া ও দিকনির্দেশনার দিকে তাকিয়ে থাকে। এ শ্রেণির যুবকরা খুবই বিপজ্জনক। যে কোনো পরিস্থিতিতে এরা যে কোনো তানজিমের কাছে মুজাহিদীনের শক্তি ও ভাবমূর্তি খর্ব করেন। (মাকালাত বাইনাল মানহাজাইন)

অবশ্য শাইখ আরও উল্লেখ করেন- তবে যারা কঠোর পরীক্ষা ও কষ্টের পরিস্থিতিতে জিহাদী তানজিমে আসে অধিকাংশ সময় তাদের নিয়ে ভয় নেই। এমনকি যারা ফিতনা ও পরীক্ষার সময়ে বিভিন্ন বিদআতী গ্রুপ থেকে এসে তোমাদের সাথে জিহাদে শরীক হয় তাদের নিয়েও

ভয় নেই। কেননা ফিতনা ও পরীক্ষার মুহূর্তে সেই কঠিন ব্রিজ [সাঁকো ] পার হওয়া বড়ই মুশকিল। তাই তখন পূর্বোল্লিখিত গ্রুপগুলো এই পরীক্ষার সময় তোমাদের সাথে জুড়তে আসবে না। কিন্তু আশংকা হলো তখন যখন জিহাদ চতুর্দিকে সরগরম থাকে এবং এর পক্ষে ব্যাপকভাবে জনসমর্থন থাকে , তখন ঐসব তানজিমের মাশায়েখরা তাদের সদস্যদের জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি দিতে পারে এবং তাদের ব্যাপারে চুপচাপ থেকে মৌন সম্মতি জানাতে পারে। আর ঠিক তখনই এই সমস্যা দেখা দিতে পারে যা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। (মাকালাত বাইনাল মানহাজাইন ’ এর ‘কামেলুল মাকালা ’ অংশ, পৃষ্ঠা ৯৫ )

৪র্থ সমস্যা :

অনুপ্রবেশ ও গুপ্তচরবৃত্তি

আমাদের প্রতি আল্লাহর একটি অনুগ্রহ হলো , দীর্ঘ পরিসরে আমাদের এই চলমান আন্দোলন ও তাতে ঘটে যাওয়া বিভীষিকাময় নানান পরিস্থিতি শুরু প্রায় শুরুতেই আমাদের সামনে উন্মোচিত করে দেয় যে , আমাদের মাঝে গুপ্তচর ও এজেন্ট হিসেবে কারা কাজ করছে। পক্ষান্তরে যে সব আন্দোলন কঠিন পরিস্থিতি , পরীক্ষা , যুদ্ধ এবং রক্তপাতের মুখোমুখি হয় না তাদের মাঝে অনুপ্রবেশকারীরা দীর্ঘ অনেক বছর পর্যন্ত অপ্রকাশিত থেকে যেতে পারে। এমনকি সবার অগোচরে সে এসব সংগঠণের প্রথম সারির পজিশনগুলোতেও উঠে আসতে পারে। কিন্তু তাওহীদ ও জিহাদ ভিত্তিক তানজিমের বিষয়টা হল , আপনি কি এমন কোনো অনুপ্রবেশকারী দেখাতে পারবেন যে সশস্ত্র অপারেশনে অংশগ্রহণ করতে এবং নিজেকে মৃত্যর সামনে পেশ করতে আগ্রহী হবে ? অথচ জিহাদী তানজিমে উপরে উঠে আসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হল মৃত্যর সামনে নিজেকে পেশ করা।

এরপরও তানজিম যখন সম্প্রসারিত হয় বিশেষকরে আমরা যখন আমাদের ব্যবস্থাপনাধীন নৈরাজ্যপূর্ন এলাকার লোকদের সাথে মিশতে শুরু করি , তখন আমাদের মাঝে গোয়েন্দা ঢুকতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষের সাথে যদি আমাদের সুসম্পর্ক বজায় থাকে তবে তাদের মধ্য হতে আমাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করার মত লোক তৈরি হওয়া দুষ্কর হবে। বরং জনসাধারণই তখন আমাদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করবে এবং তারাই সেসব গুপ্তচর থেকে আমাদের জন্য রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে। তাছাড়া পূর্বে আমরা যা উল্লেখ করেছি সেটাতো আছেই। অর্থাৎ অত্যন্ত নৈপুন্যের সাথে গোয়েন্দা ছড়িয়ে দেয়া এবং শত্রুর মাঝে নিজেদের চর ঢুকিয়ে দেয়া। এর ফলে শুরু শুরুতেই আমাদের মাঝে থাকা শত্রুপক্ষের গোয়েন্দাদের চিহ্নিত করা সহজ হবে , বিশেষকরে শত্রুর নিরাপত্তা বিভাগে যদি আমাদের গোয়েন্দারা অনুপ্রবেশ করতে পারে।

একইসাথে, আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখলে , তাদের পক্ষে গোয়েন্দাগীরি করলে দুনিয়া ও আখিরাতে কী ধরণের শাস্তি হতে পারে এবং আল্লাহ , রাসূল ও মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব রাখলে কী সওয়াব লাভ হতে পারে - গণসচেতনতামূলক প্রচার চালিয়ে লোকদের মাঝে এসব বিষয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

মুজাহিদরা নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে সব রিপোর্ট সাধারণত প্রকাশ করে থাকে তাতে গোয়েন্দাদের চিহ্নিত করার নিয়মাবলী থাকে।

তবে যে বিষয়টি আমরা গুরুত্বের সাথে বলতে চাই তা হলো - গুপ্তচরের ক্ষেত্রে আমরা পূর্বে উল্লেখিত ত্রাসের [দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ভয়ের ] নীতি অবলম্বণ করি। যার ব্যাপারে গুপ্তচর হবার বিষয়টি প্রমাণিত হবে তার বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে করে এটা দেখে অন্যরা এই কাজ থেকে বিরত থাকে। যদি সে পালিয়ে যায় তবে তাকে অনুসরণ চালিয়ে যেতে হবে এবং তাকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না , যদিও এতে বছরের পর বছর কেটে যায়। এটা ঘোষনা করা জরুরি যে দীর্ঘ সময় পরে হলেও সে শাস্তি পাবে। এতে করে দূর্বল চিত্তের লোকেরা তার মত করতে শতবার ভাববে।

এছাড়া আমাদের প্রায়ই বিবৃতি দেয়া উচিত -বিশেষকরে গুপ্তচর চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদানের পর- যে, যারা বিশেষ কোনো চাপের মুখে বা যে কোনো পদস্খলনের শিকার হয়ে শত্রুর সাথে মিলে এ কাজ করে যাচ্ছে তারা যদি স্বেচ্ছায় অপরাধ স্বীকার করে নেয়, তাদের তওবা গ্রহণ করার সুযোগ এখনও আছে। পাশাপাশি এ স্বীকারোক্তির বিষয়টি ছড়িয়েও দিতে হবে, যাতে করে শত্রুর কাছে খবরটি কোনো উপায়ে পৌঁছে যায়। এমনকি বাস্তবে এমন ঘটনা না ঘটলেও ছড়ানো যেতে পারে। তাহলে শত্রু এবং তার গুপ্তচর সকলেই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাবে। কারণ তখন শত্রু নিজেই তার গোয়েন্দাদের ব্যাপারে সন্দিহান থাকবে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যার ব্যাপারে মুসলিমদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ নিঃসন্দেহে প্রমানিত হয়েছে তার ক্ষেত্রে ত্রাস এবং রুক্ষতার (coarseness) নীতি অনুসরণকে এবং তাকে ক্ষমা না করার বিষয়টিকে মুজাহিদদের প্রতি ভালোবাসা রাখে এমন কিছু কিছু নতুন মুজাহিদ –যাদের এখনও ময়দানের জিহাদের অভিজ্ঞতা নেই- অপছন্দ করতে পারে। তারা এ যুক্তি দেখাতে পারে যে, আমাদের উচিত কুফরের লিডারদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা। বাহিনীতে থাকা শত্রুর অদক্ষ কিছু নিম্নস্তরের সেনা, তথ্য সরবরাহকারী ও গাইডদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রচেষ্টা নষ্ট করা উচিত না, এ বিষয়ে আমি ইতিপূর্বে কিছু পড়েছিও।

একদিক থেকে তাদের কথা সঠিক হলেও অন্যান্য আরো কিছু দিক তাদের ছুটে গেছে। বাহিনীর নিম্নস্তরের সেনাদের ব্যাপারে নিজেদের প্রচেষ্টা বিনষ্ট না করার বিষয়টি ঠিক আছে, তবে এটা যদি হয় কোনো কৌশলগত কারণে এবং সরাসরি ক্ষতির শিকার না হয়ে। কিন্তু তথ্য সরবরাহকারী ও গাইডদের টার্গেট করার বিষয়টি এর আওতাভূক্ত হবে না। কারণ, শত্রুর গোয়েন্দা বিভাগ ও সেনা কর্মকর্তারা ও বড় বড় নেতারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কিংবা সম্পাদনের ক্ষেত্রে এসব নিচু সারির সেনা, পুলিশ ও তথ্য সরবরাহকারীদের ছাড়া চলতে পারে না। তারা এসব তথ্য সরবরাহকারী ও গাইড ছাড়া কোনো একটি বিষয়েও অনুসন্ধান করতে বা কোনো এলাকায় রেইড দিতে বা গ্রেফতার অভিযান চালাতে অথবা কোনো একটা আক্রমণ পরিচালনা করতে পারে না। একারণে এসব নিচু সারির সেনাদের সম্পূর্ণ নির্মূল করা গেলে শত্রুর পুলিশ বা সেনা অফিসার একেবারে অচল হয়ে পড়ে। এমনকি চরম রুক্ষতার সাথে ও কুৎসিতভাবে এদের নির্মূল করলে অন্যরা আমাদের বিরুদ্ধে এ ধরণের কাজের চিন্তা করা থেকেও বিরত থাকবে। পাশাপাশি বিষয়টিকে ছড়ানোর জন্য এবং এর যৌক্তিকতা জনসাধারণের নিকট পৌঁছানোর জন্য মিডিয়া কভারেজ থাকাও জরুরি। কখনো আবার শুধু যৌক্তিকতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই মিডিয়া কভারেজ থাকতে হবে, যেমনটি আমরা পূর্বে মিডিয়া সংক্রান্ত আলোচনায় উল্লেখ করেছি। আর এটা তখনই করা হবে যখন আমরা এ ঘটনার দায় স্বীকার করবো।

[শত্রুর বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে গ্রেফতার হলে করণীয়]

অনুপ্রবেশ এবং গুপ্তচরবৃত্তির সাথে আরও যে যে সমস্যাগুলো যুক্ত হয় সেগুলো থেকে একটি বিশেষ সমস্যা আমি এখানে উল্লেখ করবো, যেহেতু এটি গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া বেশিরভাগ সময় ‘তটস্থঃকরণ ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ’ পর্বে এই সমস্যাটি দেখা দেয়।

সমস্যাটি হল, যখন কোনো মুজাহিদ গ্রেফতার হয় -আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাই- (এ কিতাবের শেষে ১ম প্রবন্ধে আমৃত্যু লড়ে যাওয়ার এবং গ্রেফতার এড়ানোর যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব বিষয়ক আলোচনাটি আসবে) তখন অনেক সময় চাপ ও নির্যাতনের মুখে সে কথা বলতে বাধ্য হয়। কখনো সে জেরাকারীকে বিভ্রান্ত করার জন্য এমন কোনো ভাই বা বোনের নাম বলে দেয় যার জিহাদের সাথে আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। শয়তান বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে বিষয়টি তার মনে ফুটিয়ে তোলে। যেমন শয়তান বলে যে, এটি হল দুই মন্দের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম মন্দ। আর তদন্তকারীরা এদেরকে ধরলেও কোনো তথ্য পাবে না। অপরদিকে যারা মূলত টার্গেট তারা এই ফাঁকে সতর্ক হয়ে যাবে এবং নিজেদেরকে আড়াল করে নিবে। তাছাড়া তদন্তকারীরা যখন বাস্তব বিষয় জানতে পারবে তখন

তাদেরকে ছেড়ে দিবে। এছাড়াও জিহাদের সাথে সম্পর্কহীন এসব ভাইদের যদি গ্রেফতার করা হয় তবে তারা সরকারের অত্যাচার এবং কুফরের নজির দেখতে পাবে। তারা জেলখানায় বন্দী মুজাহিদ ভাইদের সাথে পরিচিত হতে পারবে এবং পরবর্তীতে বের হয়ে জিহাদের পথে চলে আসবে! এসবের কিছু কিছু হয়তোবা সত্যিই ঘটতে পারে, কিন্তু জিহাদের সাথে সম্পর্কহীন ভাইদের নাম বলার পিছনে এগুলো যুক্তি হতে পারে না। প্রথমতঃ সে একজন মুসলমানের উপর কষ্ট ও নির্যাতন চাপিয়ে দিয়েছে। এমনকি তা ঘটিয়েছে এমন ব্যক্তির উপর যার ঘটনার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। দ্বিতিয়তঃ কখনো ভাইটির কাছে গুরুত্বপূর্ণ বা গুরত্বহীন তথ্য থাকতে পারে, যা তদন্তকারীর জন্য যোগসূত্র হিসাবে কাজ করে। আর একারণেই তারা কোন এলাকায় যখন অভিযান চালায় তখন গণহারে যুবকদের গ্রেফতার করে। এমনও হতে পারে যে, ভাইটি মুজাহিদ ভাইদের কর্মের উপর ক্ষোভ বশত এমন কিছু বিষয় স্বেচ্ছায় ফাঁস করবে যেগুলো সে ঘটনাস্থলে আকস্মিকভাবে বুঝতে পেরেছিল, যা হয়তো ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হতে পারে। যেমন সে হয়তো কিছু মুজাহিদকে কোনো স্থানে বা কোনো বাসায় ঘন ঘন আসা যাওয়া করতে দেখেছে ইত্যাদি।

এ সব ভাই যখন মুক্তি না পায় তখন দেখা যায়, জিজ্ঞাসাবাদ কালে এবং জেলখানায় থাকাকালে তার জীবন তার জন্য এবং তার আশপাশের লোকদের জন্য খুবই কষ্টকর হয়ে উঠে। এ ধরণের ঘটনা এবং ট্রাজেডির সংখ্যা অনেক। অনেক সময় এসব ভাইরা জেলখানা থেকে বের হয়ে ওইসব মুজাহিদ ভাইদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা হিসাবে কাজ করে, যারা তার দুর্দশার জন্য কারণ ছিল। আর প্রায়ই তদন্তকারীরা জানে যে, জিহাদের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু তারপরও তারা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তাকে খাটায়, যার অনেকগুলোই এখানে আমরা উল্লেখ করেছি। বরং বেশিরভাগই এমন হয় যে, গ্রেফতার হওয়া মুজাহিদ ভাই তার প্রতিবেশি কোন কিছুর সাথে জড়িত-এ ধরণের কোন কথা বলেন না কিন্তু তারপরও ওই পিশাচ অসভ্য তদন্তকারীর দল ওই ভাইয়ের প্রতিবেশীকে গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়ে বলে যে, মুজাহিদ ভাইটি তার ব্যাপারে বিভিন্ন বিষয়ে স্বীকারোক্তি দিয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য থাকে মুজাহিদ ভাই এবং তার প্রতিবেশীর মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করা, তাছাড়া এর ফলে সম্ভাবনা আছে তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে এই ক্ষোভে এমন এমন তথ্য সে প্রকাশ করবে যা সে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকাশ করতো না।

এসব কারণে ভাইদের উচিত অবশ্যই এই পথ পরিহার করা। বিশেষ করে এর ফলে যেহেতু ওই লোকদের প্রতিই জুলুম করা হয় যাদেরকে কুফর ও জুলুমের বেড়াজাল থেকে উদ্ধারের জন্য আমরা জিহাদ করছি। বরং উচিত হল, একজন মুজাহিদ শুরুতেই গ্রেফতার এড়ানোর সর্বাত্বক চেষ্টা করবে। আমরণ লড়াই করবে, তবুও বন্দিত্ব বরণ করবে না। বরং তার উচিত অভিযান চালাতে আসা তাগুতদের জন্য অভিযানস্থলটাকে একটা কসাইখানায় পরিণত করা।

৫ম সমস্যা:

কিছু সদস্য বা কিছু গ্রুপ কিংবা সম্পূর্ণ একটি অঞ্চল আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে জিহাদী তানজিমকে পরিত্যাগ করা বা এর বিরুদ্ধে বিপ্লব করা। (আমরা কিভাবে বিষয়টি বুঝবো এবং তা মোকাবেলা করবো?)

পূর্বে নীতিমালা সংক্রান্ত অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে, কিছু নৈরাজ্যপূর্ন এলাকার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ গোত্রের হাতে অথবা পূর্বের সরকারের থেকে যাওয়া সশস্ত্র লোকদের হাতে আসতে পারে, যারা পূর্বের সরকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে অথবা একটা দলের কোন সংগঠনের হাতে আসতে পারে ইত্যাদি। যেহেতু তারা মুসলিম হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল তাই আমাদের আচরণ তাদের সাথে তাদেরকে মুসলিম ধরেই হবে। আমরা অবশ্যই তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবো এবং কিছু বিষয়ে জোর দিবো ও সেসব বিষয়গুলোর উপর গুরুত্বও বর্ণনা করবো। বিষয়গুলো হল, তারা যেন নিজেদের মধ্যে শরিয়াহ দিয়ে শাসন করে এবং আমাদের ‘ওয়ালা’ এর আওতায় চলে আসে। (অর্থাৎ আমাদের প্রতি আনুগত্য এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময় করে) এবং যেন একটা জোট গঠন করে বা জোট গঠনের প্রক্রিয়ায় থাকে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

[illegible]

অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যদানকারী মহাজ্ঞানী। [সূরা মায়েদা: ৫৪]

[আমাদের যা করণীয়]

(আমরা পক্ষ পরিবর্তন নিয়ে কথা বলছিলাম। অর্থাৎ কোনো প্রশাসন আমাদের আনুগত্য থেকে বের হয়ে স্বেচ্ছায় তাগুতের আইনে শাসন করতে থাকলে) ওই পরিস্থিতিতে আমরা যা করব তা হল, এই বিভিষিকাময় দুর্যোগকে আমরা নিজেদের ক্ষমতা ও শত্রুর ক্ষমতা যাচাই করে সে অনুপাতে মোকাবিলা করবো। প্রথম কথা হলো, এই যদি কোন অঞ্চলের তত্ত্ববধানে নিয়োজিত প্রশাসন মুরতাদ হয়ে গেছে যায়, তবে তাদের প্রভাব বলয়ে থাকা নিরীহ জনগণ স্বেচ্ছায় কোনো কুফরিতে লিপ্ত না হলে তারা মুসলিম বলেই বিবেচিত হবে। স্বেচ্ছায় কুফরি করার বিষয়টি পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে বুঝা যাবে। পূর্বেও উল্লেখ করেছি, সাধারণ জনগণের কুফরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিবেন প্রাজ্ঞ আলেমগণ। আর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতি আমরা আমাদের গোয়েন্দাদের মাধ্যমে জানতে পারবো, তেমনিভাবে এ অঞ্চলের এমন কোনো ব্যক্তির মাধ্যমেও জানতে পারবো যে গোপনে আমাদেরকে বাইয়াহ দিয়েছে।

মুরতাদ হয়ে যাওয়া এ অঞ্চলের প্রশাসনিক কাঠামো যদি শক্তিশালী হয় তবে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আমরা যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করবো। আর প্রশাসন যদি দূর্বল হয় তবে আমরা অবশ্যই কাউকে পাঠাবো, যে ওই শয়তান লিডারদেরকে [নেতাদেরকে] তাদের বিষয়টি গুরুতর হয়ে উঠার আগেই অপসারণ করবে। ফলে সহজেই ওই অঞ্চলের পতন ঘটবে এবং আমাদের জন্য সেখানে প্রবেশ করে ব্যবস্থাপনা করার সুযোগ তৈরি হবে।

আর ছোট ছোট শয়তান লিডারগুলোর [নেতাগুলোর] বিষয় গুরুতর হয়ে উঠার আগেই -বিশেষকরে আমরা যখন বিভিন্ন নৈরাজ্যপূর্ন অঞ্চলে ব্যবস্থাপনার জন্য পৌঁছাবো- তাদেরকে শায়েস্তা করার ব্যাপারে বিদগ্ধ শাইখ ওমর মাহমুদ আবু ওমর বলেন, ‘মুসলিম যুবকরা শুরুর দিকে একটা সস্তা দরের বুলেট দিয়েই লেবাননের ভ্রান্ত শাইখ আল-হাবাশীকে[21] শায়েস্তা করতে পারত। যদি তারা সেটা করে ফেলতো তাহলে আজ ঝামেলা চুকে যেত (যাকে বলে ‘চোখ লেগেই শেষ’)। কিন্তু হাবাশী ও তার মত শয়তানগুলোর গঠন আজ এত শক্ত হয়েছে এবং মনোবল এতই দৃঢ় হয়েছে যে, রীতিমত গবেষণা ও পড়াশোনা করে ওদেরকে শায়েস্তা করা হবে- এর চেয়েও ওরা আজ ঊর্ধ্বে। বর্তমান সময়ে সুন্নাহর অনুসারীরা এসব ভ্রান্তদের মোকাবিলার ক্ষেত্রে সুন্নাহ পদ্ধতি অনুসরণ করা থেকে অনেক দূরে। তারা এসব ভ্রান্তদের সেভাবে মোকাবিলা করে না যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম মোকাবিলা করতেন। এমন ভ্রষ্টগুলোকে ও বুড়ো শয়তানগুলোকে শুরু [একদম] শুরুতেই জবাই করে হত্যা করা উচিত, যখন তাদের খ্যাতি থাকে না, কেউ তাদের সম্পর্কে জানে না এবং কেউ তাদের কোনো খবর রাখে না। কিন্তু দুঃখজনক হলো, সুন্নাহর অনুসারীরা (বর্তমানে) তাদের অধিকাংশ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে মেকি কান্নার মাধ্যেমে এবং এসব বিষয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার তরিকায় আহাজারি করে, মনে হয় যেন তারা শিয়া সম্প্রদায়ের কোনো ‘কারবালা মাহফিলে’ শরিক হয়েছে।

উপরে যদিও হাবাশী ও তার অনুসারীদের নিয়ে গভীর আলোচনা করা হয়নি, তবে যা জরুরি তা হল, ক্ষণস্থায়ী ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে হলেও এদের মোকাবেলা করতে হবে। তবে উপরের আলোচনা আমাদের সামনে আহলুস সুন্নাহর সাথে সম্বন্ধযুক্ত তানজীম, দল ও গ্রুপগুলোর ভুলের গভীরতা প্রকাশ করে। যদি আমরা জামাল আব্দুন নাসের এবং ইখওয়ানুল মুসলিমীনকে দৃষ্টান্ত হিসাবে নিই তবে আমরা এতক্ষণ যা বলেছি তার জ্বলন্ত উদাহরণ দেখতে পাই। (যদি প্রশ্ন করা হয়) শুরুর দিকেই জামাল আব্দুন নাসেরকে শেষ করে দেয়া এবং তার বিষয়টি নিষ্পত্তি করে ফেলার জন্য কিসের প্রয়োজন ছিল? উত্তর হল, তেমন কিছুরই প্রয়োজন ছিল না।

আমরা যদি ইয়েমেনের বর্তমান শাসক আলী আব্দুল্লাহ সালেহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি এবং সংবিধানের ওপর ভোট দেয়া সংক্রান্ত গণবিক্ষোভ চলাকালে তাকে শেষ করে দেয়ার যে সক্ষমতা সেখানকার ইসলামী আন্দোলনের ছিল তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি... (তাহলে পরিষ্কার উত্তর আসবে তখন বিষয়টি খুবই সহজ ছিল) তখন যদি তাকে শেষ করে দেয়া হতো একজনও তার জন্য কাঁদতো না, কেউ তাকে স্মরণও করতো না। কিন্তু এখন তার ভিত পাকাপোক্ত হয়ে উঠছে এবং সামনের দিনগুলোতে সে ইয়েমেনের ইসলামী আন্দোলনকে [মূল খাবারের আগে নিতান্ত] ক্ষুধাবর্ধক ও রুচিবর্ধক খাবারে পরিণত করবে। এ জাতীয় ভুড়িভুড়ি উদাহরণ রয়েছে। এসব উদাহরণ থেকে বুঝা যায়, আহলুস সুন্নাহ (বলে যারা দাবীদার তারা মূলত) রক্তপাতের ব্যাপারে ভীত, আর ভীত হওয়ার কারণেই হিকমত ও মাসলাহাতের দোহাই দিয়ে রক্তপাত থেকে বিরত থাকে। কিন্তু কিছুদিন পরই তারা এর চড়া মূল্য পরিশোধ করবে। যে পরিমাণ শংকিত হয়েছে আর রক্তপাত এড়িয়ে চলেছে এরচেয়ে বহুগুণ বেশি মূল্য তাদেরকে পরিশোধ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আবু বকর রাযি.র প্রতি সন্তুষ্ট হোন; তিনি মুরতাদদের হত্যা করার জন্য ও তাদের মূলোৎপাটনের জন্য ব্যাপকভাবে সাহাবাদেরকে যুদ্ধের প্রতি আহবান করেছিলেন তাদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত হওয়ার আগেই এবং তারা প্রস্তুত হয়ে উঠার আগেই। আমাদের জানা উচিত, আল্লাহ তাআলা কাফিরদের নেতাদের হত্যার যে নীতি আমাদেরকে অনুসরণ করতে বলেছেন সেই নীতি ইদানিংকালে কাফিররা ঠিকই অনুসরণ করছে। তারা গুম-খুনের মাধ্যমে শত্রু পক্ষের নেতাদের শায়েস্তা করছে। তারা যে নীতি অনুসরণ করছে তা হল, নেতাদের কবর রচনা করো, ছোটরা সবকিছু এমনিই ভুলে যাবে।

আমরা আরও উল্লেখ করতে চাই যে, কখনও কখনও জিহাদী গ্রুপগুলোর অভ্যন্তরেই বিপরীতগামীতা[22] ঘটতে পারে। আমরা নিজেদের জন্য এবং অন্যদের জন্যও এমন হওয়া থেকে আল্লাহ তা’আলার কাছে আশ্রয় চাই। এতে করে আমাদের বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। এ থেকে সুরক্ষার উপায় হলো, প্রত্যেক গ্রুপের উচিত এক সাথে কাজ করার জন্য এগিয়ে আসা এবং সঠিক পথ নির্দেশ করা। এমন বিষয়ে কারো কঠোরতা করা উচিত নয় যে বিষয়ে নমনীয়তা প্রদর্শন বৈধ কিংবা এমন বিষয়ে নমনীয়তা প্রদর্শন করা উচিত নয় যে বিষয়ে কঠোর হওয়া উচিত। তাদের উচিত সবসময় আল্লাহ তা’আলার উপর আস্থা রাখা। কাজের ফলাফল দেখে বা মানহাজের শক্তি-সামর্থ দেখে কিংবা অনুসারী ও সাহায্যকারীদের সংখ্যাধিক্য দেখে প্রতারিত হওয়া উচিত নয়। বস্তুত কোরআন সুন্নাহ‘র বাস্তবায়ন ও প্রতিফলন কার মধ্যে কতটুকু এর মাধ্যমেই মানহাজের শক্তি নির্ণিত হয়। তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা নিজে যদি মানুষের অন্তরকে একে অপরের সাথে জুড়ে না দিতেন তাহলে কারো অনুসারী ও সাহায্যকারীর সংখ্যাধিক্যও ঘটতো না । সাহায্য ও বিজয় একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। তিনি না চাইলে এ সবের কিছুই হতো না।

৬ষ্ঠ সমস্যাঃ

মাত্রাতিরিক্ত জোশ ও এ থেকে উদ্ভূত সমস্যাবলী। যেমন, অতি উৎসাহী হয়ে তড়িঘড়ি করে অপারেশন চালানো কিংবা কোন বোকামী করা বা সীমালঙ্ঘন করা

তড়িঘড়ি করে অপারেশন চালানো

এ সমস্যার চিকিৎসা হলো, যুবকদের ধ্যান-ধারণা বুঝা ও তাদের নিয়ে বসা এবং তানজিমের কাজের সাধারণ পলিসি তাদের সামনে স্পষ্ট করা এবং (উদাহরণত) শত্রুকে ধীরে ধীরে শেষ করার উদ্দেশ্যে বা আরও অন্যান্য উদ্দেশ্যে যুদ্ধের একটা পর্যায় পর্যন্ত ‘অপেক্ষা’ করার গুরুত্ব তাদের সামনে স্পষ্ট করা। আমরা তাদেরকে বুঝাবো যে, যারা পাহাড়ের মত ভারি ও শত্রুর প্ররোচনায় সহজে পা দেয় না একমাত্র তাদের দ্বারাই এ বিষয়টি সম্ভব। অবশ্য, একজন মুমিনের জন্য একেবারে নির্বিকার জোশহীন হওয়া উচিত নয়, আল্লাহর জন্য ক্রুদ্ধ হওয়া চাই এবং পূর্ণ শক্তি দিয়ে হারামবিষয়গুলোকে প্রতিহত করার চেষ্টা করা চাই। তবে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কখন, কীভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে সে বিষয়টিও তাকে জানতে হবে।

একইভাবে, আমরা তাদেরকে (বড়দের নির্দেশনা ) শোনা ও মানার (السمع والطاعة) গুরুত্ব বুঝাবো। বিশেষকরে ওইসব বিষয়ে যেগুলোর পিছনের কারণ গোপনীয়তার জন্য আমরা প্রকাশ করতে পারি না। এক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী থেকে কিছু দৃষ্টান্ত আমরা তুলে ধরতে পারি এবং এটাও তাদের কাছে স্পষ্ট করবো যে , আমাদের এই অপেক্ষার কারণ এই নয় যে , আমরা শিথিলতা করছি বা দূর্বল হয়ে পড়েছি বা পিছিয়ে এসেছি। যদি এমনই হতো তবে তো প্রথমেই আমরা জিহাদের ঘোষনা দিতাম না। এবং (তাদেরকে এও বুঝাবো যে ,) আমরা যথাসম্ভব জনতার মাঝে পারস্পরিক হৃদ্যতা আনয়নের লক্ষ্যে ও সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি এবং যথাস্থানে যথাসময়ে তটস্থঃকরণ পর্বের যেসব লড়াই চলছে সেসব লড়াইয়ে অতি উৎসাহের অঙ্গারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কাজ করছি। এক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের মতো নয় যারা লড়াই না করে বসে থাকে।

এভাবেই সম্ভব জনতার উৎসাহের অতিরিক্ত লোড ভাণ্ডারকে উপকারী খাতে ব্যয় করা। পাশাপাশি নিয়মতান্ত্রিক সার্বিক কর্মকান্ডের ভিতরে (অযাচিত) যে কোনো কর্মের ঝুঁকি কতটুকু , তাও তাদের কাছে স্পষ্ট করতে হবে। কোনো কাজ কারো দৃষ্টিতে যতই ছোট ও গুরুত্বহীন হোক না কেন , বিষয়টি সঠিকভাবে নিশ্চিত করার গুরুত্ব তাদেরকে বুঝাতে হবে। কারণ , কিছু কিছু উৎসাহী যুবকের মানসিকতায় বড় বড় কাজের প্রতি বিশেষ করে স্বশস্ত্র লড়াইয়ের প্রতি প্রবল আগ্রহ থাকে। নিঃসন্দেহে এটি একটি উত্তম বৈশিষ্ট্য , যা বেশিরভাগই উঁচু হিম্মত ও উঁচু মনোবলের প্রমাণ বহন করে। কিন্তু এর একটি ক্ষতিকর দিক হল এর কারণে তারা অন্যান্য ছোট কাজগুলোকে গুরুত্বহীন মনে করতে থাকে। ফলে এসব কাজে তারা উদ্যম হারিয়ে ফেলে বা সেগুলো করতে গিয়ে অদক্ষতার পরিচয় দেয়।

পূর্বের আলোচনার সাথে আরেকটি কথা যুক্ত করছি ; তা হলো, আমরা যখন বিভিন্ন কাজে ভালো নেতাদের নিযুক্ত করবো ,

যারা তাদের অধিনস্তদের কাছে আস্থাভাজন , তখন দেখা যাবে হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো কারণে বা অন্য কোনো কারণে নেতৃবৃন্দের নির্দেশিত দায়িত্ব এড়িয়ে যায় এমন সদস্যদের সংখ্যা কমে আসবে।

সীমালঙ্ঘন

এর মূল চিকিৎসা হল , ‘ইলম’ তথা জ্ঞান। যুবকদের জ্ঞানের স্তর যতই উন্নীত হবে ততই এই সমস্যা থেকে নিস্তার লাভ হবে। কমপক্ষে প্রত্যেক অঞ্চলে যদি একজনও ইলমী গভীরতা সম্পন্ন কর্মী থাকে তাহলে সূচনাতেই এই সমস্যাকে সে বিতাড়িত করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

আর যে অবিরত তাড়াহুড়া নীতি অবলম্বন করে চলবে বা সীমালঙ্ঘনমূলক বিষয়গুলো ছড়াতে থাকবে, তাকে অবশ্যই মুজাহিদদের কাতার থেকে দূরে রাখতে হবে। তবে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। তার সীমালঙ্ঘনের ধরণ ও পরিমাণ বুঝে এবং তার থেকে যা প্রকাশ পাচ্ছে তা বিবেচনা করে তার সাথে আচরণ করতে হবে এবং এসব ক্ষেত্রে শরিয়াহ পলিটিক্স প্রয়োগের মাধ্যমে গ্রুপের ক্ষতি করা থেকে তাকে অবশ্যই বিরত রাখতে হবে।

বোকামি

অতি উৎসাহী ব্যক্তি যার কাছ থেকে বিভিন্ন নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ কর্মকান্ড প্রকাশ পায়, তার ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ করে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে যা জানা -বোঝা গেছে তা হলো , তার চিকিৎসা সম্ভব নয়। সুতরাং তাকে মুজাহিদদের কাতার থেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখতে হবে , বিশেষকরে ‘তটস্থঃকরণ ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ ’

পর্বে। কারণ তার কারণে শুধু তার চেনা গ্রুপই নয় বরং অন্যান্য গ্রুপগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তার কারণে এতসব সমস্যা তৈরি হতে পারে যা গুণে শেষ করা যাবে না। এধরণের লোকদের সাথে যারা উঠাবসা করেছে তাদের প্রত্যেকেরই এক্ষেত্রে বিস্তর অভিজ্ঞতা রয়েছে।

এসব অভিজ্ঞতার একটি যেমন - পত্র-পত্রিকায় ও মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচার পাওয়া কিছু কিছু বড় বড় ঘটনার বাস্তবতা ঘাটলে দেখা যাবে ওই বোকা লোকগুলোই এর জন্য দায়ী। এমন হয়েছে যে তারা নিজে নিজে বড় কোনো অপারেশনের প্লান চিন্তা করেছে, বেশিরভাগই যা একেবারেই বাস্তবায়নযোগ্য নয় এবং কাগজে তা লিখে তার ডেস্কের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছে আর যেহেতু সে অনেক বেশি কথা বলে এবং অনেকের সাথে সম্পর্ক রাখে তাই গোয়েন্দারা তার বাড়ি তল্লাশি করতে এসে যখন তার লিখিত ভয়ংকর সেই পরিকল্পনাটি খুঁজে পায়, তখন তারা সেই কাগজটি নিয়ে উড়তে শুরু করে। এবং তাকে সাথে নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করে। আর চাপের মুখে সে এমন এমন নাম বলতে শুরু করে যাদের জিহাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। বরং কখনো সম্পূর্ণ সাধারণ মানুষের নামও সে বলে বসে। তবে তার যেহেতু অনেক লোকের সাথে সম্পর্ক ছিল এবং তার উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে কেউ কেউ তার উপর আস্থাও রেখেছিল, তাই বিভিন্ন জিহাদী গ্রুপের কিছু কিছু সদস্যের ব্যাপারে তার জানাশুনা ছিল। তখন (চাপের মুখে) সে তাদের কথা বলে দেয়। এভাবে ঝামেলার পরিধি বিস্তৃত হয়ে সে অনেকগুলো জিহাদী গ্রুপকে জড়িয়ে ফেলে। অথচ তার করা সেই প্ল্যানের সাথে সেসব গ্রুপের কোনোই সম্পর্ক ছিল না। তখনই নানান অভিযোগ ও নতুন নুতন গল্প জন্ম নিতে থাকে। এভাবে একটি অস্তিত্বহীন বিষয় থেকে একটা ঘটনা সাজানো হয়। বেশিরভাগ অনুসন্ধানকারীদেরই জানা থাকে যে, এই মামলা সম্পূর্ণই বানানো, কিন্তু তারপরও বহু লোককে বিচারের মুখোমুখি করা হয়। আর মিডিয়াগুলো অনুসন্ধানকারীদের বানানো গল্পগুলো গ্রহণ করে। স্বভাবতই (এই বানানো ঘটনার আলোকেই) জিহাদের সাথে যার সামান্যতমও সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় তার ব্যাপারে দীর্ঘ সময়ের জেলের ফায়সালা হয়। আর সাধারণ জনগণকে এবং যারা জড়িত নয় ও ভবিষ্যতেও জড়িত হবে না মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার ফায়সালা হয়, যদিও তারা ইতিমধ্যেই বিচার চলাকালে দীর্ঘ সময়, কখনো এক বছরের বেশি সময় জেলে কাটিয়ে দিয়েছে।

তদন্তবিভাগ ও আদালতের কাছে মামলা, ফায়সালা সবকিছুই পূর্ব থেকে মীমাংসিত থাকে। কিছু লোককে ছেড়ে দেওয়ার যে ফায়সালা তারা করে এটা শুধুই মানুষকে বুঝানোর জন্য যে, এই কুকুরগুলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করছে। কখনো আবার সাধারণ মানুষ বা ধার্মিক শ্রেনী যাদের জিহাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই তাদের ব্যাপারেও ভুলবশতঃ জেলের ফায়সালা হয়ে যায়, আবার কখনো ইচ্ছাপূর্বকই তদন্তবিভাগের তরফ থেকে কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে জেলের ফায়সালা করানো হয়।

এতকিছু যা ঘটে গেল সবই ছিল ওই আহম্মকের স্বপ্নের বদৌলতে। আর বেশিরভাগই দেখা যায় এসব আহম্মকের হালকা সাজা হয় বা তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। সে বাইরে এসে নিজের অজান্তেই গোয়েন্দাদের ভালো একটি ফাঁদ হিসেবে কাজ করে। স্বভাবতই আমরা তার বা অন্য কারো জেল হোক সেটা চাই না।

আরেকটি চিত্র তুলে ধরছি। এদের কাউকে বলা হয় যে, কিছু লেখা ও চিঠি পড়ার পর যেন পুড়িয়ে ফেলে। কিন্তু সে না পুড়িয়ে সেগুলো খুব ভালোভাবে লুকিয়ে রাখে। পরবর্তীতে কখনো যখন স্বাভাবিক তল্লাশির সময় তার বাড়িতেও তল্লাশি হয় তখন এই ডকুমেন্টসগুলো তারা পেয়ে যায়। এবার কিন্তু অনেক বাস্তব এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফাঁস হয়ে যায়। (আমাদের ভাইদের পক্ষ থাকে) তাকে যখন জেলখানায় জিজ্ঞাসা করা হয়, তুমি ডকুমেন্টসগুলো পুড়িয়ে ফেলনি কেন? সে বলে, আমাদের শাইখ ও নেতাদের স্বহস্তে লিখা ডকুমেন্টসগুলো পুড়িয়ে ফেলতে আমার মন সায় দিচ্ছিলো না!!

সারকথা হলোঃ

আহম্মক –বিশেষকরে যাদের কোনো চিকিৎসা নেই- তাদেরকে মুজাহিদদের কাতার থেকে অবশ্যই দূরে রাখতে হবে, বিশেষকরে ‘তটস্থঃকরণ ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ’ পর্বে।

হে সম্মানিত ভাই! তুমি এই ছন্দগুলো সর্বদা ভালোভাবে স্মরণ রাখবে। কারাগারের চার দেয়ালে বন্দী ভাইদের গাওয়া এ [মর্মস্পর্শী] ছন্দগুলো শোনার চেয়ে প্রয়োগের গুরুত্ব অনেক বেশি -

নির্বোধের সাথে মিশো না – বোকামির জালে ফেঁসো না ।

যদি হয় দুশমন মন্দ বিচক্ষণ - মিশো না কখনও মিশো না

যদি হয় দোস্ত আনাড়ি বা অজ্ঞ - তার সাথেও তুমি মিশো না।

মূর্খ বন্ধু যদি গোপন বিষয় জানে- ছড়াবে তা সহজেই এখানে বা সেখানে

খবর ছড়বে জেনো এপার ওপার- কোনও সংকোচ ভয় থাকবে না তার

হেঁটে হেঁটে বলে বেড়াবে- গোপন বিষয় ছড়াবে

উপকারের ইচ্ছায় করবে ফিকির- আসলে ত্বরাবে তোমার ক্ষয় ও ক্ষতির

ভল্লুক প্রিয় বন্ধুকে ফাঁসালো যেভাবে - ফাঁসাবে তোমায় বোকা বন্ধুও সেভাবে।

এ হল ‘তটস্থঃকরণ ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ’ পর্বে নির্বুদ্ধিতার বিষয়। তবে ‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা’ পর্বে এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য তার জোশের কার্গো ভান্ডার বিভিন্ন কাজে খালিকরণের (ব্যয়ের) মাধ্যমে নির্বুদ্ধিতার ক্ষয়-ক্ষতি পাশ কাটানো সম্ভব। এমনকিছু কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যেগুলোতে অংশ্রগ্রহণের ফলে নৈরাজ্য এলাকার প্রশাসন বা সেখানকার লোকদের জন্য সে ক্ষতি বয়ে আনবে না। তারপরও উচিত তার তথ্য জানার অতি আগ্রহ সম্পর্কে সতর্ক থাকা এবং তার সাথে সম্পর্কিত নয় এমন কাজে তার অংশগ্রহণের বিষয়ে সতর্ক থাকা।

উপসংহারঃ

এর চেয়ে সহজ আর কোন সমাধান আছে কি?

কেউ কেউ প্রশ্ন করে যে, এমন কঠিন সমাধানের চেয়ে আরও সহজ ও রক্তপাত মুক্ত সমাধান কি নেই? আবার কেউ কেউ এ সমাধানকে নানান সংশয় প্রকাশের মাধ্যমে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করে। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ উপসংহারে আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত করবো ইনশাআল্লাহ।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

সর্বপ্রথম আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তা হল, যে কোনো ভ্রান্ত পথ ও অমূলক ধ্যান-ধারণার ভ্রান্তি স্পষ্ট হওয়ার জন্য সামান্য মাথা খাটালেই চলে, আলাদা দলিল প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। তবে শরঈ দলিল অনুসরণ করাই উত্তম।

কেউ কেউ নির্বাচন এবং শান্তিপূর্ণ দাওয়াহ পদ্ধতির কথা বলে থাকেন। আবার অনেকেই যুক্তি দিয়ে এমন কিছু সমাধান তুলে ধরেন যেখানে যথাসম্ভব কম রক্তপাত ঘটিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে ত্বরিত আঘাতের মাধ্যমে সবকিছু সেরে ফেলা হবে।

এ ত্বরিত আঘাত আবার নিজ নিজ নীতিমালা ও চিন্তা-চেতনা অনুসারে দু'ভাবে সম্পন্ন হতে পারে। কেউ কেউ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ত্বরিত আঘাতের কথা বলে। আবার কেউ এমন আঘাতের কথা বলে যা সম্পন্ন হবে গোপন প্রস্তুতির মাধ্যমে, যা কেউ জানবে না। (আসলে এটি কোনো প্রস্তুতিই নয়, কেননা যা কেউ জানে না তা মূলত অস্তিত্বহীন)।

কেউ কেউ আবার তাগুতেরই নজরদারীর মধ্যে থেকে দীর্ঘদিন শান্তিপূর্ণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ করে ত্বরিত আঘাতের চিন্তাধারা পোষণ করে। যে প্রশিক্ষণের আওতায় প্রথমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। সেখানে থাকবে ইসলামী রাজনীতি, অর্থনীতি, শরয়ী শিক্ষা, প্রযুক্তিগত শিক্ষা ইত্যাদি। পরে এসব প্রতিষ্ঠানেরই সহায়তায় তড়িত্ব আঘাত সম্পন্ন হবে।

আর কতক নির্বোধ তো এমন বলে থাকে যে, আমাদের সন্তানরা আঘাত হানবে, আমরা নই। যখন পিতাদের অবস্থা এই, তখন তাদের সন্তানরা কিভাবে কিতাল করবে আমার বুঝে আসে না।

মূল উদ্দেশ্য

একথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রথমেই আমাদের একথা বোঝা উচিৎ যে, ছোট ছোট বিজয়ের সমন্বয়েই বড় বিজয় অর্জিত হয়। জয় পরাজয়ের ক্ষেত্রে লাফ দিয়ে আকস্মিকভাবে বিজয়ী বা বিজিত নির্ধারিত হওয়া সম্ভব নয়। প্রাথমিক ধাপ অতিক্রম করা ছাড়া আকস্মিক উন্নতি কেবল আমাদের মাশায়েখ ও নেতৃবৃন্দের মাথায়ই আসতে পারে। কারণ, তারা তাদের বক্তব্য ও পরিকল্পনায় শত্রুর অগোচরে শুধুমাত্র একটি আঘাতের ব্যাপারেই সকলকে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন, শুধু একটি আঘাতের জন্যই সকলকে পূর্ণ প্রস্তুত করেন। তারা বলতে চান, এই একটি আকস্মিক আঘাতেই আমরা শত্রুকে ধরাশায়ী করে ফেলতে পারবো, ফলে বহু মানুষের রক্তপাত এড়ানো যাবে এবং বহু প্রাণহানী রোধ করা যাবে। তারা এ চিন্তা-চেতনা নিয়ে বিরাট বিরাট বক্তব্য প্রদান করেন এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের শ্লোগানে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকেন।

অত্যন্ত আকর্ষনীয় ও চমৎকপ্রদ হওয়ায় এধরনের চিন্তা চেতনা জনমনে খুব গ্রহণযোগ্যতা পায়। তবে তা আকর্ষণীয় হওয়া সত্ত্বেও খুবই ভঙ্গুর। যদি ইসলামপন্থীদের বিজয়, ক্ষমতা এবং প্রভাব প্রতিপত্তি ফুল বিছানো পথে অর্জিত হয়ে যায় তবে কেনই বা আকর্ষণীয় হবে না? যদি তা স্বপ্নচারীদের কল্পনাপ্রসূত হয় তবে কেনই বা তা পুষ্পময় হবে না?

আর যখনই বাস্তবতার সাথে কোনো ব্যক্তির মস্তিস্কপ্রসূত কল্পনা গুলিয়ে যায় তখন সে আর জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের মতো কথা বলতে পারে না।

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় এমন উন্নত স্বপ্ন দেখা যেখানে 'তটস্থঃকরণ ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ' পর্ব অতিক্রম করতে হবে না, অথচ এর বিবরণ রয়েছে কোরআনে, "إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ" "যদি তোমরা আঘাত প্রাপ্ত হও, তবে তারাও তো তোমাদের মতই আঘাতপ্রাপ্ত"। আরও রয়েছে "يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ" "তারা আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে। অতঃপর মারে ও মরে"। সুতরাং এগুলো এমন স্বপ্ন যার বাস্তবায়ন একদিকে যেমন অসম্ভব, অপরদিকে এগুলো নিঃসন্দেহে এমন কিছু বক্র ধ্যান-ধারণা যা খারাপ পরিণতি ডেকে আনবে।

এসব বক্র ধ্যান -ধারণা যা আমরা মাশায়েখদের মুখে শুনি , যেমন, রাজনৈতিক বিভিন্নতার বৈধতা , ক্ষমতার পালাবদলের বৈধতা , আক্রমণাত্মক জিহাদের অনুমোদন না থাকা এবং মুসলিম রাষ্ট্রে কাফেরদের রাজনৈতিক , সামরিক এবং বিচার বিভাগীয় পদে সমাসীন হওয়ার বৈধতা - এসবকিছুই মূলত সেসব অবাস্তব স্বপ্নের ফসল যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু অলিক চিন্তার মিশ্রনে ঘটা বদহজম থেকে তৈরি। এর কারণ হলো , আমাদের ‘বাস্তবতা ’ বিভিন্ন শয়তানী কাঠামোর বেড়াজালে অনিষ্টতায় ভরপুর হয়ে গেছে এবং ইসলামী আকাঙ্ক্ষাগুলোকে নিঃশেষ করে দিয়েছে।

সুতরাং মাশায়েখদের কেউ যখন ফিকহী বিধানের মাধ্যমে এই ভঙ্গুর বাস্তবতার চিকিৎসায় এগিয়ে আসেন তখন (উল্টো ) বাস্তব পরিস্থিতি তাকে সালাফে সালেহীনের নানান কঠোর নীতি থেকে নিচে নামিয়ে পরবর্তীদের সেই নমনীয়তার দিকে ঠেলে দেয় , যেই নমনীয়তাকে তারা ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যমপন্থা বলে চালানোর চেষ্টা করে। এর কারণ মূলত এটাই যে , রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীকে যেভাবে প্রস্তুত করা দরকার ছিল সেভাবে প্রস্তুত না করেই তাদের ক্ষমতায়ন ঘটেছে। অথচ এই পটভূমি “তটস্থঃকরণ ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ ” এর ধাপ অতিক্রম করা ব্যতিত রচিত হয় না।

এ কথা স্বীকার করি যে , একটি মৌলিক পরিবর্তনের আন্দোলন যা আমাদের লক্ষ্য সেই আন্দোলন এবং তার সার্বজনীন পদ্ধতির প্রতিটি ধাপের ফলাফলের ব্যাপারে আগাম নিশ্চয়তা বা ফলাফলের উপর নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত দুরূহ একটি ব্যাপার। কারণ এটি এমন এক আন্দোলন যেখানে জীবনের প্রতিটি অংশই জড়িত থাকে। মানুষ তার জীবনে সবচেয়ে জটিল যে বিষয়গুলোর সম্মুখীন হয় পরিবর্তনের এ আন্দোলন তার একটি। তার জীবন যুদ্ধের সবচেয়ে দুর্বোধ্যময় অংশ হচ্ছে এটি। পরিবর্তনের যুদ্ধ এমন এক যুদ্ধ যার সাথে পুরোটি জীবনই জড়িয়ে থাকে। এর শুরুতেই এত এত বাঁক রয়েছে যে , ব্যক্তির মনে হবে সে তরঙ্গের ঘূর্ণিপাকে পতিত হয়েছে। এসব বাঁকের একটিকে অপরটি থেকে যেন সে পৃথক করতে পারবে না। আর বাস্তবেও এটি এমনই। যেমনিভাবে রংধনুর রংগুলো পরস্পর পৃথক হওয়া সত্ত্বেও একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকে। ফলে কিভাবেই বা আমরা আমাদের সীমিত বুদ্ধি - বিবেচনা দিয়ে প্রত্যেকটি বিষয়কে অনুধাবন করতে পারবো এবং বিভিন্ন ধাপের ফলাফলের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো ?

কোনো মুসলিম ভবিষ্যত বলতে পারে না , তবে আমাদের কেউ একজন যদি শেষ অবধি বেঁচে থাকতো এবং আল্লাহর করুণা লাভকারীদের শেষ পরিণতি দেখতে পারতো তাহলে সে অনুধাবন করতো যে, তাওহীদ ও জিহাদের প্রতিটি আন্দোলনই চূড়ান্ত অবকাঠামোর এক একটি ইট সমতুল্য।

﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ [الأعراف: ١٨٨]

আমি যদি গায়বের কথা জেনে নিতে পারতাম , তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম , ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনও হতে পারত না। [সুরা আল আরাফ: ১৮৮]

সুতরাং শরীয়তের আদেশগুলো আঁকড়ে ধরা , সামর্থ অনুযায়ী বৈধ উপকরণ অবলম্বন করা , কোনো পরিবর্তন না করে দ্বীনের উপর দৃঢ় থেকে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্ষমতা ও বিজয়ের অপেক্ষা করা - এটাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য।

কেউ হয়তো বলতে পারে যে, আমরা আপনার উল্লিখিত পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিষয়টি আপনার বিপক্ষেই দাঁড় করাতে পারি। অর্থাৎ এ পদ্ধতিটি চিন্তা করলেই এর অসারতা প্রমাণ হয়ে যাবে।

তাহলে বলবো, প্রথমতঃ ইতিপূর্বে আমি অন্যান্য সমাধানগুলোর ব্যাপারে বলেছি যে, বিবেক দিয়ে সামান্য চিন্তা করলেই এগুলোর অসারতা বুঝে আসে। তদুপরি এ পদ্ধতিগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর অনেক বিষয়ই শরঈ নির্দেশাবলীর বিপরীত। পক্ষান্তরে আদর্শ জিহাদী সমাধানের বিপক্ষে যথাযোগ্য কোনো শরীয়া দলিল কেউ উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে না। আরো নির্দিষ্ট করে বললে আমরা বলবো- এমন নয় যে এটি বিভিন্ন সমাধানের একটি, বরং আমরা বলি এটি শরীয়া কর্তৃক নির্ধারিত অলঙ্ঘনীয় ফরজ বিধান।

দ্বিতীয়তঃ মুসলিম-অমুসলিমদের ঐতিহাসিক এবং সমসাময়িক উভয় অভিজ্ঞতাই আমাদের উল্লিখিত পদ্ধতিকে সমর্থন করে। কারণ রাষ্ট্র একটি বিশ্বজনীন বিষয়। এর সাথে বিশ্বের প্রতিটি সদস্য জড়িত। আর সকল রাষ্ট্রই এমনকি গণতন্ত্রও অস্তিত্ব লাভ করেছে এক সাগর রক্তক্ষয়ের পর। কাজেই এসব অভিজ্ঞতা আমাদের বর্ণিত পদ্ধতির সফলতা প্রমাণ করে। বরং এ পদ্ধতির প্রতিটি ধাপ পরবর্তী ধাপের কাছে এমনকিছু পরিস্থিতি অর্পণ করে যেসব পরিস্থিতি ঐতিহাসিকভাবে এমনকি সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের আলোকেও স্বীকৃত। এটি প্রাথমিক কিছু কল্পনাপ্রসূত ভাবনা নয়।

পূর্বের যেকোন পরিস্থিতিতে ব্যর্থতা থেকে থাকলে তা জাগতিক এবং শরয়ী উপকরণ গ্রহণে ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে ছিল। কাজেই ব্যর্থতার দায় আমরা শরঈভাবে ফরয বিধানের মাধ্যমে যে সমাধানের কথা বলেছি তার উপর বর্তাবে না।

অধিকাংশ ইসলামী আন্দোলনই কষ্টকর মনে করে এ পদ্ধতি পরিত্যাগ করে থাকে এবং খুব অল্প সংখ্যক দলই শুরুতে এ পদ্ধতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। তারা এটি স্বীকার না করে বরং এমনসব প্রমান পেশ করা শুরু করে যা আল্লাহ তা’আলা বৈধ করেননি অথবা তারা প্রতারণাপূর্ণ স্লোগান তুলে ধরে। এসকল আন্দোলনের উচিত ছিল মিথ্যা এবং পরাজয় উভয় গ্লানীই বহন না করা।

যদি তারা নিজেদের প্রতিও সৎ থাকতো তবে বলতো ‘পথ অনেক দীর্ঘ, কাঁটা অনেক বেশি, আমাদের পা এত কংকরময় পথ পারি দিতে সক্ষম নয়’। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের মাঝে সততার সংকটই হচ্ছে মূল সংকট।

আমি একবার একজন রাজনীতি বিষয়ক বিশেষজ্ঞের একটি প্রবন্ধ পেয়েছিলাম যিনি নব্বই এর দশকে মিশরে গোলযোগের সময় শান্তিপূর্ণ ধারার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি সেই প্রবন্ধে জিহাদী আন্দোলনগুলো ইসলামী দলগুলোকে সামরিকায়নের প্রতি কেন আহবান করছে এ নিয়ে সমালোচনা করেছেন। কেননা তার মতে ইসলামী আন্দোলন হচ্ছে সার্বিকভাবে একটি দাওয়াতী আন্দোলন।

আমি বলবো, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সাথে কি করেছিলেন? তিনি কি সামরিকায়ন করেননি? আমার পিতা মাতা তাঁর উপর কুরবান হোক। শরীয়া এবং জাগতিক পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর চেয়ে বেশি জ্ঞানী আর কে আছে? সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে ক্বুদসিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করেন ‘আপনার অনুসারীদের নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন যারা আপনার বিরোধিতা করে’।

বর্তমান সময়ে যারা পারিভাষিকভাবে দাঈ তারাই তো তখনকার সময়ে মুসআব, মুআয, ক্বারী, আলেম (আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন)- এসব নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তখন অধিকাংশ সাহাবীই ছিলেন মুজাহিদ, এমনকি দাঈ সাহাবীরাও ছিলেন মুজাহিদ, শহীদ।

যদিও সাহাবীদের অধিকাংশই মুজাহিদ ছিলেন তথাপি তাদেরকে আমরা আল্লাহর পথের শ্রেষ্ঠ দাঈও বলতে পারি। কারণ জিহাদ দু‘ধরণের; আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক। আর আক্রমণাত্মক জিহাদের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী যারা আমাদের সংস্পর্শ পায়নি

তাদের কাছে স্বাধীন ও কার্যকর ভাবে দাওয়া ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয় আর রক্ষণাত্মক জিহাদের মাধ্যমে আমাদের নিজেদের সন্তানদের জন্য দাওয়ার পরিবেশ ও স্বাধীনতা - দখলদার কুফফার ও মুরতাদ গোষ্ঠী থেকে রক্ষা করা হয় এবং আমাদের দাওয়াকে অকার্যকর করার তাদের সকল অপচেষ্টা রুখে দেয়া হয়। বিশ্বপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কী চমৎকার এই দ্বীন ! হায় , যদি আমরা বুঝতাম ...

শুরুর ধাপগুলোতে দাওয়াতি কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে উম্মতের বাছাই করা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত শ্রেণীকে আকৃষ্ট করা। সর্বসাধারণের সাড়া দেয়ার বিষয়টি আল্লাহর সাহায্যে বিজয় অর্জন ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর। কারণ জনগণ যদি মনযোগ সহকারে দাঈদের কথা শ্রবন করে তবেই দাওয়াত তাদের অন্তরে প্রবেশ করে থাকে। আপনি কি লক্ষ করেননি যে , জ্বিনদের একদল যখন মনযোগ সহকারে কুরআন শ্রবন করেছিল তখন তারা শুধু সাড়াই দেয়নি বরং নিজেদের কওমের কাছে সতর্ককারী এবং দাঈ হয়ে ফিরে গেছে। এজন্যই তাগুতেরা জনগণকে বিভিন্ন আমোদ -প্রমোদে ব্যস্ত রাখার মাধ্যমে মনযোগ সহকারে দাওয়া শ্রবন থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে , যেন তারা সাড়া প্রদান না করে।

তাই কোনো এক হকপন্থী দাঈর কথায় অবাক হওয়ার কিছু নেই ; তিনি বলেছিলেন , আমি সারা বছরে যা গড়েছি তা এক নর্তকী টিভিতে এসে মুহূর্তেই ধ্বংস করে দিয়েছে। কাজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সুদৃঢ় দ্বীন -যাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যার অবকাশ নেই - আমাদেরকে এমন বিষয়াবলীর নির্দেশ প্রদান করবে না যা পরিণামে ফলাফল শূন্য। এজন্যই শরীয়ত আমাদেরকে প্রথমেই এসব বাধাপ্রদানকারী বিনোদন অপসারনের নির্দেশ প্রদান করে, যেন জনগণের সাড়া প্রদান সহজ হয়।

নিশ্চয়ই ‘চির সত্যবাদী’ ‘আল-আমীন’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডাকে যারা সাড়া প্রদান করেছিল তাদের সংখ্যা বর্তমানের যে কোনো দাঈর ডাকে সাড়া প্রদানকারীদের সংখ্যার তুলনায় বেশি ছিল। কাফিররা তো শুধু তাঁর পবিত্র চেহারার দিকে তাকিয়েই বলে দিত যে , এটা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না , এই বলে ঈমান গ্রহণ করতো। অপরদিকে তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ] ছিলেন ওহী দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত। কুফফারদের সন্দেহের জায়গাগুলোতে তাদের বোধগম্য ভাষায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ উত্তর তিনি প্রদান করতেন , যেন তারা তাঁর বক্তব্য উত্তমরূপে বুঝতে পারে।

তিনি এমন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন যারা বর্তমানের অনেক বুদ্ধিমানের তুলনায় দ্রুত তাঁর আহবানে সাড়া দেওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। তাদের কাউকে যদি প্রশ্ন করা হত: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ [তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়েছে গেছে , না তারা নিজেরাই স্রষ্টা ?] (সূরা তুর ৩৫ ) আর এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতে যখন সে পাথরের বানানো নিষ্প্রাণ মূর্তির দিকে তাকাতো , তখন তার জন্য রাসূলের আহ্বানে সাড়া দেওয়া সহজ হয়ে যেত। কিন্তু এরপরও খুব বেশি মানুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডাকে সাড়া দেয়নি। পক্ষান্তরে যখন তিনি এ অল্প ক ’জনকে নিয়ে কোষমুক্ত তরবারি সহ দাওয়াত শুরু করলেন তখন দলে দলে তারা সাড়া দিতে লাগলো।

অপরদিকে আমাদের অবস্থা কি ? আমাদের সঙ্গে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেই , তাঁর সাহাবীগণও নেই। অথচ আমরা এমন মুরতাদ মতবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করে। ফলে আমাদের ডাকে সাড়া প্রদানকারীর সংখ্যা শূন্যের কোঠায়।

অথবা লড়াই করছি এমন এমন কুফরী মতবাদ ও চিন্তা যুগ যুগ ধরে কুফফার গোষ্ঠীর পদ্ধতি এটিই। তাহলে কিভাবে আমরা ভাবতে পারি যে , আমাদের ডাকে অসংখ্য মানুষ সাড়া দিবে অথবা এই সীমিত সুযোগ সুবিধার মধ্যেই যে অল্প কিছু মানুষ সাড়া দিবে তাদেরকে আমরা ধরে রাখতে পারবো ?

এসকল লোকেরা তাগুতের তত্ত্বাবধানেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে অগ্রসর হওয়ার কথা বলে থাকে। তারা হয়তো ভুলে গেছে বা ভুলে থাকার ভান করেছে যে, তাগুতেরা একে অপরের সাথে তথ্য বিনিময় করে থাকে। তাদের পার্লামেন্টে তাদের নিকট অর্থহীন কোনো প্রতিনিধিত্বেরই যেখানে অনুমোদন দেয় না, সেখানে বিপুল সংখ্যক সৈনিক ও যুবক সম্বলিত এমন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানকে কিভাবে তারা অনুমোদন দিতে পারে ? কিছুদিন পর যখন তাগুতগোষ্ঠী তাদের সামনে-এ অজুহাত তুলবে বাধা হয়ে দাঁড়াবে - যে, তারা [প্রতিষ্ঠানগুলো] রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তখন তাদেরকে [তাগুতগোষ্ঠীকে] কে রুখবে ? এমনকি এ তাগুতগোষ্ঠি নির্লজ্জভাবে এসব প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়াকে গর্বের সাথে তারা নাম দিবে - 'ফিলিস্তিন ও চেচনিয়ার জন্য তহবিল সংরক্ষণ' বলে। অতঃপর এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য হাতেগোনা এমন কিছু সংখ্যক লোকই পয়েন্টই কেৰল অবশিষ্ট থাকবে যাদের আদতে কোনো মূল্য নেই ফলে পরবর্তী প্রজন্ম এসে আবার নতুনভাবে শুরু করবে এবং একই চক্রে ঘুরপাক খেতে থাকবে। তাদের সামনে জিহাদের কোনো নমুনা থাকবে না। আর এমনই দিবাস্বপ্ন বর্তমানে অনেকে দেখে চলেছে। পরবর্তী প্রজন্ম এটাকেই উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করে নেয়।

এজন্যই জিহাদের ঘোষণা দেয়ার ব্যাপারে তাদের পক্ষ থেকে অদ্ভুত কথাবার্তা শুনতে পাবেন। কারণ, তারা কিতাল শুরু করার জন্য এমন এক ধাপকে শর্ত হিসাবে নির্ধারণ করে যার অস্তিত্বই কিতাল ছাড়া সম্ভব নয়...!! তারা যদি এটা বুঝে থাকে তবে তো এটি তাদের অসৎ উদ্দেশ্য এবং জিহাদ না করে বসে থাকার উপর সন্তুষ্ট থাকার প্রমাণ। কারণ তারা এটা জানে যে, এমন দিন কখনোই আসবে না যেদিন তারা জিহাদ করবে।

তাগুতের তত্ত্বাবধানে কিছু দাতব্য সংস্থা টিকিয়ে রাখতে, অথবা শান্তি প্রিয় কয়েক হাজার মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ টিকিয়ে রাখতে এসব পথ ও পন্থা উদ্গীরন উদ্ভাবন করা হয়, যেখানে নেই কোনো বিপদ -আপদ, নেই কিছু বিপন্ন হবার আশংকা। এসব সমাধান ও পদ্ধতির অর্জন বর্তমানে এতটুকুই যে, এর দ্বারা মুমিনের অন্তরের অগ্নিসম জ্বলন্ত ঈমানী চেতনা ও সাহসিকতা [ বরং] নির্বাপিত হয়ে যায় ।

এখনি সময়টি আমাদের জন্য সুযোগ, এমন গুরুত্ববহ সুযোগ বহুকাল পরই ফিরে আসে। এ সুযোগকে যদি আমরা কাজে না লাগাই তাহলে আর এক প্রজন্ম এসে আমাদের বর্ণিত সুখ স্বাচ্ছন্দের মাঝে ডুবে গিয়ে একই পথের পথিক হবে। পার্থক্য শুধু এটুকু হবে যে, সুযোগ নষ্ট করার কারণে এ নতুন প্রজন্ম আমাদেরকে অভিশম্পাত করবে।

আমরা যদি এ সুযোগ হারাই তবে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম, তাগুতী বিচার ব্যবস্থার কাছে বিচার চাইবার পঙ্কিলতায় জড়িয়ে যাবে, টেলিভিশনের অশ্লীলতায় ডুবে থাকবে এবং পার্থিব জীবনের আরও নানা বেহায়াপনায় মজে থাকবে, যেসব বেহায়াপনার পথ বড় ছোট সকলের জন্য সেই তাগুতেরা আড়াল করে রেখেছে। সম্ভবত এদের অধিকাংশের মৃত্যু হবে জঘন্য ফিসক অথবা কুফরের উপর। দুনিয়াবী করুণ পরিণতির কথা না হয় বাদই দিলাম।

পক্ষান্তরে একই সময়ে যদি পুরো উম্মাহ পরিবর্তনের এ যুদ্ধে নিহত হতো, তবে তারা আসহাবুল উখদুদের ন্যায় শহীদি মর্যাদা পেতো। আর নিঃসন্দেহে তা হতো দু'টি কল্যাণের একটি। ঠিক যেমনটি শাইখ সুলাইমান বিন সাহমান রহ. বলেছেন,

لو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا، لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتاً يحكم بخلاف شريعة الإسلام التي بعث االله بها رسوله صلى االله عليه وسلم

যদি শহরবাসী ও গ্রামবাসী একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং এক পর্যায়ে সবাই মারা যায়, তথাপি এটি পৃথিবীতে এমন তাগুত শাসক নিযুক্ত করার চেয়ে ভালো যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনিত শরিয়াহ বিরোধী আইনের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করবে।

তাগুতগোষ্ঠীর অব্যাহত পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা এই লক্ষ্যে যে, কিভাবে এই উম্মাহর সম্পদ লুট করবে, উম্মাহকে লাঞ্ছিত করবে, তাদের জিহাদী স্পৃহা নিভিয়ে দিবে, যুবকদেরকে এবং মাথাচাড়া দিয়ে উঠা যে কোনো আন্দোলনকে কিনে নিবে। এজন্য আমাদের করণীয় হচ্ছে সকলকে যুদ্ধের দিকে টেনে আনা। যেন যারা বেঁচে থাকার তারা বুঝেশুনেই বাঁচে, আর যারা ধ্বংস হবার বুঝেশুনেই ধ্বংস হয়। আমাদের কাজ হচ্ছে সকল আন্দোলন ও জনগোষ্ঠীকে এবং সকল জোটকে যুদ্ধের দিকে ধাবিত করা এবং অবস্থা সম্পূর্ণ উল্টে দেওয়া। সকল গ্রুপকে ঐক্যবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে

বর্তমান শয়তানী সভ্যতার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যাদের ঘাড় বাঁকা হয়ে গেছে তাদের অসুস্থ মস্তিস্কের জল্পনা কল্পনা হলো - কাংখিত ইসলামী রাষ্ট্র জাতিসংঘের একটি সদস্য রাষ্ট্র হবে, যেখানে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে তার পারস্পরিক সহাবস্থান ও স্বার্থ বিনিময় থাকবে। অথচ বাস্তবতা হলো, এসব সংঘ ভাঙ্গার মাধ্যমেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। আর আমরা আলহামদুলিল্লাহ শরয়ী নীতিমালা ও প্রকৃতির স্বাভাবিক নীতিমালা সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত আছি। আশা করি, আল্লাহ তাআলা তাঁর রহমতের চাদরে আমাদের আবৃত করে নিবেন এবং তাঁর সত্য প্রতিশ্রুতিতে পৌঁছা পর্যন্ত -যা আমাদের নিকট একান্ত কাম্য - আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে তত্ত্বাবধান করবেন। এগুলো আল্লাহর ওয়াদা, যদি আমাদের কারো জীবনে সেসব ওয়াদার প্রতিফলন নাও ঘটে, তথাপি সেগুলো নিঃসন্দেহে ঘটবে। তাদের ক্ষেত্রেই ঘটবে যারা এপথে দৃঢ়পদ থেকে যাত্রা অব্যাহত রাখবে, কালের বিবর্তণে যারা ভেঙ্গে পড়বে না, বরং তাদের দৃঢ়তা ও বিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আর কঠিন মুহূর্তের দৃঢ়তা এর সঠিকতার প্রমান বৈ কিছু নয়

সমাধানের পদ্ধতি হিসাবে সামরিক অভ্যুত্থান

একটি সমাধান বাকি রয়েছে, যার মাধ্যমে কখনও কখনও সফলতা আংশিক ভাবে আসে। কারণ, এর উপাদানগুলো ত্রুটিপূর্ণ। তাই ত্রুটিপূর্ণ ফলাফলই প্রকাশ পায়, যা উল্টে যেতেও দেরি হয় না। এটি এমন একটি সমাধান যা আমাদের আন্দোলনের পরিপূরক অংশ হিসেবে গৃহিত হতে পারে, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত হতে পারে না। (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের একদম শেষ দিকে ইয়েমেনের এক মিথ্যা নবুওয়তের দাবীদার) আসওয়াদ আল আনসির বিরুদ্ধে হযরত ফাইরুয দাইলামী রাযি.র নেতৃত্বে এ পদ্ধতিটি কার্যকর হয়েছিলো। এ পদ্ধতিকে বলা হয় সামরিক অভ্যুত্থান। হ্যাঁ, এটি এমন একটি পদ্ধতি যেখানে সুন্নাহ'র একটি দিক অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি অবলম্বনকারীদের পক্ষে কখনো কখনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব, তবে ওই রাষ্ট্রের জন্য পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রূপরেখার উপর টিকে থাকা বেশ কঠিন। হ্যাঁ, তবে যদি এই পদ্ধতিকে পূর্ণাঙ্গ সুন্নাহসম্মত পদ্ধতির আংশিক পদক্ষেপ ও আংশিক কলা-কৌশল হিসেবে ধরা হয় (যা মূলত এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়) তাহলে ভিন্ন কথা। হযরত ফাইরুয দাইলামী রাযি.র পদ্ধতিটি ইসলামী পদ্ধতির একটি অংশ ছিল মাত্র, এটিই মূল পদ্ধতি ছিল না।

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. বলেন, যারা এমন অপেক্ষায় রয়েছে যে - সামরিক বাহিনীর একটি দল তাদের জন্য আল্লাহর জমিনে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করে দিবে, আর তারা এমন একটি যুদ্ধের পর রেডিও-টেলিভিশনে প্রথম বিবৃতিতেই লোকদের জন্য (ইসলামী) বিধান জারি করে ফেলবে যে যুদ্ধে না আছে কোনো দুর্ভোগ, না আছে কোনো কষ্ট; যে যুদ্ধের পূর্বে রয়েছে গোপনীয়তা, তোষামোদ আর হক কথাকে গোপন করার নানা ধাপ। যারা এমন অপেক্ষায় রয়েছে তাদের ধারণা হলো, তারা ব্যক্তি ও আত্মার পরিবর্তন ঘটিয়ে খুব সহজেই এবং যৎসামান্য কুরবানিতেই কলুষমুক্ত সমাজ গঠন গঠন করতে পারবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য দীর্ঘ পরীক্ষা ও কঠিন পরিশ্রমের পরই অবতীর্ণ হয়ে থাকে।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿البقرة: ٢١٤﴾

তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনি ভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য! তোমরা শোনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী। [সূরা বাক্বারা ২১৪]

সুতরাং যারা তাদের অফিসের ডেস্কের ওপাশে বসে থেকে আল্লাহর সাহায্য নেমে আসার অপেক্ষা করে তারা আসলে সমাজ প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর নির্ধারিত পদ্ধতি এবং দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহর নীতিমালা সম্পর্কে কোন ধারনাই রাখে না।

একবার এক দাঈ আমাকে বললেন, ‘আমি এক অফিসে একজন কর্মকর্তার সাথে দুই বছর কাজ করেছি কিন্তু সে আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বুঝতে পারেনি। তখন আমি তাকে বললাম, তাহলে আপনি আপনার অন্তরে ধারণকৃত সত্য সম্পর্কে এ দু’বছরে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি!!

লক্ষ্য করুন! আজকের এসব গোপন দাঈগণ যা করছেন সাহাবায়ে কেরামও যদি তাই করতেন তাহলে আপনি কি মনে করেন ইসলাম মক্কার সীমানা পেরিয়ে বের হতে পারতো?

হযরত বিলাল রাযি. যদি চুপ থাকতেন, হযরত ইয়াসির রাযি. ও সুমাইয়া রাযি. যদি কথার মারপ্যাঁচ করতেন, হযরত উসমান বিন মাযউন রাযি. যদি বাহ্যিকভাবে আত্মসমর্পণ করতেন, হযরত আবু বকর রাযি. যদি তাঁর আশ্রয়দানকারী ইবনুদ দাগিনার শর্ত মেনে নিতেন যে, তাঁর কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ যেহেতু কুরাইশের লোকদের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে তাই তিনি উচ্চস্বরে কোরআন তেলাওয়াত করবেন না, আমি বলব, এ সব মহান ব্যক্তিগণ যদি জাহিলি সময়ের অত্যাচারী ও অহংকারীদের সামনে চুপ থাকতেন তাহলে ইসলাম কিছুতেই মক্কার বাত্বহা উপত্যকা থেকে বের হতে পারতো না এবং হারুরা অঞ্চল অতিক্রম করতে পারতো না।

কঠিন নির্যাতনে নিপতিত হয়ে আহাদ... আহাদ... ধ্বনিতে হযরত বিলাল রাযি.র আকাশের দিকে উত্থিত সেই অঙ্গুলি ছিলো কুফরের ভিত নাড়িয়ে দেয়া ভুমিকম্প, যা জাহিলিয়াতের বিষবৃক্ষকে সমূলে নাড়িয়ে দিয়েছিলো।

যুক্তি বিলাল রাযি.কে বলছিলো, উমাইয়া ইবনে খালফকে ধোকা দিয়ে বল যে, “আমি লাত ও উযযা’র দ্বীনের উপরই আছি” আর রাতে তোমার প্রকৃত নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বল যে, আমি উমাইয়া ইবনে খালফকে ধোকা দিয়েছি এবং তাকে উপহাস করেছি তাই সে আমাকে তার সঙ্গী মনে করে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু দ্বীনের দাওয়াত এ ধরনের রাজনৈতিক চাতুর্যতা দিয়ে বিজয় লাভ করে না, বরং তা ওইসব ব্যক্তিদের অনুপস্থিতিতে নুয়ে পড়ে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় যারা রক্ত ঝরিয়ে এবং ছিন্নভিন্ন দেহ ও খুলির বিনিময়ে একে উজ্জীবিত রাখে।

জাহিলিয়াতের জুলুম নির্যাতন দীর্ঘদিন ধরে সয়ে যাওয়া এবং কষ্টের দীর্ঘ নিঃশ্বাসকে বুকের গভীরে চেপে রাখা- এ ব্যাপারে আমি বলবো, কেউ হয়তো একে দাওয়াহর জন্য উপকারী মনে করতে পারে, কিন্তু তারা জানে না যে, এটি পরিণামে অন্তরকে মেরে ফেলে, বিশেষত যখন কোনো ব্যক্তি অত্যাধিক আতংকগ্রস্ত থাকে। অতিরিক্ত আতংক মস্তিস্কবিকৃতির স্তরে নিয়ে পৌঁছায়। ভীরুতা ও কাপুরুষতা ধীরে ধীরে (অন্তরাত্মাকে) মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

আত্মসম্মানবোধকে প্রথম দিকে কখনো কখনো দমিয়ে রাখা হয়, অতঃপর ধীরে ধীরে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে শুকিয়ে বিলুপ্ত প্রায় হয়ে যায়, একপর্যায়ে তার মৃত্যু ঘটে। আর যখন কারো ভিতরে এ গুণটির মৃত্যু ঘটে তখন সে মরা লাশে পরিণত হয়। তখন সে আর ভালোকে ভালো এবং মন্দকে মন্দ হিসেবে চিনতে পারে না কিংবা তার অবস্থা হয় ঠিক যেমনটি

হাদিসে এসেছে - ‘আল্লাহর জন্য গোস্বায় কোনো দিন তার চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করেনি।’

ভীরু -কাপুরুষ ভীরুতাকে ভাবে বুদ্ধি চাতুর্যতা

এতো ধিকৃত-কলুষিত স্বভাবের ভাঁওতামি আর ধোঁকা

তুমি যখন কুফরের অধিনে ধ্বংসাত্মক সেই লুকোচুরিতে নিমজ্জিত হয়ে দীর্ঘদিন ধৈর্য ধারণ করতে থাকবে, তখন দিন দিন তাগুতী সংস্কৃতির সাথে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হতে থাকবে। এক পর্যায়ে ওগুলোর প্রতি সখ্যতাও তৈরি হয়ে যাবে, যার পরিণতিতে তোমার সহজাত স্বভাব বিকৃত হয়ে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতি মিশনে গোপনীয়তা খুব অল্প সময়ের জন্যই ছিলো। অতি দ্রুতই তা ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্য দাওয়াতের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। সামরিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অবশ্য গোপনীয়তা এবং সতর্কতা জরুরি। (যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন)

﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ﴾ [النساء: ٧١]

“তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়” (সুরা নিসাঃ ৭১)

তবে সেটা এমন গোপনীয়তা নয় যা অচলাবস্থা তৈরি করে এবং মৃত্যু সমতুল্য স্থবিরতার দিকে নিয়ে যায়। এমনিভাবে কিতাল এবং আল্লাহর রাস্তার জিহাদই নেতৃবৃন্দকে (অন্যদের থেকে) আলাদা করে দেয় এবং বিভিন্ন ব্যক্তিদের কুরবানির প্রেক্ষিতে তাদেরকে (অন্যদের চেয়ে) অগ্রগামী করে দেয়।

মুসলমানদের মাঝে হযরত আবু বকর রাযি.র অবস্থান, ইজমা’র ভিত্তিতে তাঁর খলীফা নির্বাচিত হওয়া এগুলো আকস্মিক কিংবা এলোমেলোভাবে হয়নি। বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং তাঁর ত্যাগের শ্রেষ্ঠত্বই তাঁকে এগিয়ে দিয়েছে। তাঁর কষ্ট স্বীকার এবং বিপর্যয়ের সময় তাঁর অবস্থান তাঁকে সুউচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছে। এজন্যই হযরত উমর রাযি. তাবুক যুদ্ধের সময় তাঁর অর্ধেক সম্পদ যুদ্ধের জন্য সাদাকাহ হিসাবে নিয়ে এসে যখন দেখলেন যে আবু বকর রাযি. তাঁর সমস্ত সম্পদ নিয়ে এসেছেন এবং “তোমার ঘরের জন্য কী রেখে এসেছ” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন প্রশ্নে আবু বকর রাযি. যখন বললেন, “তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে রেখে এসেছি” তখন উমর রাযি. বলেন “যখনই কোনো বিষয়ে আমি আবু বকরের সাথে প্রতিযোগিতা করি, তখনই আবু বকর আমাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যান”।

খলীফা নির্বাচিত হতে আবু বকর রাযি.র কোনো প্রচারণা চালানোর প্রয়োজন হয়নি। সম্ভাব্য প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দিতাও করা লাগেনি। কেননা তাঁর অবস্থান তাঁর চাল-চলনেই ফুটে উঠেছে। অর্থ ব্যয় করে কোনো হৃদয় কিনে নেয়ার দরকার হয়নি। প্রয়োজন হয়নি কথা বা কাজের চমক দেখিয়ে কারো অন্তরকে প্রতারিত করার।

প্রতিরক্ষা নীতি (কানুন আত-তাদাফু’) হচ্ছে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ইসলামী ব্যাখ্যা। জাহিলিয়্যাত এখানে কোনো পদক্ষেপ নিক বা না নিক ইসলাম তার নিজস্ব পদ্ধতিতে এমন পদক্ষেপ নিবে যাতে প্রতিরক্ষা নীতি বজায় থাকে।

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ٢٥١]

“আল্লাহ যদি একদলকে অপরদলের দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো” (সুরা বাক্বারাঃ ২৫১)

(জিহাদ বিহীন) স্থবির সমাজ হচ্ছে স্থির পানির মতো, যার উপর দূর্গন্ধযুক্ত বস্তু, শৈবাল ইত্যাদি ভেসে উঠে। সুতরাং যে সকল সামাজিক নেতৃবৃন্দ যুদ্ধ থেকে নিজেদের গুটিয়ে রাখে, তারা দূর্গন্ধযুক্ত বস্তুর মতই ভেসে উঠে। পক্ষান্তরে জিহাদি সমাজ হচ্ছে প্রবাহিত পানি ও প্রবাহমান নদীর মতো, যা দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু ও যে কোন ময়লা ধারন করতে অস্বীকার করে। আসলে দীর্ঘ লড়াই ও গুরুতর আঘাতের মধ্য দিয়েই নেতৃত্ব তৈরি হবে। অন্যথায় রাষ্ট্রসমূহ হারিয়ে যাবে, পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে থাকবে, বিভিন্ন বিভাগে গভীর সংকট তৈরি হবে। তাই প্রকৃত নেতৃবৃন্দকে অবশ্যই মূল্য দিতে হবে, কষ্ট স্বীকার করতে হবে, আঘাত সহ্য করতে হবে, কুরবানি দিতে হবে, পিতা-ভাই ইত্যাদি হারাতে হবে। আর তবেই তো তাঁরা সেসব মাসআলা, আক্বীদা ও দৃষ্টিভঙ্গির মূল্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন যেগুলো তারা পালন করে চলেছেন, লালন করে চলেছেন, আর যেসববের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে চলেছেন। এটি ছাড়া ইসলামের কোনো ভিতই স্থাপিত হবে না।

(শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. এর বক্তব্যের কিছু নির্বাচিত অংশ সামান্য সংযোজন বিয়োজনের সাথে এখানে শেষ হল।)

আমরা যে কথাটি জোর দিয়ে বলতে চাই তা হচ্ছে, শাইখের উপরোক্ত বক্তব্যটুকু গোপনীয়তাকে প্রত্যাখ্যান করে না। আমরা বলতে চাই যে, যুদ্ধ এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলীতে গোপনীয়তা নির্দেশিত, যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি (সামরিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা এবং সতর্কতা আবশ্যক [خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ] তবে এমন গোপনীয়তা কাম্য নয়, যা অচলাবস্থা তৈরি করে এবং অন্তরের মৃত্যু সমতুল্য স্থবিরতার দিকে নিয়ে যায়)

ইনশাআল্লাহ কিতাবের শেষে ‘প্রকৃতির স্বাভাবিক ধারা ও নীতিমালা’ সম্পর্কীয় যে প্রবন্ধটি আমি সংযোজন করবো, সেখানে সামরিক অভ্যুত্থানের বিষয়টি আলোচিত হবে।

যারা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পক্ষে তাদের আলোচনায় ফিরে আসি

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. এর স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো এই বক্তব্যটি এমন ব্যক্তিদের বক্তব্যের উৎকৃষ্ট জবাব যারা দাবী করেন যে, তাঁদের কাজগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের স্তরের হুকুম রাখে, অথচ তাদের জন্য এতে কোনোই অংশ নেই।

তারা মক্কী ধাপের হুকুমগুলোকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে তার স্থলে কাফেরদের দিকে ঝুঁকে যাওয়া, তাদের তোষামোদ করা এবং তাদের সাথে একত্রে বসবাস করার কথা বলে থাকে অথচ মক্কী ধাপ ছিলো কাফিরদের মুখের উপর সত্যের ঘোষণা দেয়া, তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, তাদেরকে হত্যার হুমকি দেয়া এবং তাদের কল্পিত দেব-দেবীর সমালোচনা এবং অসারতা প্রকাশ করার ধাপ।

এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, মক্কী জীবন ছিলো সশস্ত্র আনসার যোগাড় করে সামরিক সরঞ্জাম এবং পরিস্থিতি প্রস্তুত করার সময় এবং এর জন্য প্রয়োজনে নিজের ঘর-বাড়ি, পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ এবং তথাকথিত স্বার্থ ত্যাগ করার সময়। কারণ তাঁরা এটা জেনেছিলেন যে, কিতালের দ্বারাই ভূমি, মসজিদ, সম্পদ এবং সেসব (ছুটে যাওয়া) স্বার্থ উদ্ধার হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে জিহাদের বিপরীতে এসব তথাকথিত স্বার্থ আঁকড়ে ধরে এগুলোর উপর নির্ভরতা হচ্ছে জিহাদের পথে সবচেয়ে বড় বাধা এবং আল্লাহর শত্রুদেরকে পরিশ্রান্ত করা ছাড়াই এ কল্যাণসমূহ নষ্ট হবার পথও বটে। জাতি এসকল স্বার্থকে মনে

করে এগুলো হচ্ছে দাওয়াতী কার্যক্রমের ফসল অথবা মনে করে সম্ভাব্য কার্যক্রম। তখন দ্বীনের জন্য ঘর-বাড়ি, সম্পদ ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকে এবং এটাও তাদের কাছে কার্যকর মাসলাহাহ (কল্যাণ) এর অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে! হকের উপর বলিষ্ঠতা পরিপূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে আবার এ দাবী করে থাকে যে, সরাসরি হক কথা বললে এবং সশস্ত্র আনসার তৈরি (যোগাড়) করলে দাওয়াতের ফলাফল নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে এরপর মক্কী জীবনের কার্যক্রমের আর কী বাকি থাকলো? এরপর তারা একে কীভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের সুন্নাহর সাথে সম্পর্কিত করবে!

এরা যখনই কিছু মাসলাহাহ (কল্যাণ) অর্জন করে দশ-পনেরো বছর পর পর ত্বাগুত তার বাহিনী নিয়ে এসে কোন পরিশ্রম ব্যতিতই একটি সুপরিচিত নীতি (নখ-দন্ত অপসারণ নীতি) অনুযায়ী এসব ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে দলটিকে এমন অবস্থায় ছেড়ে যায় যে, দলটি এক অন্ধকার চক্রে ঘুরপাক খেতে থাকে। আবার শূন্য থেকে নতুনভাবে শুরু করতে হয়। কখনো কখনো আরও পেছন থেকে শুরু করতে হয়। আবার কখনো তো শুরুও করতে পারে না। উদাহরণ হিসাবে আমরা একটু তিউনিশিয়ার অবস্থা দেখে নিতে পারি।

তাগুতরা কারণে-অকারণে বা কোনো কোনো সময় কারণ তৈরি করে হলেও এই ‘নখ-দন্ত অপসারণ নীতি’ ব্যবহার করে থাকে। বিভিন্ন দেশে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। যুবকদেরকে তাগুতদের বড় কোন ক্ষতিসাধন করা ছাড়াই আত্মদানের দিকে টেনে নেয়া হচ্ছে। পুনরাবৃত্তির পূর্বেই বিষয়টি নিয়ে ভাবা উচিৎ আর তাগুতদেরকে পরিশ্রান্ত করার কাজটি কীভাবে সম্ভব হবে, অথচ প্রকৃতির স্বাভাবিক নীতি যা শরয়ী বিধানও বটে এর নিরিখে যুবকরা ওই কাজের জন্য প্রস্তুত নয়।

নখ-দন্ত অপসারণ নীতি

ত্বাগুতরা ইসলামী আন্দোলনগুলোকে সরাসরি মোকাবেলা করতে যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে এ নীতিটি তার একটি অংশ এবং প্রতি দশ-পনেরো বছর অন্তর অন্তর নিজ দেশে কারণে- অকারণে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে কারণ তৈরি করে হলেও ইসলামী আন্দোলনের উপর আক্রমণ করে থাকে এবং যাকে ইচ্ছা হত্যা করে, আর যাকে ইচ্ছা কারাবন্দী করে। অনেক মসজিদ-মিম্বর তালাবদ্ধ করে দেয় অথবা দাঈদেরকে মসজিদে দাওয়াতি কার্যক্রম চালাতে দেয় না। এসবের দ্বারা তারা ইসলামী আন্দোলনের গজানো দন্ত-নখর ছেটে ফেলতে চায়, যেন এই আন্দোলনগুলো তাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে সক্ষম না হয়। আর আন্দোলনগুলো এ ধরনের মসিবতে লিপ্ত থাকতে থাকতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক সময় পরীক্ষার মুখে তাঁরা এ অবস্থাকেই মেনে নেয়। আর তারা এই ইবতেলাকে (মসিবতে পতিত হওয়াকে) এমনভাবে বুঝে থাকে যা ইসলামের সঠিক অনুসারীগণের বোধ-উপলব্ধির বিপরীত। তাদের নিকট এর অর্থ হচ্ছে, শরিয়া নির্দেশিত পথে তুমি চলতে চলতে যদি তুমি তোমার লক্ষ্যের বিপরীত কোনো কিছুতে গিয়ে পৌঁছে যাও তবে তা তোমার জন্য পরীক্ষা... হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি’মাল ওয়াকীল...।

কাজেই যে কেউ এদের থেকে প্রকাশিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করলে এদের বিকৃতি এবং সুন্নাহ বিরোধী বিকৃত বোধ-উপলব্ধি পরিস্কার দেখতে পাবে। সুস্থ-স্বাভাবিক মানবিক মনে যে বিষয়গুলো উদয় হয় এবং যেগুলোকে স্বীকৃতি দেয় তারা সেগুলোকেও অস্বীকার করে।

তাদের এক নেতার একটি লেখা আমি পড়েছি যেখানে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং আফসোসের সাথে বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় অনেক উচ্চাভিলাসী এবং সক্ষম যুবকদের তিনি (তার বিবেচনায়) নিচু স্তরের কাজ করতে দেখেছেন। তার ভাষ্যমতে- তিনি চান যুবকরা তাদের জিহাদী প্রচেষ্টাকে প্রগতিশীল (?) করুক। তার ধারনা, দীর্ঘ সময়ের পরিকল্পনায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে কুফরের মোকাবেলা করা সম্ভব।

এজন্যই আমরা এসকল নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে যখন বলি যে, তারা উম্মাহর সমস্যাবলীকে ভুল জায়গা থেকে বিবেচনা করে থাকেন, আসলে তা-ই সঠিক। তিনি আমাদের কাছে যা কামনা করেন তা আসলে অস্বাভাবিক এবং অবিবেচনাপ্রসূত। বিবেচনা তো বলে এসকল প্রতিষ্ঠান কুফরের ছত্রছায়ায় তখনই বিকশিত হওয়া সম্ভব যখন তারা মনে করবে যে, এগুলো তারা দখলে নিতে পারবে এবং এগুলো তাদের পুঁজিতে রুপান্তরিত হবে। এ প্রেক্ষিতেই কুফফাররা কোনো ইসলামি প্রতিষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করে থাকে। কেহ সত্যই বলেছেন,

কোনো অবকাঠামো কখন পরিপূর্ণতায় পৌছে?

যখন তুমি গড় আর অন্যরা ভাঙ্গে।

সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ কী চমৎকার বুঝ দান করেছিলেন! তাঁরাই সুন্নাহকে সবচেয়ে ভালো বুঝতেন। জিহাদের আমলকে নিচু মানসিকতার কাজ হিসাবে উপস্থাপন করার মতো বিভ্রান্তিতে তাঁরা পতিত হননি।

এ ধরণের নেতা তো এ সকল যুবকদের সাথে কাজ করার, তাদের মাঝে ময়দানে নেমে তাদেরকে পরামর্শ দেয়ার, প্রশিক্ষণ দেয়ার, পরিচর্যা করার এবং তাদের সাথে থেকে জিহাদ করার কল্পনাও করতে পারে না। তিনি তো তার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মসজিদ কিংবা অফিসের ফ্যানের বাহিরে যাওয়ার কল্পনাও করেন না। মুজাহিদ দলগুলোতে যেন ইলম প্রসার লাভ করে এ নিয়তে বোমার আঘাতে একাংশ বিধ্বস্ত এমন মসজিদে দরস দেয়া অথবা হিজরত করা এসব তো তাঁর ধারণারও অতীত বিষয়। তার চেতনা অনুযায়ী তিনি শুধু চান প্রগতিশীল সংগ্রাম!

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসবে যখন সুস্পষ্ট শরয়ী নির্দেশাবলীর কাঠিন্যতার কারণে বিকল্প হিসাবে এসব প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো হয় বরং আফসোসের বিষয় হল, বিকল্প এনে (আসল কাজটিকে) শুধু উপেক্ষাই করা হয় না বরং কুফফারদের অনুগত কিছু খেয়ানতকারীরা তাদের প্রতিষ্ঠানের কর্মপন্থা অনুযায়ী ইসলামী জিহাদী আন্দোলনকারীদেরকে থামিয়ে দিতে দাঁড়িয়ে যায়।

অবশ্য তাওহীদ ও জিহাদী মানহাজের ভাইয়েরা দ্বীনের খেদমতের জন্য এ ধরনের দাওয়াতী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং এর প্রতি উৎসাহও প্রদান করেন। তবে তা তখনই যখন সেখানে হারাম বা শিরক মিশ্রিত মাধ্যম অবলম্বন করতে না হয় এবং এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড শরঈ তাকাযা মোতাবেক হয় ও পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়মে তা সময়োপযোগী উদ্যোগ হয়।

এ গবেষণাটির সকল পরিচ্ছেদ এবং আলোচনা থেকে এভাবে উপসংহারে আসা যায় যে, সালাফদের জিহাদী আন্দোলনগুলো -শরঈ নীতি ও প্রকৃতির স্বাভাবিক নীতির আলোকে- আল্লাহর দ্বীনকে বোঝার জন্য অন্য সকল আন্দোলন থেকে এগিয়ে আছে এবং ইনশাআল্লাহ এটিই প্রত্যাশার জায়গা। তবে মহান আল্লাহর সুন্নাহ তথা নীতি কারো পক্ষপাতিত্ব করে না। যেখানেই (কাঙ্খিত) ঈমান অর্জিত হবে সেখানেই বিজয় আসবে, আর যেখানেই কাঙ্খিত ঈমানের ঘাটতি থাকবে সেখানে (বিজয় না এলে) কেবল নিজেকেই দুষতে হবে। বর্তমানে উম্মাহ যে লাঞ্ছনাকর পরিস্থিতি পার করছে এ অবস্থায় ঈমানী গুরু দায়িত্ব হবে উম্মাহ থেকে সেই পরিস্থিতি দূর করা ও প্রতিহত করা। (সুতরাং আল্লাহর বান্দাগণ যখন প্রতিহতকরণ ও প্রতিরক্ষা করার ফরয কাজটি করবে এবং জিহাদ শুরু করবে তখন ইলাহী ওয়াদাও বাস্তবায়িত হতে থাকবে। কারণ, মুমিনের জীবনে তার কাজ এবং কাজের ফলাফল, এ দুটি জিনিস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ওয়াদার ক্ষেত্রে ওতপ্রোতভাবে থাকাটা ব্যাপক, তবে ধমকির ক্ষেত্রে এমন নয় অর্থাৎ ধমকির ক্ষেত্রে ‘ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকা’ টা ব্যাপক নয়। অতএব যখন ওয়াদার বিপরীত ফল দেখা যাবে (অর্থাৎ মুমিন হুকুম পালন করার পরও আল্লাহর তরফ থেকে সাহায্য না আসবে) তখন বুঝা যাবে ঘাটতিটা তার মাঝেই হয়েছে। (তার

ঈমান-আমলের ঘাটতির কারণেই সাহায্য আসছে না ) পবিত্রতা সেই সত্ত্বার যার শরয়ী নীতিগুলো প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যার প্রতিটি শরয়ী বিধান জীবন ও প্রকৃতির যে কোনো চিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সবশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই –যা পূর্বেও আমি ভূমিকায় বলেছি -, তা হলো, এ গবেষণাকর্মটি মূলত একটি ব্যাপক পরিকল্পনা। এখানে যা কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে তা মূলত গুরুত্ব বিবেচনা করেই করা হয়েছে , কিংবা যেসব দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে তা পাঠকের চিন্তা -চেতনাকে শানিত করার উদ্দেশ্যেই দেয়া হয়েছে। অনেকে তো এই ব্যাপক পরিকল্পনায় ভুল -ত্রুটিও খুঁজে বেড়াবেন , তাছাড়া মানুষ হিসেবে এতে ভুল থাকাও স্বাভাবিক। এজন্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যারা এ গবেষণাকর্মটি পূর্ণ করার সামর্থ রাখেন তাদের বিষয়টিতে নজর দেয়া উচিত। আর বিভিন্ন অঞ্চল ও দলের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন উমারাদের উচিত , এই বিস্তারিত পরিকল্পনাকে যাচাই বাছাই করে দেখা এবং বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে তাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলার কাছে কামনা , তিনি যেন আমাদেরকে ক্ষমা করেন , গুনাহসমূহ মাফ করেন। আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখেন এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন। আর উম্মাহর জন্য এমন হেদায়েতকে চূড়ান্ত করে দেন যেখানে তাঁর অনুগত বান্দারা হবে সম্মানিত এবং নাফরমানরা হবে লাঞ্ছিত। যেখানে থাকবে সৎকাজের আদেশ আর অসৎ কাজের নিষেধ। একমাত্র তিনিই এর যোগ্য এবং তিনিই তা করতে সক্ষম। আর সকল প্রশংসা তাঁরই।

**

## পঞ্চম অধ্যায়

## গুরুত্বপূর্ণ প্রাসংগিক কিছু প্রবন্ধ

### ১ম প্রবন্ধঃ ধৈর্য্যের লড়াই

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ

(আমি তোমাদের কতককে কতকের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে ? সূরা ফুরকান : ২০)

সকল প্রশংসা আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহর উপর।

"প্রকৃতপক্ষে বিজয় হচ্ছে আরও এক মুহূর্ত ধৈর্যধারণ করা। " এ বক্তব্যটি সংক্ষিপ্তভাবে বুঝিয়ে দেয় যে , শত্রুর বিরুদ্ধে যে কোন যুদ্ধে বিজয়ের পথ হচ্ছে ধৈর্যধারন করা। একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যায়। একটু কল্পনা করুন যে , আপনার একটি আঙ্গুল আপনার প্রতিপক্ষ কামড় দিয়ে ধরেছে এবং আপনি প্রতিপক্ষের আঙ্গুল কামড় দিয়ে ধরেছেন। যে প্রথম চিৎকার করবে সে পরাজিত হবে। ব্যাপারটি এমন হল যে , আপনি প্রথম চিৎকার করে উঠলেন , আপনার প্রতিপক্ষ বিজয়ী হয়ে আপনাকে বলল, "তুমি যদি আর এক মুহুর্ত ধৈর্য ধারন করতে তবে আমি তোমার পূর্বেই চিৎকার করে উঠতাম এবং তোমার আঙ্গুল থেকে কামড় ছেড়ে দিতাম। তাহলে তুমিই বিজয়ী হতে"।

রাশিয়া যেদিন যে মুহুর্তে আফগানিস্তান থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয় সেদিন আফগানদের তুলনায় তাদের অস্ত্র কম ছিলো না। বরং অস্ত্রের সংখ্যা, ধরণ উভয়দিক থেকেই তাদের চেয়ে বহুগুণ বেশি ছিলো। এমনিভাবে সক্ষমতা ও সংখ্যা বিচারে রাশিয়ার প্রশিক্ষিত সৈন্য সংখ্যাও বহুগুণ বেশি বৈ কম ছিলো না।

এমনিভাবে ইসলামের প্রাথমিক বিজয়গুলোতে রোম সাম্রাজ্য যখন মিশর ও সিরিয় অঞ্চল থেকে তার সৈন্য সরিয়ে নেয় তখনও তারা সৈন্য সংখ্যা, প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা সকল বিচারে মুসলিমদের তুলনায় অনেক বেশিই ছিলো। কি হয়েছিলো তখন? তাদের পরাজয়ের কারণ কি ছিলো?

কখনো কখনো এ সকল অবস্থায় এমন কিছু ব্যাপার ঘটে থাকে যা একজন সামরিক বিশ্লেষকের পক্ষে একদিন পূর্বেও বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না।

এমন কিছু ঘটেছিল যাকে সমরশাস্ত্রে বলা হয়, যুদ্ধাভিলাসী মনোভাবের পতন।

[যুদ্ধাভিলাসী মনোভাবে ধ্বস]

যুদ্ধাভিলাসী মনোভাবে ধ্বস দুইভাবে আসতে পারে। এক। প্রত্যাহারকারী পক্ষ যখন বিবেচনা করে দেখে যে- যুদ্ধে যা অর্জিত হচ্ছে এর চেয়ে উপাদানগত ও মনোবলগত ক্ষতির পরিমাণ বেশি তখন তারা যুদ্ধ থেকে সরে আসে। দুই। প্রত্যাহারকারীদের ধৈর্য ফুড়িয়ে গেলে। আমরা চাইলে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির অন্তর্ভূক্ত করে দিতে পারি। (কারণ প্রথম প্রকারেও এক পর্যায়ে গিয়ে ধৈর্যচ্যূতি ঘটে) তাহলে আমরা এভাবে বলতে পারি, যুদ্ধবিদ্ধস্ত হয়ে কোন এক পক্ষের ধৈর্যচ্যূতি ঘটার মাধ্যমে যুদ্ধাভিলাসী মনোভাবের পতন ঘটে।

এ প্রবন্ধে আমরা দেখাবো যে, শত্রুরা আমাদের ধৈর্য দ্রুত নিঃশেষ করে দিতে কীভাবে কাজ করে থাকে এবং তাদের ধৈর্য দ্রুত নিঃশেষ করে দিতে আমাদের কী করা উচিৎ?

এ প্রশ্নের জবাবে যা থাকবে তা হলো, আমাদের ধৈর্য নিঃশেষকরণ তরান্বিত করতে শত্রুরা গুরুত্বপূর্ণ কী কী পদক্ষেপ নিয়ে থাকে এবং তাদের ধৈর্য নিঃশেষকরণ তরান্বিত করতে আমাদের চাবিকাঠি কী? আমাদের করনীয় হচ্ছে, তারা যে পদক্ষেপ নিবে তা বাধাগ্রস্ত করা। বিভিন্ন কারণে (যা সামনে আসছে) এটাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিচে যেসব বিষয়কে বিবেচনা করা হয়েছে তন্মধ্যে এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এমনিভাবে আমাদেরও উচিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে কিছু তড়িৎ কার্যক্রম হাতে নেওয়া।

[ওদের ধৈর্য্য কম, প্রলম্বিত যুদ্ধ ভয় পায়]

শুরুতেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করবো। ত্বাগুতী বাহিনীর একটি চরিত্র হল, তারা ধারাবাহিকভাবে লম্বা সময় ধরে চাপ ও হুমকির মাঝে থাকতে পারে না। ফলে এই একটি কারণে (যদিও তা সম্পূর্ণ কারণ নয়) শুরুতেই ইসলামী আন্দোলনকে (একনাগাড়ে) ধারাবাহিক হামলার মাধ্যমে মূলোৎপাটন করে ফেলবে- এমন উৎসাহ তারা বোধ করে না। বরং তারা ধাপে ধাপে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর আন্দোলনকে আঘাত করার ইচ্ছা করে। আর মাঝখানের সময়গুলোতে এমন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে যেন দ্রুত এটি শেষ করা যায়। কারণ তারা জানে, তাদের সৈন্য সংখ্যা ও যুদ্ধ সামগ্রী যত বেশিই হোক না কেন দীর্ঘ সময় যুদ্ধের ধৈর্য তাদের নেই।

আর যে বিষয়টি যুদ্ধের সময়কালকে আরও দীর্ঘায়িত করে এবং শত্রুকে কঠিন চাপে ফেলে তা হচ্ছে, ‘বিপুল সংখ্যক শত্রুসেনা নিহত হওয়া’। এর ফলে প্রথমতঃ শত্রু পক্ষকে বারবার নিজেদের পদক্ষেপগুলো পর্যালোচনা করে দেখতে হয়, যা যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করে।

দ্বিতীয়তঃ সাধারণ সৈনিক এবং কমান্ডার উভয়ের উপরই মানসিকভাবে খারাপ প্রভাব পড়ে। ফলে তারা দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে না। তখন সৈনিক অফিসার উভয়েই অস্থিরতায় ভুগে অথবা কমান্ড অমান্য করা শুরু করে অথবা পলায়ন করে। ফলে ত্বাগুতরা তাদেরকে প্রত্যাহার শুরু করে এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে রাখে। আর যদি প্রস্থান না করে থাকে তবে প্রস্থান করার মতো সাহস থাকে, সেক্ষেত্রে সংঘাত এড়িয়ে যুদ্ধের সময়কালকে প্রলম্বিত করতে শুরু করে। অথচ সে জানে, এটি মুজাহিদীনকে সামরিকদিকে আরও বিন্যস্ত হতে এবং সক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করবে। তবুও এ আশায় সে এ পথ বেছে নেয় যে, অচিরেই সে ভেতরে ও বাহিরে সক্ষমতা বাড়াতে পারবে। আর একেবারে খারাপ পরিস্থিতিতে গিয়েই সে এমনটা করে, যাতে করে যাবার আগে সম্পদের এক বিরাট অংশ লুন্ঠন করতে পারে অথবা তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশে দীর্ঘ সময় টিকে থাকার জন্যই এমন কাজ করে; সেক্ষেত্রে তারা নিজেদের তরফ থেকে এর কোনো বিকল্প নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ পাবে বা অন্য যে কোনো বিকল্পে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাবে।

ফলে আমরা বলতে পারি যে, ত্বাগুতরা চায়, এক। যথাসম্ভব যুদ্ধ সংক্ষিপ্ত করতে। দুই। যথাসম্ভব হতাহতের সংখ্যা কমাতে। কারণ তারা জানে যে, এটি তাদের সৈনিকদের মনোবল ভেঙ্গে দিবে এবং যুদ্ধ প্রলম্বিত হওয়ার কারণ হবে।

[শত্রুর হাতিয়ার, নারকীয় কারাগার]

এ দু’টি লক্ষ্য অর্জনে শত্রুরা একটি নিকৃষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনাটি এমন, শুরুতে যথাসম্ভব রক্তপাত এড়িয়ে যুবকদেরকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করে এবং এমন চিত্র ফুটিয়ে তুলে যে, ধর-পাকড়ের সময় যারা প্রতিরোধ গড়বে না তাদেরকে কোনো নির্যাতন করা হবে না। ওরা মূলত কেউ প্রতিরোধ গড়ুক সেটা চায় না। আর ধর-পাকড়ের প্রথমদিকে যতদিন পর্যন্ত যুবকদের একটি বড় অংশ কারাগারের বাইরে থাকে ততদিন কারাঅভ্যন্তরে হালকা পর্যায়ের চাপ প্রয়োগ চলতে থাকে। তবে অল্পকিছু ভাই যাদের সাথে তাদের উদ্দেশ্য জড়িত তাদের উপর চাপ ও নির্যাতন চলে তীব্র মাত্রায়। তারপর যখন যুবকদের বড় অংশই কারাবন্দি হয়ে যায় তখন কারাঅভ্যন্তরে সকল ভাইদের উপর ব্যাপকভাবে চাপ প্রয়োগ ও নির্যাতন চলতে থাকে। পাশাপাশি কারাগারের বাহিরে থাকা তাদের আত্মীয়-স্বজনের উপরও চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। তখন কারাগারকে তারা জাহান্নামে পরিণত করে। এবং প্রায়ই দেখা সাক্ষাতে বাধা দেয়। বন্দীদের আত্মীয়-স্বজনদেরকে কারা সহায়তা করে তা অনুসরণ করা হয়। পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠে। লোকজন তখন এমন বেশ কিছু ঘটনা দেখার পর তাদের আত্মীয়-স্বজনদেরকে মুজাহিদীনের দলে যোগ দেয়া অথবা তাদেরকে সহযোগিতা করতে নিষেধ করতে শুরু করে। মুজাহিদীনের অবস্থার অবনতি হতে থাকে। এ স্তরে ত্বাগুতরা তাদের কৌশলে পরিবর্তন আনে। মিডিয়ায় নতুন কৌশল সম্পর্কে ঘোষণা দেয়ার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর ‘কম রক্তপাত বেশি গ্রেফতার’ নীতি পরিবর্তন করে ‘বিনাশ সাধন ও মূলোৎপাটন’ নীতি অবলম্বন করে। তখন আকস্মিকভাবে হত্যা অভিযান শুরু হয়। এখানেই যুদ্ধ সমাপ্তির দিকে যেতে থাকে এবং কারাঅভ্যন্তরের যুবকদের ধৈর্য নিঃশেষ হতে শুরু হবার পর মুজাহিদীনের ধৈর্যও নিঃশেষ হতে শুরু করে (আল্লাহ এমনটি না করুন)।

[শত্রুদের আরেকটি কৌশল - সৈন্য সমাগম]

অনুরূপভাবে আরেকটি কৌশল যা শত্রুরা অনুসরণ করে তা হলো ‘সৈন্য সমাগমের কৌশল’।

এটা এভাবে যে, তারা যখন কিছু শহর ও অঞ্চল শান্ত করতে চায়, তখন সেসব অঞ্চলের সেনাবাহিনীর সহযোগিতায়ই তারা এক বা একাধিক অঞ্চলে নিজেদের সৈন্যসামন্ত, রসদ ইত্যাদি জড়ো করতে থাকে এবং সেখানে প্রচুর পরিমাণে ধরপাকড় ও বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করতে থাকে। এই জড়োকরণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে ততদিন পর্যন্ত যতদিন না তাদের সেনাবাহিনী এই ভেবে আশ্বস্ত হয় যে, মুজাহিদীনের চেয়ে তাদের সংখ্যা বহু

বহুগুণ বেশি। এরপর সে অঞ্চলে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে অন্যান্য স্বাভাবিক অঞ্চলগুলোতে তাদের শক্তি স্থানান্তর করতে থাকে।

জিহাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মিশরের কুলাঙ্গার সরকারের তরফ থেকে যতগুলো অভিযান পরিচালিত হয়েছিল প্রায় সবগুলোতেই এসব কৌশল অবলম্বন করা হয়। নব্বই এর দশকের শুরুর দিকে তারা বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনগুলোর উপর সাধারণ মাত্রায় এবং জিহাদী আন্দোলনের উপর বিশেষ মাত্রায় আঘাত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। আশির দশকের শুরুতে আনোয়ার সাদাতের হত্যার পর পরবর্তী দশ বছরে জিহাদী আন্দোলনের উত্থান ঘটে। জিহাদী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল আনোয়ার সাদাতের হত্যার পূর্বেই। আর এর সমাপ্তি ঘটে হত্যা পরবর্তী মামলা মোকাদ্দমার পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে।

মোটকথা, যখন তারা এ অভিযান শুরু করে তখন তাদের উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত এটি শেষ করা। কিন্তু ‘আল-জামাআতুল ইসলামিয়্যাহ’ তৎকালীন পার্লামেন্টের স্পীকার মাহজুবকে হত্যার মাধ্যমে এর কঠোর জবাব দেয়। ফলে মিশর সরকার অভিযান দু’বছরের জন্য পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়। তখন ‘আল-জামাআতুল ইসলামিয়্যাহ’ সরকারের দ্বিধা-দন্দ্বকে কাজে না লাগিয়ে সরকারকে তার তাস গুছিয়ে নেয়ার পূর্ণ সুযোগ করে দেয়। মুজাহিদীনের জামাত এ দু’বছরে সরকারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে কালক্ষেপণ করে। অথচ খুব বেশি হলে এক বছরের মাঝেই তাদের জন্য সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব ছিলো। কিন্তু যখন মুজাহিদীন শুরু করলো ততদিনে সরকার তার শক্তি সঞ্চয় করে ফেলেছে। এমনকি বিভিন্ন শহরে এবং জেলায় যেখানেই ‘আল-জামাআতুল ইসলামিয়্যা’র ঘাঁটি ছিল একেরপর এক তারা সেগুলো গুড়িয়ে দিয়েছে। এমনটি ঘটেছে দলটির কিছু নেতৃবৃন্দের চিন্তা-চেতনার কারণে, যারা শুরু থেকেই আলোচনার প্রতি বেশি মনযোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, কয়েকশত সৈন্য এবং কিছু নেতৃবৃন্দকে হত্যা করলেই মোবারকের সরকার নতি স্বীকার করে আলোচনায় বসবে। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, এ সকল সরকার কতজন সৈন্য নিহত হল তার কোনো পরোয়াই করে না, যতক্ষণ না সৈন্যরা ভয়ে পালাতে শুরু করে। আর পলায়ন তখনই শুরু হয় যখন বিপুল সংখ্যককে হত্যা করা হয়, সাথে সাথে যথেষ্ট পরিমাণ প্রচারণা চালানো হয় এবং পর্যাপ্ত মিডিয়া সমর্থন পাওয়া যায়।

পরবর্তীতে যখন সরকার আলোচনায় বসতে রাজি হয় তখন তুরুপের সকল তাসই সরকারের হাতে ছিল। (বিপুল সংখ্যক মুজাহিদীন কারাবন্দী) ফলে তার পক্ষে শর্তারোপ করা সহজ। যার হাতে তুরুপের তাস বেশি থাকে সেই শর্তারোপ করে থাকে। তখন অপর পক্ষকে স্বভাবতই ছাড় দিতে হয়। এতো গেল একটি দিক, তাছাড়া এর ফলে মূলত আমাদের তরফ থেকে মুরতাদের সাথে আলোচনার বৈধতা প্রমাণিত হয়। বিশেষত যখন এই আলোচনা তাকে মেনে নেয়ার এবং রিদ্দাহ‘র (ধর্মহীনতার) উপর ছেড়ে রাখার দিকে নিয়ে যায়।

অপরদিকে এ জামাতটি মূলত সরকারের সাথে লড়াই করার কোনো সিদ্ধান্তই নেয়নি। যেহেতু তাঁদের পলিসি ছিল, আন্দোলনের পূর্বে দীর্ঘকাল উপাদানগত প্রস্তুতি চালিয়ে যাওয়ার। (অবশ্য পরবর্তীতে এই নীতি বিপর্যয় ডেকে আনায় জিহাদী আন্দোলনের পরিকল্পনা থেকে তা বাদ দেয়া হয়েছে এবং এর পরিবর্তে অন্যান্য কিছু নীতি ও পলিসি নির্ধারণ করা হয়েছে।)

তখন নিরাপত্তা সংক্রান্ত ভুলের কারণে কমপক্ষে অর্ধেক সেল প্রকাশিত হওয়ায় জিহাদী দলটি বিস্মিত হয়। এগুলো এমন কিছু ভুল ছিল যেগুলোর কারণে সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রভাব কাটিয়ে উঠা এমন সরকারের অধিনে থেকে বেশ কঠিন ছিল যারা এলোমেলো ভাবে অবদান রাখার নীতি অনুসরণ করে। বিশেষত যখন জামাতটি তখনও পর্যন্ত মোকাবেলা করার সিদ্ধান্তই নেয়নি।

যদিও এ জামাতের অবকাঠামোতে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে, এমনকি তাঁরা তাদের কার্যক্রম একটা সময় পর্যন্ত স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছে, তথাপি দলটির নেতৃবৃন্দের দৃঢ়তা এবং যা কিছু ঘটেছে তা নিরসনে তাদের গৃহিত পদক্ষেপ আল্লাহর অনুগ্রহে এখনও

পর্যন্ত সরকার ও তার নেতৃবৃন্দের জন্য গলার কাঁটা হয়ে দলকে টিকিয়ে রেখেছে। ফলে সরকার দলটির মূলোৎপাটন করে নিজে রাজনৈতিকভাবে পূর্ণতা অর্জন করবে এমন সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। তাই এখনো পর্যন্ত এ জামাতটির মূলোৎপাটন তাদের অধরাই রয়ে গেছে।

[‘আল-জামাআতুল ইসলামিয়্যাহ’র পরাজয়ের কারণ]

‘আল-জামাআতুল ইসলামিয়্যাহ’র পরাজয়ের কারণ হচ্ছে, এর নেতৃবৃন্দের সামরিক কৌশল সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা ছিল না। দাওয়াতি শাখার বিশিষ্ট চার পাঁচজন ব্যক্তিকে মিশর সরকার প্রকাশ্যে অপদস্থ করে এবং গ্রেফতার করে এবং এ কাজগুলোকে তারা ওই দলের কর্মীদের ধৈর্য নিঃশেষকরণের তাস হিসাবে ব্যবহার করে। দীর্ঘ একটা সময় ধরে এগুলো ঘটতে থাকে কিন্তু দলের নেতৃবৃন্দ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এসবের বিপরীতে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়নি। এদিকে তাদের চেতনায় ধ্বস নামে এবং তারা সিদ্ধান্তহীনতায় পতিত হয়। কারণ, তাঁরা নিজেদের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে শরীয়া বহির্ভূত পন্থা অবলম্বন করার পাশাপাশি সামরিক দিক দিয়ে পরাজয়েরও স্বীকার হয়। ঘটনার শেকড় অনেক গভীরে বিধায় এর বিশ্লেষণে অনেক দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন।

আমার বুঝে আসে না, জিহাদী জামাআতের সাথে যা ঘটেছে তার জন্য মূর্খরা কীভাবে জিহাদ করাটাকে কারণ হিসাবে দাঁড় করায়। অথচ যা ঘটেছে তার অধিকাংশই মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই ঘটেছে।

মূল আলোচনায় ফিরে আসি

শত্রুদের ধৈর্যের অবসান ঘটাতে এবং তাদের উপরোক্ত দু’টি লক্ষ্য ও নানান কৌশল ব্যর্থ করতে আমাদের কী করা উচিৎ? শত্রুদের মতো সক্ষমতা যদি আমাদের থাকতো তবে শুরুতেই আমরা এ যুদ্ধ শেষ করে দিতে পারতাম। কারণ আমাদের সৈনিকরা রক্ত এবং মৃত্যুকে ভয় পায় না, তাঁরা বরং এগুলোর খোঁজে থাকে। কিন্তু আমাদের কাছে এমন সক্ষমতা নেই। তাছাড়া এটিই হচ্ছে আল্লাহর সুন্নাহ তথা চিরাচরিত নীতি। কাজেই পূর্বের সকল ঘটনার আলোকে আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে শত্রু যেসব লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে চায় সেগুলোতে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে এবং শক্তিশালী ও বিধ্বংসী আক্রমণ পরিচালনার মাধ্যমে যুদ্ধকে প্রলম্বিত করা। শুরুতে -আমাদের সম্ভাব্য সামর্থ্য অনুযায়ী- আকস্মিক সাধারণ হামলার চেয়েও অধিক মনোনিবেশ করতে হবে সেসব হামলার প্রতি যেগুলোর মাধ্যমে সমুচিত জবাব দিয়ে তাদের লক্ষ্য ব্যাহত করা যাবে। কিছুকাল পর যখন আমরা সফল হবো তখন তাদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র সাধারণ আকস্মিক হামলা চলতে থাকবে। কারণ, পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের আলোকে বলা যায় তখন যুদ্ধ দ্বিতীয় ধাপে উপনীত হবে। দ্বিতীয় ধাপে আমাদের প্রতিরোধ অভিযান চলতে থাকবে। এক পর্যায়ে আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা পরবর্তী ধাপে উপনীত হবো অর্থাৎ শত্রুর পতন ঘটাবো।

সুতরাং শত্রুর ‘সৈন্য সমাগম নীতি’ অকার্যকর করতে আমাদের উচিৎ যথাসম্ভব ভূখন্ডের বিস্তৃত অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করা। এভাবে শুরুতে শত্রুদের পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তারা সম্ভাব্য সর্বাধিক ভূখন্ডজুড়ে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হবে।

[গ্রেফতার এড়ানোর জন্য আমাদেরকে যা যা করতে হবে]

নিম্নবর্ণিত কাজগুলোর মাধ্যমে শত্রুদেরকে আমাদের ভাইদের একটি বড় অংশকে কারাবন্দী করা থেকে বিরত রাখতে হবে, যেন চাপ প্রয়োগের খেলায় শত্রুর হাতে বেশি তাস না থাকে,

১। যথাসম্ভব নিরাপত্তা ঘাটতিগুলো অপনোদন করতে হবে এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়মগুলোকে সুক্ষ্মভাবে কার্যকর করতে হবে। ভাইদের মাঝে (নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অবহেলা জনিত) কিছু ঘটনাও প্রচলিত রয়েছে। যেমন, এক ভাই নিজের সঙ্গে কিছু সিডি এবং কাগজপত্র নিয়ে একটি এ্যাম্বুশে ছিলেন। এ্যাম্বুশে যেন কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন না হতে হয় তাই তাঁর প্রতি নির্দেশনা ছিল তিনি যেন ওগুলো নষ্ট করে ফেলেন। যাই হোক, হয়তো কোন কারণে তিনি তা সংরক্ষণ করছিলেন। পরিস্থিতি নিরাপদ হওয়া পর্যন্ত তিনি দু’আ এবং আযকারের আমল করছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ, অবশ্যই আমরা এ সকল ঘটনাবলীর সত্যতা নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করি। তবে আমাদের জানা থাকা দরকার যে, তিনি যা করেছিলেন তা অবশ্যই অপরাধ। তিনি নির্দেশনা অমান্য করেছিলেন। তিনি নিজেকে এবং তাঁকে চিনেন এমন একদল ভাইদেরকে বিপদে নিক্ষেপ করছিলেন। তাঁর এ অপরাধের সাথে অন্য আরও অপরাধ মিলে এমন অবস্থার অবতারণা করে যে, তখন আর আযকারেও কাজ হয় না। তেমনিভাবে নিরাপত্তা ত্রুটির আরেকটি ক্ষেত্র হচ্ছে, যা আপনার সাথে সম্পৃক্ত নয় তা জানতে চেষ্টা করা। নিরাপত্তা ত্রুটির এমন আরও অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। সুতরাং সবগুলোকে খুঁজে বের করে অপনোদন করতে হবে।

২। দ্বিতীয় যে পদ্ধতিটি তাদের সেই কৌশলকে ব্যর্থ করে দিবে তা হলো- তাদের গ্রেফতার অভিযানকে জাহান্নামে রূপান্তরিত করতে হবে এবং তাতে শত্রুর শক্তি- সামর্থের বিরাট ক্ষতিসাধন করতে হবে। রক্ত ও অর্থের মাধ্যমে যেন চড়া মূল্য দিতে হয় ও (পরবর্তী) প্রস্তুতির জন্য যেন তাকে দীর্ঘ সময় নিতে হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে। বরং কোনো অভিযানে যদি আমাদের ভাইরা আটক হয়ে যায় বা নিহত হয়, তাহলে খুব দ্রুত এমন পাল্টা আঘাত করতে হবে যেন এর মূল্য চুকে যায় এবং পরে তারা ভয়ে নিবৃত্ত হয়। সাথে সাথে মিডিয়ায় জানিয়ে দিতে হবে যে, এই আক্রমণ অমুক ভাইকে গ্রেফতার বা হত্যার বদলা হিসাবে করা হয়েছে।

প্রথমদিকে নিজেদের কিংবা ক্রুসেডার শত্রুদের শক্তি বিবেচনায় অল্পকিছু আকস্মিক আক্রমণ করা, যা দ্বারা মিডিয়ায় ঘোষণা দেয়া যায় যে, এগুলো হচ্ছে তাদের গ্রেফতারী অভিযান এবং কারাগারে তারা যা করছে তার জবাব এবং আমরা ক্রুসেডার নেতাদেরকে টার্গেট করে কঠিন আক্রমণ করতে থাকবো। আমরা এ কথা স্পষ্ট করে দেব যে, আমরা এসব তাগুতকে টার্গেট বানানো থেকে কিছুতেই বিরত হবো না, বরং তাদের এসকল কার্যক্রম আমাদেরকে আরও মারাত্মক ধরণের আক্রমণ করতে বাধ্য করে তুলবে।

সম্ভবত, এ পর্যন্ত যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো জাযীরাতুল আরবে আমাদের ভাইয়েরা অনুসরণ করেছেন। আল্লাহর কাছে তাদের কার্যক্রমের দৃঢ়তা এবং হেদায়েতের পথে অবিচলতা কামনা করি।

[বস্তুবাদী বিশ্বাসের লড়াই]

এখানে আরও একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, তা হল- কুফফার এবং মুরতাদদের কাছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লড়াইটি হচ্ছে দুনিয়াবি বস্তুবাদী বিশ্বাসের লড়াই। তাদের কিছু পার্থিব উদ্দেশ্য রয়েছে যেগুলোকে তারা তাদের কিছু ধর্মীয় রীতি ও প্রথাগত মিথ্যা সংস্কৃতির পেছনে আড়াল করে রাখে। শুধুমাত্র এই প্রথাগত বিশ্বাসের কারণেই তারা যুদ্ধ করছে এমন নয়, বরং যেসব বিষয় তাদেরকে এবং তাদের মূর্খ অনুসারীদেরকে যুদ্ধের প্রতি প্রেরণা যোগাচ্ছে এটি সেসব কারণের একটি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে বস্তুগত স্বার্থ এবং বেঁচে থাকার তাগিদই তাদেরকে (লড়াই করার জন্য) মূল প্রেরণা যোগায়। তারা এসবের জন্যই লড়াই করে। শুধু বেঁচে থাকার জন্যই নয় বরং বেঁচে থাকার ধরণ অর্থাৎ বিলাসিতা, সৌখিনতা এবং প্রতিবন্ধকতাহীন উন্নত জীবনযাত্রার নিশ্চয়তার জন্য। তাদের জোট এবং সহযোগীরা এক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করে এবং যতক্ষণ তাদের নিজস্ব স্বার্থ সেই জোটের দ্বারা পূর্ণ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের সমর্থন করে চলে। সুতরাং আমাদেরকে কার্যকরভাবে এগুলো থামিয়ে দিতে হবে।

সংঘাতকে দীর্ঘায়িত করা এবং শক্তিশালী আক্রমণ করার সক্ষমতা তৈরি করা এগুলো স্বভাবতই শত্রুকে তার নিজের পক্ষ থেকে সমঝোতার দিকে ধাবিত করে। মিডিয়ার ভালো সমর্থন নিয়ে -যেমনটা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি - তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থে আক্রমণ পরিচালনা করা এবং তাদের সহায়তাকারীদের অর্থনৈতিক স্বার্থ ও বিলাসবহুল জীবনকে হুমকির সম্মুখীন করা, এসব কর্মকান্ড শত্রুকে তার স্বার্থ রক্ষার্থে গুটিয়ে নিতে বাধ্য করে। এ ধরণের প্রতিরোধকারী আক্রমণ তাদের সৈন্যদেরকে ভাবতে বাধ্য করে যে, তাদের নেতৃবৃন্দের অধীনে যুদ্ধ তাদের জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান করে না, এভাবে তো তারা 'কিছুই না' এর জন্য মৃত্যুবরণ করবে। আর তখনই পক্ষ পরিবর্তনের ভাবনা শুরু হবে বা কমপক্ষে পলায়ন করে গিয়ে (পরবর্তীতে) অবস্থা পরিবর্তন হওয়ার অপেক্ষায় থাকবে।

এজন্যই আমরা দেখেছি যে, এ দাওয়াতের বিপক্ষে সবচেয়ে বেশি শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব রাখা সৈনিকেরা পরবর্তীতে আন্তরিক মুজাহিদ হয়ে উঠে, তাদের জীবনকে এ পথে পেশ করে থাকে। আল্লাহর ইচ্ছায় আসন্ন প্রবন্ধগুলোতে এ ব্যাপারে কিছু আলোচনা করবো।

সারকথা

সঠিক কর্মকৌশল প্রয়োগ করে যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরি করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যেন যুদ্ধের দীর্ঘসূত্রিতা শত্রুর জন্য যতটুকু বিপদের কারণ হবে আমাদের জন্য তার চেয়ে বড় বিপদের কারণ না হয়। এমন হলে শত্রুদের ধৈর্য নিঃশেষ হওয়ার পূর্বেই আমাদের ধৈর্য নিঃশেষ হয়ে যাবে।

বদর যুদ্ধের একটি ঘটনা দিয়ে প্রবন্ধটি শেষ করছি, মক্কার মুশরিকরা যখন উমাইর বিন ওয়াহাব আল জুমাহীকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর হিসাবে প্রেরণ করল তখন তিনি স্বল্পসংখ্যক মুসলিমদের কোন গুপ্ত আশ্রয়স্থল কিংবা (কোথাও থেকে) কোন সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, এ কথা নিশ্চিত হয়ে ফিরে এসে বলেছিলেন, আমি তাদের মাঝে কম-বেশি তিনশজন পুরুষ দেখেছি, তবে হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি মৃত্যুবাহী বিপদ দেখেছি, ইয়াসরিবের (মদিনার) উটগুলোকে দেখেছি, যেন ভয়ানক মৃত্যুকে বহন করে নিয়ে এসেছে, তারা এমন কিছু মানুষ তলোয়ারই যাদের একমাত্র ক্ষমতা ও আশ্রয়স্থল। আল্লাহর শপথ, আমি যা দেখেছি তা হল, তাদের প্রত্যেকে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তোমাদের কাউকে হত্যা করে। সুতরাং তারা যদি তোমাদের মধ্য হতে তাদের সমসংখ্যক লোককেও হত্যা করতে পারে তবে জীবনের কী আর অবশিষ্ট থাকবে? সুতরাং তোমরা তোমাদের সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনা করে দেখ!

এ ঘটনা থেকে আমরা যে শিক্ষা লাভ করতে পারি তা হল, সত্যিই আমরা যদি শত্রুকে এভাবে ভাবতে বাধ্য করতে পারি বরং এটিকে আরও শক্তিশালী করতে পারি যেমনটি আমাদের পূর্বসূরীগণ তাদের সময়ে করেছিলেন, তবে আল্লাহর ইচ্ছায় এটিই হবে তাদের পরাজয়ের সূচনা।

কুরাইশদের শিবিরে এ জাতীয় কথাগুলোর প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছিল তা বুঝার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত গ্রন্থগুলো দেখা যেতে পারে।

শত্রুদের এ উপলব্ধিটাই আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের ধৈর্যকে দ্রুত নিঃশেষকরণের প্রথম কারণ হয়। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ হচ্ছে মূলত 'ধৈর্যের যুদ্ধ'।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ الحديد : ١٦

আলোকিত হয়েছিলেন তাঁরা আবির্ভাবকালীন কুফরের কর্তৃত্বের কষ্ট মোকাবেলা করেছেন। আর যারা মদীনায় হেদায়েত পেয়েছিলেন তাঁরা জিহাদের ও তরবারির ঝলকের কষ্ট মোকাবেলা করেছেন।

এ পর্বে আমি কারাগার ও নির্যাতনের পরীক্ষা এবং জিহাদ ও তরবারীর ঝলকের পরীক্ষার মাঝে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করবো। এমনিভাবে মানব আত্মার অবস্থা, এর ধৈর্যের পরিমাণ এবং কী পরিমাণ কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা তার আছে তা নিয়ে আলোচনা করবো।

কিছু লোক আছে যারা বলে যে, "জিহাদের পূর্বে জেল, জুলুম, নির্যাতনের স্তর উন্নিত হওয়া নেহায়েত গুরুত্বপূর্ণ"। এ শ্রেনীর লোক আবার কয়েক ধরণের। একদল এ বিষয়ে এতটাই বাড়াবাড়ি করে যে, তাঁরা তাদের অনুসারীদেরকে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করা, কষ্ট সহ্য করা এবং বাস্তব কোনো চেষ্টা-তদবীর না চালিয়েই কারাগার থেকে মুক্তিলাভের ব্যাপারে অপেক্ষা করার উপদেশ দিয়ে থাকেন। যারা এমন বলেন তাদের কারো লেখা আমি নিজে না পড়লে বিশ্বাসই করতাম না যে, এ ধরনের মানুষও পৃথিবীতে আছে।

তবে এ বিষয়ে মধ্যমপন্থার বক্তব্য প্রদান করে এমন দলও রয়েছে, যারা বলিষ্ঠভাবে বাতিলের সামনে হক তুলে ধরে থাকে, বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে, সশস্ত্র আনসার সংগ্রহ করে, কারাগার ও নির্যাতনকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নেয় না। তবে যদি তা এসে যায় তখন ধৈর্য ধারণ করে এবং এটাকে ব্যক্তির জন্য শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করে।

আর তৃতীয় একদল রয়েছে যারা এ ব্যাপারে বেশ শিথিলতা করে থাকে। তারা নিজেদেরকে সব কিছু থেকে দূরে রাখে, যেমন বাতিলের সামনে স্পষ্ট হক বলা অথবা বাহ্যিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা, যা শেষ পর্যন্ত সমস্যার দিকেই নিয়ে যায়। তবে এসকল লোকেরা মানুষের সামনে গর্বভরে চলতে ভুলে না, এ ধরনের ব্যক্তিরা বেশিরভাগ সময় এ বলে চিৎকার চেচামেচি করে থাকে যে, তারা এখন মক্কী ধাপ এবং ধৈর্যের ধাপে রয়েছে! আমি জানি না, তারা মাক্কী ধাপের কথা বলে (জিহাদ ও জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা ছাড়া) ইসলামের আর কোন কোন বিধান ছেড়ে দিয়েছে? এ দলের লোকদের পথ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাক্কী ধাপের বিপরীত। এটি আসলে চাটুকারিতা, সহাবস্থান ও সংশয়ের মধ্যে থাকা। অবস্থান করা। - -

সারকথা

যা বলতে চাই তা হচ্ছে, উপরোক্ত তিনটি শ্রেনীই –অবস্থার ভিন্নতা সহকারেই - নিশ্চিতভাবে কুফর ও কুফফারদের প্রভাব ও আধিপত্যের নিচে ফেতনাগ্রস্ত। তারা যে সমাজে বসবাস করছে সে সমাজের সামাজিক আন্দোলনের উপর সেসব কুফফার গোষ্ঠীর বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

আমরা এই তিনো শ্রেনীকে -যাদের মধ্যে মধ্যপন্থী (মু'তাদিল) শ্রেনীটিও রয়েছে - এই বলে সতর্ক করতে চাই যে, দীর্ঘকাল যাবত জালিমদের অধিনস্ত হয়ে ফিতনার মধ্যে পড়ে থাকলে অনুসারীরা ধীরে ধীরে দল ত্যাগ করতে থাকে। [23] মানব মন যেহেতু নিষ্পাপ নয় তাই তা যত শক্তিশালীই হোক না কেন কর্তৃত্বধারী বাতিলের মোকাবেলায় দীর্ঘকাল প্রতিরোধ গড়ে রাখতে পারে না। সুতরাং বাতিলের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে সময়কে দীর্ঘায়িত করা হলে এর (খারাপ) প্রভাব মুসলিম যুবকদের ওপর পড়েই, যারা দীর্ঘকাল ধরে মুসলিম যুবকদেরকে নিয়ে কাজ করে তারা এটিকে কোনো ভাবেই অস্বীকার করতে পারবে না। এই যুবকদের কেউ কেউ তো সম্পূর্ণরূপে আগের জীবনেই ফিরে যায়, আর কারো কারো গায়ে আপনি কেবল ইসলামের বাহ্যিক কিছু জিনিস যেমন ইসলামি পোশাক আর দাড়িই দেখতে পাবেন। (এ ছাড়া আর কিছুই দেখবেন না)

এখানে সেসব দলের ঘটনাই বলছি যারা ইতিপূর্বে দৃঢ়তার ক্ষেত্রে এবং খোলাখুলিভাবে সত্য প্রচারের ক্ষেত্রে সকলের কাছে উদাহরণ হিসেবে ছিল। যারা কারাগারে প্রবেশ করলে আরো দৃঢ় ও প্রত্যয়ী হয়ে বেরিয়ে আসতো। কিন্তু দেখা গেল যখন এদের অনুসারীদেরকে দীর্ঘ সময় ধরে কারারুদ্ধ করে রাখা হলো, তখন তাদের মাঝে পশ্চাতগামীতা ও অপসংস্কৃতির সামনে নতি স্বীকার প্রকাশ পেল।

এমনকি যে দলটি সত্য প্রচারের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করে এবং যাদের জেল-জুলুমের মত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় না, তারাও একটা পর্যায়ে বাতিলের আধিপত্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সামনে অসহায়ভাবে নতি স্বীকার করে, যেমনটা আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি। সুতরাং আপনি দেখবেন যে, এসব দল প্রাথমিকভাবে শক্তিশালী থাকলেও তা ভেঙ্গে পড়তে সময় নেয় না। এসব আন্দোলনে সক্রিয়ভাব বজায় থাকে না, যদি না এমন কিছু ঘটে যেখানে তাদের কিছু যুবক আন্দোলনের জন্য নতুন করে রক্ত ঝরায়। কিন্তু পরক্ষণেই সেই দলটি নতুন করে আবার অশুভ বৃত্তের মাঝে প্রবেশ করে।

এ জন্যই (আমরা দেখতে পাই) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদিও তার সাহাবীদেরকে ধৈর্য্যের সাথে দ্বীনের উপর অবিচল থেকে আরও খোলাখুলিভাবে সত্য প্রকাশ করার জন্য উৎসাহিত করছিলেন কিন্তু তিনি এই স্তরের ফিতনাকে দীর্ঘায়িত করেননি। কারণ, তা তাদের জন্য বেশ কঠিন হয়ে যাবে। তাই তো তিনি (আল্লাহর নির্দেশে) তাদের জন্য প্রথমে আবিসিনিয়া এবং পরে মদিনায় হিজরত করার পথ উন্মুক্ত করে দেন। তেমনিভাবে (কাফেরদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য) নির্দিষ্ট কিছু কিছু পরিস্থিতিতে মুখে কুফরের বাক্য উচ্চারণ করারও অনুমতি দেন। এসবের পাশাপাশি তিনি বাতিলের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং সশস্ত্র আনসার সংগ্রহ করার কাজও করে যাচ্ছিলেন। বিচক্ষণ কোন নেতা তার অনুসারীদেরকে দীর্ঘ সময় ধরে শত্রুদের লুটপাট যোগ্য সম্পদে পরিণত করে রাখেন না। অন্যথায়, তারা ধীরে ধীরে দূরে সরে যাবে। অতএব, তার কর্তব্য তার অনুসারীদেরকে জুলুম থেকে পরিত্রাণের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা এবং তাদের অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানো। এজন্যই আপনি দেখবেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় স্থির হওয়ার অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই কুরাইশের একটি কাফেলা আক্রমণ করে তাদের কিছু অধিকার পুনরুদ্ধার করার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাস রাযি. এর অধীনে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। (তিনি এই কাজটি করেছিলেন) যদিও এর দ্বারা (কুরাইশদের সাথে) সংঘর্ষ বাঁধার দরোজা খুলেছিল, যা কেউ কেউ ভেবেছিল যে, এটি নেতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, মানবআত্মা স্বাভাবিকভাবেই নিজের অধিকার ফিরে পাওয়ার দাবি করে। তা না হলে, তার ধৈর্য প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাবে। এ কারণেই (বদরের যুদ্ধে) হযরত বিলাল রাযি. যখন দেখলেন, উমাইয়া ইবনে খালাফ হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ রাযি. এর হাতে বন্দী তখন তাকে (হত্যা না করে এভাবেই) ছেড়ে দেয়াটা তিনি বরদাশত করতে পারলেন না। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. উমাইয়াকে রক্ষা করার জন্য বেলাল রাযি.কে লক্ষ্য করে বলছিলেন, আমার বন্দী! আমার বন্দী! (তাকে হত্যা করো না) কিন্তু বিলাল রাযি. কেবল একটি কথাই বার বার বলছিলেন, “সে বেঁচে গেলে আমার নিস্তার নেই! “সে বেঁচে গেলে আমার নিস্তার নেই!” রক্ত, মাংসে গড়া মানুষের ক্ষমতার একটা সীমাবদ্ধতা আছে, যাকে বিবেচনা করা উচিত।

কোনো আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যদি এটি বুঝতে না পারেন তাহলে যখন তাদের সমর্থকরা হঠাৎ পিছুটান দিবে এবং একের পর এক তাদের পাশ থেকে সরে পড়বে বা কমপক্ষে আন্দোলনের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়বে এবং অনুদান দেয়া বন্ধ করে দিবে তখন নেতৃবৃন্দ যেন এ সবের জন্য নিজেদেরকেই দায়ী করেন। আর এমন হলে ধীরে ধীরে সেই আন্দোলন নিঃশেষ হয়ে যাবে অথবা কমপক্ষে এর নেতারা এ আন্দোলনকে একটি নিস্প্রভ বিকৃত আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে বাধ্য হবে। ফলে তারা সদস্য সংখ্যা ধরে রাখার প্রতিই যত্নবান হবে, আর আন্দোলনকে এমন সব ধরণের কাজ থেকে দূরে রাখবে যার মধ্যে জান, মাল, সময় এবং ঘরবাড়ি ত্যাগ করার মতো বড় বড় কুরবানি দেয়ার প্রয়োজন পড়ে। তাঁরা এমন সব বিধানকে আন্দোলনের মূলনীতি ও আসল পদ্ধতি বানিয়ে নেবে যা ইতিপূর্বে ব্যক্তি বিশেষের

ক্ষেত্রে কিংবা নির্দিষ্ট কিছু অবস্থার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী বিধান হিসেবে প্রযোজ্য ছিল। তাছাড়া হককে বাতিলের সাথে মিশিয়ে ফেলা, জাহিলি রীতিনীতির উপর ইসলামি লেভেল লাগানো, যেন (তাগুত প্রশাসনের পক্ষ থেকে) কোন ধরনের চাপের সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই অধিক পরিমাণে কর্মী ও সমর্থক সংগ্রহ করা যায় এবং এ উদ্দেশ্যে কুরআন-হাদিসের সুস্পষ্ট বক্তব্যকে বিকৃতি করা, এ সব তো আছেই।

এই ফিতনার মোকাবেলায় এবং জিহাদ ও কিতালের (পথে আসা নানা ধরণের) ফিতনার মোকাবেলায় দৃঢ় ও অবিচল থাকার ফলে (মুমিনদের) ঈমানের স্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এই দু ধরণের ফিতনার মোকাবেলায় দৃঢ়তা ও অবিচলতা - ব্যক্তি এবং ইসলামি জামাতের তরবিয়তের ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব রাখে।

[একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর]

এ ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন আসে যে, এমন হলে শরিয়ত কেন জেল, টর্চার ও কাফেরদের আধিপত্যের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য হিজরত করা এবং সত্য গোপন করে মিথ্যা বলার অবকাশ দিল -যদিও এ দুটির স্তরে তারতম্য রয়েছে-, অপর দিকে কিতালের ফিতনা থেকে বের হওয়ার কোন সুযোগই দিল না ? অথচ হাদীসের ভাষ্যমতে এটিও ‘ফিতনা’। যেমন এক হাদীসে এসেছে, كَفَى بِبَارقة السيوف فتنةً - ‘(মুজাহিদদের জন্য) ফিতনা হিসেবে তরবারির ঝলকই যথেষ্ট’। শুধু তাই নয়, বরং এ বিধানকে কেয়ামত পর্যন্ত চলমান একটি বিধান বলে সাব্যস্ত করেছে, আর তা থেকে পিছিয়ে থাকাকে বা এর জন্য যথাযথ শারীরিক প্রস্তুতি গ্রহণ না করাকে -বিশেষ করে যখন তা ফরযে আইন হয়ে যায়- মুনাফিকির লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

জেল, জুলুম ও টর্চারের ফিতনার বিষয়ে আমি বলবো, যদিও এর গুরুত্ব আছে বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ে, কিন্তু এর সময়কাল দীর্ঘ হলে আন্দোলন কর্মীদের ঝরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমনটা আগেও আমি বলে এসেছি।

জিহাদের ফিতনার ব্যাপারে বলবো, প্রথমতঃ বড় ফিতনাকে দূর করার জন্যই এর অনুমোদন দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ...

তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে থাকো যে পর্যন্ত না সকল ফিতনার অবসান ঘটে এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যায়...। [সূরা আনফাল : ৩৯]

আর সবচেয়ে বড় ফিতনা হল, জেল জুলুম ও টর্চারের মাধ্যমে দ্বীন থেকে সরিয়ে দেয়ার ফিতনা, যা কিতাল ছাড়া কিছুতেই দূর হবে না।

দ্বিতীয়তঃ কিতালের ফিতনায় বড় বড় মুছিবত ও পরীক্ষা থাকার ফলে তাতে এমন কিছু উঁচু অনুভূতি ও সম্মাননা জায়গা করে নেয় যা ওই ফিতনার প্রভাবকে অন্তর থেকে বহুলাংশে দূর করে দেয়, এমনকি একসময় কিতালের এ দরজা দিয়েই সকল দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতা বিদায় নেয়।

তৃতীয়তঃ জিহাদের ময়দানে খুব সহজেই কেউ শাহাদাত লাভ করতে পারে, অথচ নির্যাতনের শিকার অধিকাংশ ভাইরাই (জেলখানায় বসে) সেই শাহাদাতের তামান্না প্রতিনিয়ত করতে থাকে। [এ বিষয়ে কথা শুরু করলে শেষ করা যাবে না।] সুতরাং জিহাদের ময়দানে রক্ত, খুলি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উড়ে যাওয়ার মতো ভয়াবহ ফিতনা (পরিস্থিতি) থাকা সত্ত্বেও মানব হৃদয় দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা মেনে নিতে পারে, বরং এসবের প্রতি তার আগ্রহ দিন দিন বাড়তে থাকে। পক্ষান্তরে জেলখানার ফিতনা সম্পূর্ণই তার বিপরীত।

তেমনিভাবে বাতিলের আধিপত্যের ফিতনা এবং তার সাথে থাকা কষ্ট-নির্যাতন (যেমন, জেল, টর্চার ইত্যাদি) মানব আত্মার সীমিত কিছু দিকের চিকিৎসা হিসেবে কাজ করে ঠিকই (যেমন, অহংকার দূর হয় এবং আল্লাহর পথের বিনম্র পথিক হওয়ার সময় নফসকে কিভাবে দমিয়ে রাখতে হবে এবং দূর্বল মনোবলকে কিভাবে শক্ত মনোবলে পরিণত করতে হবে তা শিখা হয়), কিন্তু প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় এ পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হলে ব্যক্তির আত্মমর্যাদাবোধ এক সময় নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষত এর পাশাপাশি যখন ‘আধিপত্যবাদী বাতিল’ গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে চরমভাবে অপমানিতও হতে হয়। অপরদিকে যারা হক্বের ধারক-বাহক তাদের পক্ষ থেকে হীন কাপুরুষতা দেখা যায় এবং সহীহ তরিকায় এর প্রতিকার করার ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়।

অপরদিকে জিহাদ একজন মুজাহিদের মনের সকল অবস্থার চিকিৎসা করে; আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্তির সময় মনের অবস্থা, পরাজয়ের সময় মনের অবস্থা, আত্মপ্রসাদের সময় মনের অবস্থা এবং বিজয়ের সময় মনের অবস্থা। মোটকথা, জিহাদ (এই সবগুলো অবস্থায় মুজাহিদের অন্তরে মন্দ যত কিছু আসতে পারে সবগুলোর চিকিৎসা করার মাধ্যমে) একজন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলে।

এজন্যই তুমি দেখতে পাবে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা (কাফেরদের হাতে নির্যাতিত হওয়ার ফিতনা এবং জিহাদের ফিতনা) দুটোরই মুখোমুখী হয়েছেন এদের সংখ্যা নেহায়েতই কম। পক্ষান্তরে সাহাবায়ে কেরামের বড় অংশটিই ছিল এমন যারা কেবল জিহাদের ফিতনার মুখোমুখী হয়েছেন। কারণ, শুধু জিহাদের ধাপগুলোই ঈমানসমৃদ্ধ এমন এমন ব্যক্তি ও দল গঠনে যথেষ্ট, যারা পরবর্তীতে অন্যান্য মুমিনদের জান, মাল ও ইজ্জত রক্ষায় দায়িত্ব নিতে সক্ষম।

জিহাদ একটি ফিতনা বা পরীক্ষা ঠিকই তবে এটি এমন এক ফিতনা যে ফিতনার ভিতরেই রয়েছে এর প্রতিষেধক। একদিকে আল্লাহর শত্রুরা তোমাকে ভয় দেখাতে থাকবে, অপরদিকে তারা তোমার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে থাকবে। তোমার জন্য এ মর্যাদাই যথেষ্ট যে, তুমি সমস্ত বাতিলের গোলামির জিঞ্জির ছিন্ন করে তোমার সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা এক আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথানত করে অস্ত্র হাতে নিয়েছো।

সারকথা

কাফের মুশরিকদের আধিপত্যের অধীনে থেকে নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত জেল, জুলুম ও নির্যাতন সহ্য করার পরীক্ষা এবং কুফর শিরকের বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরীক্ষা- দুটোই একজন ঈমানদার ব্যক্তি এবং ইসলামি দলের তরবিয়তের জন্য এবং ঈমানের স্তর বৃদ্ধির জন্য জরুরি। তবে জেল জুলুমের পরীক্ষা কামনা করা উচিত নয়, এমন কি যদি আমরা এমন এমন কাজ করি যার পরিণতি নিশ্চিতভাবে এটাই। যেমন, হক কথা সুস্পষ্ট ভাবে বলা। আমরা হক কথা সুস্পষ্ট ভাবে বলতে থাকব, পাশাপাশি আল্লাহর কাছে (সব ধরণের বিপদাপদ থেকে) নিরাপত্তাও কামনা করতে থাকব।

কারো উপর এই পরীক্ষা যদি চলেই আসে তাহলে এর সময়কাল খুব বেশি দীর্ঘ হতে দেয়া উচিত নয়। অন্যদিকে জিহাদ এবং তরবারির ঝলকের পরীক্ষা ও ফিতনার দিকে এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। আর এটা এমন বিধান যা কেয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে, সুতরাং দীর্ঘ সময় জিহাদের ময়দানে কাটানোর কারণে কখনোই অন্তরের উপর নেতিবাচক কোনো প্রভাব পড়বে না।

আমরা যখন বলি যে, ‘বাতিলের আধিপত্যের ফিতনা দীর্ঘায়িত হওয়া উচিত নয়’ তখন আমাদের উদ্দেশ্য হয় এ কথা বুঝানো যে, আমাদের বন্দী ভাইদেরকে মুক্ত করার জন্য একটা শক্তিশালী পথ খুঁজে বের করতে হবে, অর্থাৎ আমাদের আন্দোলনের একটা লক্ষ্য থাকবে বন্দি ভাইদের মুক্ত করা।

কাফেরদের নির্যাতন থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে - আন্দোলনের নেতৃত্ব পর্যায়ের কেউ তো নয়ই, এমনকি একজন সাধারণ দ্বীনদার মুসলমানও দ্বীনকে গোপন করে বা দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন এনে আত্মরক্ষা করতে বলবে না , যেটা করলে হয়তো বাতিল গোষ্ঠী সন্তুষ্ট হয়ে চাপ প্রয়োগে শিথিলতা করবে।

হ্যাঁ , ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তি বিশেষের জন্য এটি বৈধ। হযরত আম্মার রাযি . এর ঘটনা থেকে যেমন বুঝা যায়। কিন্তু মক্কী জীবনের (যার পুরোটি ছিল আসলে একটা ব্যতিক্রমী সময়) ব্যতিক্রমী একটি ঘটনার উপর ভর করে যখন পুরো একটা আন্দোলন দাঁড়িয়ে থাকে তখন স্পষ্ট বুঝা যায় যে , সেই আন্দোলনটি একটি ভঙ্গুর আন্দোলন , এই দ্বীনের আমানত বহন করার কোন ক্ষমতাই তার নেই। এ জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের জন্য ভালো হবে , আন্দোলনকে ভেঙ্গে দেয়া এবং এর কর্মীদেরকে সব ধরণের বাইয়াহ ও অঙ্গিকার থেকে মুক্ত করে দেয়া , যেন তাদের মধ্যে যারা আন্তরিক ভাবেই আল্লাহর দ্বীনের জন্য কাজ করতে চায় তারা এমন দলকে সাহায্য করতে পারে যারা সুদৃঢ় ভাবে এই দ্বীনের আমানত বহন করার ক্ষমতা রাখে।

এটাই হল মূল বিষয় , যা আমি বুঝাতে চাচ্ছি। মুসলিম বিশ্বে যে সব উলামায়ে কেরাম মুসলমানদের তরবিয়তের কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরা এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবেন বলে আমি আশা রাখি।

পবিত্র ও সুমহান সেই সত্ত্বা যার শরয়ী বিধিবিধান এবং সৃষ্টি জগতের স্বাভাবিক নিয়মকানুন এক ও অভিন্ন। গোটা বিশ্বজগতের সব কিছু এই দুয়ের সাথে মিল রেখেই চলে। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক।

তৃতীয় প্রবন্ধ

**যুদ্ধের অগ্নি পরীক্ষায় মুখোমুখি দু ‘পক্ষ**

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ...

শীঘ্রই আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করবো। কারণ , ওরা আল্লাহর সাথে এমন অংশীদার সাব্যস্ত করে , যা সম্পর্কে তিনি কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি। সূরা আলে ইমরান ১৫১

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর রাসূলের উপর , তাঁর পরিবার -পরিজনের উপর, সাহাবাগণের উপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসারীগণের উপর।

পর কথা হল, দৃশ্যমান প্রতিটি জিহাদের ভূমিতে প্রায়ই কিছু ঘটনা ঘটে থাকে।

এই আরব উপদ্বীপে একবার এক মুজাহিদ ভাই তাঁর কয়েকজন সাথীসহ তাগুত বাহিনীর বেশ কয়েকটি গাড়ির ঘেরাওয়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। পরে তিনি কোন প্রকার আড়াল ব্যবহার না করেই গাড়ি থেকে বের হয়ে শত্রুবাহিনীর উপর হালকা গুলি বর্ষণ করে সামনে বাড়তে শুরু করলেন। তাঁর এটা জানা ছিলো যে , তাঁর শত্রুরা সংখ্যায় অনেক। তাদের কেউ যদি একটু স্থির হতে পারে এবং গুলি চালায় তাহলে তাকে সহজেই নিশানা বানাতে পারবে। কারণ তিনি কোনো আড়াল ছাড়াই খোলা জায়গায় ছিলেন। কিন্তু তারা ইঁদুরের ন্যায় পালিয়ে যায়।

এখানে যে বিষয়টি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তা হলো , তাগুত বাহিনীর যে অংশটি পেছনভাগে ছিল তারা যখন পরিস্থিতি অবলোকন করলো তখন খুব দ্রুত পলায়ন করলো। এমনকি মুজাহিদ ভাই তাদের উপর একটি গুলিও বর্ষণ করেননি। বিষয়টি এখানেই শেষ এমন

নয়। এই ভাই সামনে বেড়ে অবশিষ্ট সৈন্য ও অফিসারদেরকে তাঁর হাতে থাকা আসলিহা নিয়ে ধাওয়া দিলেন , অথচ তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ খোলা জায়গায়। অপরদিকে তাগুত বাহিনীর কেউ কেউ ছিল গাড়িতে , তাছাড়া সকলেই ছিল বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরিহিত।

এমন ধারাবাহিক ঘটনা ইতিহাসের পাতায় পাতায় বিদ্যমান। যা বদর থেকে শুরু হয়ে ততদিন পর্যন্ত মুজাহিদীনের সকল রণক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে ঘটে চলেছে , যতদিন মুজাহিদীন নিয়ত ও লক্ষ্য -উদ্দেশ্য ঠিক করে ঈমানের বলে বলীয়ান ছিলেন এবং যথাসাধ্য উপায় -উপকরণ গ্রহণ করার পর আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রেখেছেন।

একজন ভাই বলেন, আফগানিস্তানের খোস্ত শহর বিজয়ের পূর্বে রাশিয়ান সৈন্যরা কোনো এক দূর্গে ঢুকে বসেছিল। মুজাহিদগণ শহরটিকে বেশ দীর্ঘ সময় ঘেরাও করে পূর্বের এক যুদ্ধে গনিমত হিসাবে প্রাপ্ত সাঁজোয়া যানের অপেক্ষায় ছিলেন। উদ্দেশ্য , ওগুলোকে দূর্গে প্রবেশের সময় ব্যবহার করবেন। তাঁদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল , তারা যেন মনে মনে ভাবছিলেন , এ সাঁজোয়া যানগুলো এসে গেলে আমরা পরাজিত হবো না। পরবর্তীতে যখন সাঁজোয়া যান এল এবং আক্রমণ শুরু হল তখন (শত্রুপক্ষের ) কিছু গোলা এসে এগুলোর ওপর আঘাত হানল। এতে ওই সাঁজোয়া যানগুলো ধ্বংস হয়ে গেল। মুজাহিদগন পলায়ন করলেন এবং বেশ কয়েকজন শহীদও হলেন। এর কিছুক্ষণ পর তাঁরা আবার একত্রিত হয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে পুনরায় দূর্গ ঘেরাও করে আক্রমণ শুরু করলেন। এখন আর তাদের সামনে (রক্ষাকারী হিসাবে ) সাঁজোয়া যানের চিন্তা নেই , এমতাবস্থায় তাঁরা শুধু কিছু হালকা অস্ত্র দিয়েই দূর্গ বিজয় করে তাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। ওই ভাই পাহাড়ের উপর থেকে ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বলেন , একটু আগে আমি যে সৈন্যদেরকে সাঁজোয়া যান ধ্বংস করতে দেখলাম একটু পর তাদেরকেই নিজেদের হালকা ও ভারী সকল অস্ত্র ফেলে রেখে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যেতে দেখলাম। আর এভাবেই খোস্ত বিজয় হয়।

মুজাহিদগণ (বাহ্যিকভাবে ) দূর্বল হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে তাদের উপর স্থিরতা আসলো ? আর শত্রুদের সৈন্যরা ভাল অবস্থানে থেকেও কেন পলায়ন করলো ?

**... وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ - ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ (التوبة: ٢٥-٢٦**

... এবং হুনাইনের দিনে , যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল , অথচ তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি। আর যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। তারপর আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন তাঁর রাসূলের উপর ও মুমিনদের উপর এবং নাযিল করলেন এমন সৈন্যবাহিনী যাদেরকে তোমরা দেখনি , আর কাফিরদেরকে আযাব দিলেন। আর এটা কাফিরদের কর্মফল। [সূরা তাওবা ২৫ -২৬]

কোনো কোনো সুহৃদ ব্যক্তি এটাকে মুজাহিদীনের বীরত্ব এবং আল্লাহর শত্রুদের কাপুরুষতা বলতে পারে , যদিও এটি অনেকক্ষেত্রে একটি কারণ বটে , তবে একজন মুজাহিদ নিজেও জানেন যে , এ সকল অবস্থায় তাঁর বীরত্ব আসলে যথেষ্ট নয়। অপরদিকে এমন হয় যে , শত্রুসেনা যারা ইতিপূর্বে মুজাহিদীন ব্যতীত অন্য কারো সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তাদের সহজাত বীরত্ব প্রমাণ করেছিলো , তাহলে এরাই যখন মুজাহিদীনের মুখোমুখি হল তখন এমন কী ঘটলো? কেন তারা ভীত -সন্ত্রস্ত হল ? কেনইবা একজন মুজাহিদ নিজের ভেতরে তাঁর প্রত্যাশার চেয়েও বহুগুণ বেশি দৃঢ়তা অনুভব করলো ? আর কেনইবা শত্রু সৈন্যরা গুলিবর্ষণ করার সময় নিজেদের অঙ্গে পক্ষাঘাত (জড়তা) অনুভব করলো? পৃথিবীবাসীর কাছে এর কোনো ব্যাখ্যা নেই।

একজন গুলিবর্ষণকারী মুজাহিদ যখন আল্লাহর নামে গুলি বর্ষণ করেন এবং এ ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত যে, তাঁর গুলি লক্ষ্যে পৌছাবে না, কিন্তু তিনি নিরুপায় হয়ে গুলি ছোড়েন এবং পরবর্তীতে দেখতে পান যে, গুলি শত্রুর ঠিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছে, তাহলে এসব কিভাবে ঘটে? কখনো এমন হয় যে, দূরত্ব বেশি হবার কারণে তাত্ত্বিকভাবে অস্ত্রের টার্গেট এত দূরে পৌছানোর কথা নয়, কিন্তু সেখানেও গিয়ে আঘাত হেনে থাকে।

এগুলো কিভাবে ঘটে যে, একবার মুশরিকরা কোনো এক যুদ্ধে বিজয় অর্জন করে এবং অবশিষ্ট মুমিনদেরকে পৃথিবী থেকে মুছে দেয়ার সক্ষমতাও তাদের থাকে, কিন্তু এরপরও আল্লাহ তাদেরকে ফিরিয়ে দেন, [যাতে করে আল্লাহ মুমিনদেরকে পরীক্ষা করে নেন যে, এমন (করুণ) পরিস্থিতি দেখার পরও তাঁরা কি আল্লাহর রাহে দৃঢ়পদ থাকে, নাকি পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়?]

এটা কিভাবে ঘটে যে, মুজাহিদীন যখন নিজেদের সর্বাত্মক চেষ্টা জারি রাখে এবং আল্লাহর শরয়ী বিধান ও মহাজাগতিক নিয়মনীতি বজায় রাখে তখন মুজাহিদীনের কোনো কৃতিত্ব ছাড়াই যুদ্ধের দৃশ্যপট পাল্টে যায়? এমনকি খন্দকের যুদ্ধে ‘একটি মাত্র মুহূর্ত’ যা খন্দকের (গর্তের) এপাড়ে অবস্থানরত সাহাবায়ে কেরামের পরিস্থিতির মাঝে পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। অথচ (এক মুহূর্ত পূর্বেও) তাদের কেউ এখান থেকে সরে গিয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিবে এমন নিরাপদ বোধ করছিল না। (পরিস্থিতি এতটাই শোচনীয় ছিল যে,) তাদের প্রাণ ছিল ওষ্ঠাগত, কেউ কেউ আল্লাহর ব্যাপারে নানা রকম ধারণা করতে শুরু করেছিল।

সেই শোচনীয় পরিস্থিতি ও আল্লাহর পক্ষ থেকে মুশরিকদের উপর বাতাস প্রেরণের মাঝে কেবল একটি মুহূর্তই ছিল। (সেই এক মুহূর্তের ব্যবধানেই পুরো চিত্র পাল্টে যায়) বাতাস তাদের আগুন নিভিয়ে দেয় এবং হাড়ি-পাতিল উল্টে দেয়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মুশরিকদের নেতৃত্ব তাদের সৈন্যদের ব্যাপারে অনুভব করে যে, তাদের যুদ্ধাভিলাষী মনোভাবে ধ্বস নেমেছে, তারা এখানে আর এক মুহুর্তও থাকতে চায় না। ফলে নেতৃবৃন্দ ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেই বিশাল বাহিনীর পরিস্থিতি পাল্টে যায়। তারা তাদের বিশ্বাসঘাতক মিত্রদের পরিত্যাগ করে। প্রতিকূল পরিস্থিতি আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি ‘এখন থেকে আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়বো, তারা আর লড়তে আসবে না’- এ দু‘য়ের মাঝে কেবল একটি মুহূর্তই ছিল, যে মুহূর্তে ভয় তাদের হৃদয়কে গ্রাস করে নেয়। আর এই ভয়ই মুমিনদের জন্য গনিমত হিসেবে দেখা দেয়।

এজন্য আমরা ইরাকের মুজাহিদীনকে সুসংবাদ দেই যে, যতদিন তাঁরা দৃঢ়পদ থাকবেন এ ধারা অপরিবর্তিত থাকবে, সে বিশেষ মুহুর্ত অবশ্যই আসবে, এমনকি তাদের উপর যদি প্রচন্ড ঝাঁকুনি আসে তবুও। বরং এমন প্রকম্পমান অবস্থায়ই এ অবস্থা এসে থাকে। মুমিনগণ যখন তাদের অন্তরের গভীর থেকে বলতে থাকে ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছেন এটি তো সেই ওয়াদাই। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন’।

মুজাহিদীনের পূর্ববর্তী অপারেশনগুলোর মতো অনেক কিছুই শত্রুদের এমন পলায়নের সিদ্ধান্তের পেছনে কারণ হয়ে থাকতে পারে। যেমন আমেরিকানদেরকে জবাই করা, আবু গারিব এর মতো নতুন কোনো লজ্জাজনক অবস্থা, অথবা ফালুজাতে যেমনটি ঘটেছিল তার মতো নতুন কোন অলৌকিক দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তা’আলা ফালুজাকে সম্মানিত করুন, যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত ও ধ্বংসাত্মক অস্ত্রসজ্জিত বড় সেনাবাহিনী নিয়ে ছোট এই শহরটিকে ঘেরাও করেছিলো আর মুজাহিদীন হালকা কিছু অস্ত্র হাতে এর মোকাবেলা করতে দাঁড়িয়ে যায়, তাদের হালকা অস্ত্রগুলো শত্রুর হালকা অস্ত্রের সাথে তুলনাও করা চলে না। হে ইরাকি মুজাহিদীন! এটাই সেই বিশেষ মুহুর্ত। বিইযনিল্লাহ! শুধুমাত্র একটু দৃঢ়পদ থাকাটাই মূল। এটি যখন এসে যায় তখন এ অপার করুণা ও নেয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য প্রস্তুত হোন এবং এজন্য ধন্য হোন যে, এখন আর বিশ্রাম নেয়ার সময় নেই। এমনকি এখন সে দূর্গে প্রবেশের পরই কেবল সালাত আদায় করা হবে।

আর এটা নিশ্চিত জেনে রাখুন যে, তাদের প্রভু আমেরিকা যখন সৈন্য প্রত্যাহার করবে তখন তাদের অন্তরে বর্ণনাতীত ভীতি সঞ্চারিত হবে। তারপর তাদের ও তাদের এজেন্ট সরকারের মন্ত্রীদের সাথে এবং সৈন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনূ কুরাইযাহ এর সাথে করেছিলেন। তখন কেবল সা'দ বিন মু'আয রাযি.র রায়-ই গ্রহণ করবে। সেটা কতই না উত্তম রায় ছিল!

এসময় যারা বলবে যে, আমেরিকা এবং তার মিত্ররা ফিরে যাবে না অথবা বলে যে, তারা আবারও ফিরে আসবে' এমন ব্যক্তিদের কথায় ভ্রুক্ষেপ করবেন না। এরা তো তারাই যারা ইতিপূর্বে আপনাদেরকে পরিত্যাগ করে চুপচাপ আপনাদের অবস্থা অবলোকন করছিলো।

﴿يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الأحزاب: ٢٠)

তারা মনে করে, সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি। তবে সম্মিলিত বাহিনী যদি এসে পড়ে তখন তারা কামনা করবে যে, নিশ্চয় যদি তারা মরুবাসী বেদুঈনদের মধ্যে অবস্থান করে তোমাদের খবর জিজ্ঞাসা করতে পারত (তবে ভালই হত)! আর যদি এরা তোমাদের মধ্যে থাকত তাহলে তারা অল্পই যুদ্ধ করত। সূরা আহযাব-২০

সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে এ ধরনের সম্মিলিত বাহিনী যখন চলে যায় তখন আর ফিরে আসে না। নিশ্চিত বিশ্বাস করুন!

আল্লাহর কাছে কামনা করি এমন সময়ে আল্লাহ যেন আপনাদের উপর অনুগ্রহ করেন। এ সকল বিশ্বাসঘাতকদের উপর এবং তাদের সহায়তাকারী প্রতিবেশী সেসব রাষ্ট্রের উপর যেন আপনাদেরকে সক্ষমতা দান করেন।

আমি বলি, আল্লাহর ইচ্ছায় এ ধরনের পরিস্থিতি যে অচিরেই ঘটতে যাচ্ছে এর যথেষ্ট ধারাবাহিক প্রমাণ রয়েছে। সেখানে আমরা তাদের সৈন্যদের চিৎকার-চেচামেচি ও কান্নাকাটি শুনতে পাই। এমনকি যুদ্ধের শব্দের চেয়ে তাদের কান্নার শব্দ বেশি উচ্চ হয়ে থাকে। আর তাদের বোকামির আরো দিক হল... এমনকি মুজাহিদীন তাদেরকে একই জায়গা থেকে অসংখ্যবার আঘাত হেনে থাকেন।

আর তাদের ভয়, উৎকণ্ঠা ও আত্মকেন্দ্রিকতার ব্যাপারে মুজাহিদ ভাইগণ বলেন, তাদের সামরিক বহরে কোনো একটি গাড়িতে যখন হামলা হয় তখন সেখান থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি অন্যদের ভাগ্যে কি ঘটলো তা দেখা ছাড়াই পালিয়ে যায়। আমার তো এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই সৈনিকরা তাদের বাড়ি থেকে আসার সময় সাহসী ও বুদ্ধিমান হিসাবেই এসেছিল, আর সে মুজাহিদীনের সাথে লড়ার সময় ব্যাপক লড়াই করবে বলেই ধারনা করতো। [24]

এত কিছুর পর আমরা কি এটাই বুঝে নেবো না যে, আল্লাহই এ সব কিছু তাঁর ইচ্ছামত পরিবর্তন করে দেন, যার হাতে সকল বান্দার অন্তর এবং তাদের সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তিনি তাদের চক্ষুকে অন্ধ করে দেন, তাদের হাতগুলোকে অসাড় করে দেন, তাদের ক্ষেপনাস্ত্রগুলোকে ব্যর্থ করে দেন। আর তিনি মুমিনগণকে সুরক্ষা দান করেন এবং মুমিনদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করে থাকেন। সুতরাং শত্রুপক্ষের জন্য এ পরিস্থিতিতে কিইবা করার থাকে? বরং আল্লাহ যদি চান তবে তাদের অন্তরসমূহকেও মুমিনদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে দিতে পারেন। এমনিভাবে আমরা ইরাকে বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা দেখেছি এবং শুনেছি যে, বিশাল বিশাল মাকড়সা এসে আমেরিকা ও তার জোটের সৈন্যদের উপর আক্রমণ করে ভীতি ছড়িয়েছে। মশার কামড়ে তাদের চামড়াগুলো ফুলে উঠে খসে পড়েছে এবং এর কোনো চিকিৎসা তারা করতে পারেনি। কুফফারদের পত্র-পত্রিকায় এমন কিছু ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে যে, (তাদের ভাষায়) ভূত-প্রেতের মত কিছু বাহিনী

মুজাহিদীনের সাথে থেকে যুদ্ধ করেছে, যাদের উপর আমেরিকান উন্নত অস্ত্রগুলো কোনো আঘাত করতে পারছিল না। এসবই আল্লাহর অনুগ্রহ এবং সকল প্রশংসা তারই প্রাপ্য।

যারা পশ্চিমা নিউজ রিপোর্ট এবং চ্যানেলসমূহে সবিস্তারে প্রচারিত এসব ঘটনাবলীতে চোখ রাখে এবং এগুলো অনুসরণ করে তারা পশ্চিমা সমাজে এবং তাদের সৈন্যদের উপর এসব ঘটনাবলীর প্রভাব প্রত্যক্ষ করবে। এসব অলৌকিক ঘটনাবলী এবং ইতিপূর্বের নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন হামলা ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন বিস্ময়কর ঘটনাবলীর সংবাদ কুফফারদের প্রতিটি ঘরে আজ প্রবাহমান। এমন একটি ঘরও নেই যেখানে এসব সংবাদ পৌঁছেনি। যার ফলে বর্তমান সময়ে আল্লাহর ইচ্ছায় মুমিনদের জন্য জিহাদের এক অনন্য ধাপের পথ তৈরি হচ্ছে। সে ধাপে এসে শত্রু নিশ্চিতভাবে টের পাবে যে, সে আল্লাহর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তখন আসলি কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীর যেসব যুবক ও সৈনিকদের মাঝে ভালো কিছু আছে এবং সঠিক বুদ্ধি-বিবেচনা আছে এমন কাউকে মুজাহিদীনের কাফেলায় যোগ দিতে দেখলে তুমি আশ্চর্য হয়ো না। আমরা কীভাবে আশ্চর্য হতে পারি অথচ ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ক্রুসেডার বাহীনির বহু সংখ্যক নেতৃবর্গ এসব অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর সালাহুদ্দিন আইয়ুবী রহ. এর বাহিনীতে যোগদান করেছে।

এই যে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি., যিনি তখনও কুফফার বাহিনীর বড় কমান্ডার ছিলেন, গাযওয়াতুল আহযাবের পর মদীনার দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আরেক কমান্ডার ‘আমর ইবনুল আস’ রাযি. এর সাথে সাক্ষাৎ হয়, যিনি নিজেও একই দিকে যাচ্ছিলেন। তখন আমর ইবনুল আস খালিদ বিন ওয়ালিদকে জিজ্ঞেস করলেন - কোথায় চলেছ? উত্তরে খালিদ বিন ওয়ালিদ বললেন, ‘ইতিমধ্যেই আলামত স্পষ্ট, রাস্তা পরিস্কার। আমরা তাদের (মুসলিমদের) যেসব বিষয় দেখেছি, তাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য, তাদের ধৈর্য্য যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি – এগুলো এমনই স্পষ্ট নিদর্শন যা প্রমাণ করে যে, তারাই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর প্রকৃত দ্বীনের ধারক-বাহক।

আমার ভাই! তুমি কখনোই আশ্চর্য হয়ো না, কেননা আমাদের দাওয়া ও জিহাদী তরীকার এগুলোই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য এবং দলীল। দেখা যায়, দ্বীনের একেবারে বড় থেকে বড় শত্রু আল্লাহর কুদরতে কয়েক মুহূর্তেই এমন নিষ্ঠাবান অনুগত বান্দায় রূপান্তরিত হয় যে, তারা আল্লাহর রাস্তায় তাদের জীবন বিলিয়ে দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের এমন হাজারো-লাখো নিষ্প্রাণ ধার্মিক যুবকদের চেয়ে আগে জান্নাতের দিকে ছুটে চলে যারা বহু বছর মুসলিমদের মাঝে পেছনে পড়ে থাকা বেদুঈনদের মতো জীবন যাপন করে। আল্লাহর কাছে আমাদের সকলের জন্য এমন অবস্থা থেকে ক্ষমা, পরিত্রাণ ও অনুগ্রহ কামনা করি।

তুমি আশ্চর্য হয়ো না হে আমার ভাই, কারণ, উহুদের যুদ্ধে কাফিররা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারায় আঘাত করে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন, ‘এমন জাতি কখনোই সফল হবে না যারা তাদের নবীকে রক্তাক্ত করে’ তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা আয়াত নাযিল করেন যা কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হতে থাকবে,

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

এ ব্যাপারে আপনার কোনও ইখতিয়ার নেই, হয় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা আযাব দেবেন, কারণ তারা জালেম। সূরা আলে-ইমরান ১২৮

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা আরও বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা। সুরা বুরুজ-১০

ইয়া আল্লাহ! (কতইনা আশ্চর্য আল্লাহর মহিমা) মুমিনদেরকে নির্যাতন করার পরও তাদের জন্য তাওবা করে নতুন জীবন লাভ করার সুযোগ রয়েছে।

মুজাহিদগণ বাড়িঘর, পার্থিব সুযোগ-সুবিধা, দুনিয়াবী স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে হিজরত ও জিহাদের মাধ্যমে, রক্ত ঝরানোর মাধ্যমে, নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে যেসব আমল পেশ করেছেন এবং যেসব ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছেন এগুলো কখনোই বিফলে যাবে না। কিছুকাল পর হলেও এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাবেই।

এই যে হযরত ইকরামা ইবনে আবু জাহল রাযি. ও হযরত সুফিয়ান ইবনে হারব রাযি., তারা ইসলাম গ্রহণের পর পরই একে অপরকে বলছিলেন, লোকেরা আমাদের চেয়ে অনেক আগে বেড়ে গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীদেরকে নির্যাতন করা হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে। তাঁরা ঘরবাড়ি, পরিবার-পরিজন ছেড়ে হিজরত করেছে। নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করে বড় বড় কোরবানি পেশ করেছে, সে হিসেবে আমাদের অবস্থান কোথায়? অপরজন জবাব দিয়েছিলেন এভাবে, চল, আমরাও কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি, এতে করে আশা করা যায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা আমাদেরকেও শাহাদাত দান করবেন, তারপর ক্ষমা করে দিবেন এবং আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন।

সুবহানাল্লাহ! মুমিন-মুজাহদীন ভয়-ভীতির মুখোমুখি হয়ে যে ত্যাগ দিয়ে যাচ্ছেন, ইসলামের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর এর ফলাফল পরিলক্ষিত হবে ইনশাআল্লাহ। এর আরও একটি ফল রয়েছে তা হল, আল্লাহ তাদেরকে এমন অবস্থায় পতিত করবেন যে, শত্রুরা অপরাধের এমন ধাপে পৌঁছে যাবে যা তাদেরকে আল্লাহর কঠিন আযাবে নিপতিত করার পরিপূর্ণ যোগ্য করে তুলবে যা হ্রাস করা হবে না।

সাম্প্রতিককালে রাশিয়া তার হেলিকপ্টারগুলো দিয়ে আফগানের এমন গ্রামগুলোতে অবতরণ করে যার পুরুষরা পাহাড়ে যুদ্ধরত ছিলো। তারা সে গ্রামে শুধু বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদেরকে পেয়ে শিশু ও বৃদ্ধদেরকে হত্যা করে নারীদেরকে হেলিকপ্টারে করে তুলে নিয়ে মহিলাদেরকে উলঙ্গ করে হেলিকপ্টার থেকে জীবন্ত ফেলে দেয়। মুজাহিদগণ ফিরে এসে এ অবস্থা দেখে নিজেদের পোষাক খুলে তাদের মা-বোন আর স্ত্রীদেরকে ঢেকে দিয়ে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে বদ দু’আর হাত উত্তোলন করেন। এর অল্পকিছুকাল পরেই আল্লাহ চের্নোবিল বিপর্যয়ের মাধ্যমে তাদের অসংখ্যকে ধ্বংস করে দেন এবং পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদেরকে বিজয় দান করেন আর এটিই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হওয়ার অন্যতম কারণ। তাদের বাহিনীর অনেকেই পরে তাওবা করে তাজিকিস্তান, চেচনিয়া ও আবখাযিয়ায় এমনকি রাশিয়ার অভ্যন্তরে বিদ্যমান জিহাদি কাফেলায় শরিক হয়েছেন। চেচেন বংশোদ্ভুত গওহর দোদায়েভের মতো রাশিয়ান জেনারেলকে আমরা বিশ্বের সবচেয়ে দূর্ধর্ষ ও ভয়ংকর বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদে নেতৃত্ব দিতে দেখেছি। তিনি তাঁর বাহ্যিক পদমর্যাদা ও অবস্থান ছুড়ে দিতে একটুও দ্বিধা করেননি। এ ধরনের ব্যক্তিগণ কীভাবে আসলেন? এটা কি বিশ্বের সর্ববৃহৎ অস্ত্রভান্ডারের অধিকারী কুফফারদের সামনে সবরকারীদের দৃঢ়তা ও অবিচলতা, আল্লাহর নিদর্শন এবং কথিত পরাশক্তিগুলোর বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করার কারণে নয়?

হ্যাঁ, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর আরও বিভিন্ন দিকও রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, আল্লাহ মুমিনদেরকে পবিত্র করতে চান, মানুষের কাছে তাদের দৃঢ়তা ও ঈমানের সত্যতা প্রকাশ করতে চান এবং কাফিরদেরকে ধ্বংস করতে চান। আর তাদেরই মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে আমাদেরকে এমনকিছু নিদর্শন ও প্রমাণ দেখিয়ে দিতে চান যে, বান্দার অন্তর এবং বান্দার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ একমাত্র তাঁর হাতেই।

নিশ্চয় আল্লাহর ইচ্ছায় এমন হারে দৃশ্যপট পাল্টে যাবে যে, মানুষের বিবেক তা বিশ্বাসও করতে পারবে না। শত্রুদের সৈন্যরা আমাদের সামনে থেকে পলায়ন করবে, আর কখনো আমাদের মুখোমুখি হতে চাইবে না। বরং অচিরেই আমরা দেখবো যে, আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের মাঝে থাকা ভালো মনের মানুষগুলো আমাদের সাথে এসে মিলিত হবে, যদি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন এর মাধ্যমে আমরা তাদের অন্তর ও বিবেকের দ্বার খুলে দেবার চাবিকাঠি অর্জন করতে পারি।

আমরা যে পরিস্থিতি বা যে ধাপের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাতে চাই এর জন্য আমাদের উচিত এর প্রাথমিক ধাপগুলোতে আল্লাহর বিধি-নিষেধ অব্যাহতভাবে মেনে যাওয়া। সহীহ মুসলিমে এক হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আমি আমার বান্দাদেরকে ‘দ্বীনে হানীফ’ তথা শিরক মুক্ত একনিষ্ঠ ধর্মের উপর সৃষ্টি করেছি। আর শয়তান তাদের কাছে এসে প্ররোচনা দিয়ে তাদের দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং তাদের জন্য যা হালাল করা হয়েছে তা সে হারাম হিসাবে সাব্যস্ত করে এবং আমার সাথে এমন এমন জিনিসকে শিরক করতে আদেশ করে যেসবের ব্যাপারে আমি কোনো প্রমাণ নাযিল করিনি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই হাদিসে বলেন, আল্লাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন কুরাইশদেরকে জ্বালিয়ে দিতে, তখন আমি বললাম, ইয়া রব! এমতাবস্থায় তারা আমার মাথা চুর্ণ করে রুটির মত বানিয়ে ফেলবে। তিনি যেন এটা বলতে চাচ্ছেন যে, হে রব, আমি দূর্বল, আমার আশপাশের লোকজন এদেরকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে না। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন, তারা যেমন আপনাকে বের করে দিয়েছে তেমনি আপনি তাদেরকে বের করে দিন, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন, আমি আপনাকে সাহায্য করবো। আপনি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করুন, আমিও আপনার জন্য ব্যয় করবো। আপনি বাহিনী প্রেরণ করুন, আমি এর পাঁচগুণ প্রেরণ করবো। আপনার অনুগতদেরকে সাথে নিয়ে আপনার বিরোধীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন।

সে পর্যায়ে বা তার কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছা পর্যন্ত আমাদের যে শর্ত ও পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত তা হলো, কাফিরদের মধ্যে বিভ্রান্তির শিকার এমন দলগুলোকে ফিতরাতের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা, যেখান থেকে শয়তান তাদেরকে প্ররোচিত করে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। দূরে সরিয়ে বিভিন্ন সন্দেহ, অস্পষ্টতা ও প্রবৃত্তির পূজায় লিপ্ত করেছে। এমনকি বিশ্বপ্রকৃতি ও নিজেদের দেহসত্ত্বায় থাকা আল্লাহর নিদর্শনগুলো দেখা থেকে বিরত রেখেছে।

আমি বলবো, তরীকা হলো, আমরা কাফেরদের গ্রামে-গঞ্জে, শহরে ‘জ্বালাও-পোড়াও নীতি’ অনুসারে কাজ করবো এবং আল্লাহর অনুগত বান্দাদের সাথে নিয়ে আল্লাহর অবাধ্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো, অতঃপর হয়তো আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করবেন এবং বিশ্ব ও বিশ্ব মানবতাকে তাদের থেকে মুক্তি দিবেন অথবা তাদের হেদায়াতের জন্য তাঁর নিদর্শন ও দলিল-প্রমাণ তাদের সামনে প্রস্ফুটিত করবেন। এটিই আমাদের কাছে বেশি পছন্দনীয়, যেমনটি কুরাইশদের সাথে ঘটেছে।

আল্লাহর নিদর্শনাবলী পরিপূর্ণভাবে ততক্ষণ প্রকাশিত হবে না যতক্ষণ না মুমিনদেরকে আমরা উত্তপ্ত রণময়দানে প্রেরণ করবো। আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেছেন, আপনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন আমি আপনার পক্ষে যুদ্ধ করবো। আপনি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করুন, আমিও আপনার জন্য ব্যয় করবো। আপনি বাহিনী প্রেরণ করুন, আমি এর পাঁচগুণ প্রেরণ করবো। আপনার অনুগতদেরকে সাথে নিয়ে আপনার বিরোধীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন।

এ ক্ষেত্রে যে কোনো প্রকারের শিথিলতা, পশ্চাদগামীতা, দ্বিধাগ্রস্ততা কিংবা যুবকদেরকে ফরজ জিহাদ থেকে বাধা প্রদান করা, এসব কারণে শত্রুর পাঁচগুণ ফেরেশতা পাঠিয়ে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী প্রকাশ পাওয়ার বিষয়টিতে (সমস্যাগুলোর স্তরভেদে) ঘাটতি তৈরি হবে।

প্রচলিত দাওয়া পদ্ধতি কখনোই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল বয়ে আনবে না যদি না এর সাথে যুক্ত হয় এমন নিদর্শনাবলী ও সমসাময়িক মানব দৃষ্টান্ত যা মুমিনদেরকে দৃঢ়পদ রাখবে ও কুফফারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আবার সেসব নিদর্শন কখনোই প্রকাশ পাবে না যতক্ষণ না আমাদের দাওয়া পদ্ধতি সাহাবায়ে কেরামের মানহাজ ও রীতি অনুযায়ী হবে, যেই মানহাজের উপর ভিত্তি করে তাদের বেশিরভাগ আমল ছিল। আর তা হলো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।

সাহাবীদের মাঝে কিছু প্রসিদ্ধ দাঈ হলেন হযরত মুসআব বিন উমাইর রাযি., মুআয বিন জাবাল রাযি. ও প্রমুখ ক্বারী সাহাবীগণ। সাহাবীদের অধিকাংশই ছিলেন দাঈ, পাশাপাশি যোদ্ধা। বরং যারা দাওয়া‘র ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিলেন তারা ছিলেন যোদ্ধা এবং শহীদ।

এ প্রবন্ধে যা বলতে চেয়েছি

আমরা একটি বৃহৎ যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছি, যেখানে আমরা শত্রুদের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে আছি এবং শত্রুরাও আমাদের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে আছে। আবার এ বৃহৎ যুদ্ধক্ষেত্রের ভিতরে রয়েছে ছোট ছোট অনেক যুদ্ধক্ষেত্র। এসব যুদ্ধক্ষেত্রে যখন বিকট শব্দে বোমা বিস্ফোরিত হয় আর মুহুর্মুহু শব্দে গুলিবর্ষণ হয় এবং মৃত্যু যখন একেবারে মাথার সন্নিকটে এসে পড়ে, তখন চোখ থেকে আবরণ সরে যায়, চোখের পর্দা খুলে যায়। তখন যে তাঁর রবের সাক্ষাৎ কামনা করে সে কোনো কিছুরই পরোয়া করে না, তার অবস্থাই যেন তখন বলতে থাকে, মারহাবা! এই ভয়াবহতাকে মারহাবা! যদি এর মাঝেই নিহিত থাকে তোমার সন্তুষ্টি হে আমার মাওলা!

অপরদিকে যে ব্যক্তি তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে না, তার জন্য সেই মুহুর্তটি বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার চূড়ান্ত মুহুর্ত, হয়তো সে ধ্বংস হবে কিংবা আল্লাহ তাকে মুক্তি দিবেন। তখন আমাদের উচিত পরিস্থিতির প্রভাব তার দেহ ও মন থেকে শীতল হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তার অবস্থাকে কাজে লাগানো। সম্ভবত তার মস্তিষ্কে এর প্রভাব দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বড় বড় যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা বিশ্বজুড়ে উত্তপ্ত পরিবেশ-পরিস্থিতির সম্মুখীন। এসব বড় বড় যুদ্ধের পর এবং ছোট ছোট অপারেশনের পর অবশ্যই আমাদের বক্তব্যগুলো বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে, যেন তারা সংঘাতের বাস্তবতা বিবেচনা করতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি, যদি আমরা যুদ্ধের দাবানলকে ছড়িয়ে দিতে পারি এবং যুদ্ধের মাঝেই আমাদের বক্তব্যকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারি (সাথে সাথেই হোক বা কিছু পরে), তাহলে আমরা নিশ্চিত যে, পরিস্থিতি কল্পনাতীত ভাবে পাল্টে যাবে। এগুলো স্বপ্নদৃষ্ট কল্পনা নয়, বরং যুগ যুগ ধরে এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। মুমিনদের এমন যে কোনো দলের সাথেই তা ঘটেছে যে দলটি আল্লাহর ওয়াদার উপর স্থির বিশ্বাস রেখেছে এবং আপন রবের কাছে মাগফিরাত ও দৃঢ়তা কামনা করেছে।

আল্লাহর কাছে কামনা করি, তিনি যেন আমাদের তাওবা কবুল করেন, আমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করেন, আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখেন, কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয় দান করেন এবং এ উম্মতের জন্য এমন হেদায়েতের পথ রচনা করে দেন যা তাঁর অনুগত বান্দাদেরকে সম্মানিত করবে এবং অবাধ্যদেরকে অপমানিত করবে এবং যে পথে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা যাবে। তিনিই এর উপযুক্ত ও এর উপর ক্ষমতাবান। সকল প্রশংসা তারই।

চতুর্থ প্রবন্ধ

প্রকৃতির স্বাভাবিক নীতিঃ যা মুমিন, কাফের উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য

لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

[illegible]

স্বার্থ রক্ষা করবে এবং এ অঞ্চলে ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম হতে বাধা দিতে সক্ষম হবে। ইংরেজদের চলে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে এটি হল একটি ব্যাখ্যা।

এর আরেকটি ব্যাখ্যা হল, ভারত থেকে প্রত্যাহার ছিল (নানা কারণে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে থাকা) তাদের উপনিবেশগুলিকে ছেড়ে যাওয়া এবং সেগুলোকে এমন আন্দোলনের নেতাদের হাতে অর্পন করারই একটি অংশ, যে আন্দোলনের নেতারা বা যাদের আশপাশের লোকগুলো ছিল তাদের অনুগত। ব্যাখ্যা দুটির মধ্যে কোনটি অধিক সম্ভাবনাময় তা নির্ধারণ করা দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং তা আমাদেরকে মূল বিষয়বস্তু থেকেও দূরে সরিয়ে দেবে। (তাই সে দিকে যাচ্ছি না)

সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিরা এ কথাতে একমত এবং পুরোপুরি নিশ্চিত যে, গান্ধীর আন্দোলন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মকে লঙ্ঘন।

পাশাপাশি তারা এ কথাতেও একমত যে, যে কোনো রাষ্ট্র গঠন করা এবং তার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা শক্তি প্রয়োগ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছাড়া সম্ভব নয়। এমনকি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিও যুদ্ধের পরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একদল অন্যদলের উপর বিজয়ী হওয়ার পর বিজয়ীরা এই ধরণের রাজনৈতিক শৃঙ্খলার বিষয়ে চুক্তিতে আসে। এই চিত্রটি একদম বাস্তব।

আর যে নীতিতে সর্ব প্রথম মদীনায় একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল, তা হচ্ছে আউস ও খাজরাজ গোত্রের আনসারদেরকে সশস্ত্রকরণ, যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় থাকালীন সময় থেকেই চাচ্ছিলেন, যেন তিনি তাদেরকে নিয়ে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা শুরু করতে পারেন, যদিও এর জন্য ঘরবাড়ি, পরিবার পরিজন এবং সম্পদ ত্যাগ করতে হয়। কারণ, তিনি জানতেন, সশস্ত্র আনসাররাই মসজিদ, বাড়িঘর, মানুষ, সম্পদ এবং অন্যান্য সব কিছুর উপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। তার চেয়েও স্পষ্ট বিষয় হচ্ছে, (পরবর্তী সময়ে সংঘঠিত বিভিন্ন যুদ্ধে) আল্লাহ সাহায্য ও বিজয় আসার পরই ব্যাপক ভাবে সাধারণ জনগণ ইসলামে প্রবেশ করে এবং ইসলামি রাষ্ট্র বিস্তৃতি লাভ করে। আর এতো নিশ্চিত যে, এটি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই হয়েছিল।

অন্যদিকে অহিংস আন্দোলনের প্রবক্তারা সশস্ত্র আনসার সংগ্রহ করাকে এড়িয়ে চলে। তাদের যুক্তি, এসকল কার্যক্রম তাগুত সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে উস্কে দেবে এবং তারা ধারনা করে, এর ফলে তাদের দাওয়াতি কাজের অর্জনগুলো হুমকির সম্মুখীন হবে। তারা এমন দেশে কিংবা এমন পাহাড়ি এলাকায় হিজরত করা থেকেও বিরত থাকে যেখানে আনসার রয়েছে, রয়েছে জিহাদের প্রশিক্ষণের জন্য নিরাপদ জায়গা। এর কারণ, তারা যেন তাগুতি রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য কাজ করছে, এমন অভিযোগে অভিযুক্ত না হয়। তাদের যুক্তি, তারা এসব রাষ্ট্র থেকে সকল দাঈ ও মুবাল্লিগদেরকে বের করে দেয়া হোক, এটা তারা চায় না। তারা এমনই ধারনা করে (যে, তারা এসব করলে তাগুতি রাষ্ট্রপ্রধানরা এমন করবে)

এর মাধ্যমে তারা মক্কী যুগের শরয়ী নিয়ম নীতি- যা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মও বটে- এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং তাগুতকে প্রতিপক্ষের 'বিষদাঁত তুলে ফেলার নীতি' অবলম্বন করে তাদের দাওয়াতের ফসল নিজেদের ঘরে তোলাকে সহজ করে দিয়েছে। ফলে এ জাতীয় অহিংস আন্দোলনকারীরা একটি অন্ধকার দুষ্টু চক্রে ঘুরপাক খেতে থাকে। ফলে তাদেরকে আবার শুরু থেকে শুরু করতে হবে, বা কখনও তারও পিছন থেকে, বা কখনও কখনও তারা আর শুরুই করতে পারে না। এক্ষেত্রে তিউনিসিয়া আমাদের জন্য একটি শিক্ষা।

খিলাফত পতনের পর যেসকল ইসলামী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাদের অনেকেই এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে দিয়েছে যে, ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে

ফিরিয়ে আনার শরয়ী পদ্ধতি কী? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়ার জন্য বা এর বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করার জন্য প্রচুর সময় এবং প্রচেষ্টা প্রয়োজন, বিশেষ করে যখন অন্য আরও প্রশ্ন রয়েছে যেগুলোর স্পষ্ট কোন উত্তর তারা দিতে পারেনি। হোক তা বাস্তব কোন ঘটনা বলা বা আল্লাহর কোন হুকুম বলা।

যারা বিষয়টির গভীরে গিয়ে চিন্তা করেন তারা বুঝতে পারেন যে, সে সময় খিলাফতের পতন ঘটা এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলো ভেঙে পড়ার কারণ ছিল জনগণের বিপুল পরিমাণ বিরোধিতা, যার বেশিরভাগই ছিল ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বিরোধিতা। কিন্তু আফসোস, এসব আন্দোলনকারীদের বেশিরভাগেরই অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর জানা ছিল না, যে উত্তরটি তাদেরকে সঠিক শরিয়া অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য করতো, যা নিশ্চিতভাবে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এটি এমন একটি সত্য যা গ্রহন করলে তারা তাদেরকে কাছাকাছি সময়ে হোক বা একটু লম্বা সময় পরে হোক এক সময় অবশ্যই পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে সক্ষম হতো। তাছাড়া সঠিক উত্তর জানা থাকলে তাদের বিবেকের উপর জমে থাকা নানান শয়তানী চিন্তা তাদেরকে যে দুষ্ট চক্রের মধ্যে ফেলে রেখেছে তার পরিবর্তে কমপক্ষে তারা প্রথম থেকেই নিজেদেরকে সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারত।

যখন খেলাফতের পতন ঘটে তখন আমাদের সমাজের বামপন্থী এবং ডানপন্থী সবগুলো দলই উন্নয়নশীল পর্যায়ে ছিল। তবে তাদের মধ্যে বামপন্থী দলগুলো তাদের পদক্ষেপগুলোকে শক্তিশালী করে রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিকে বেশ ভাল অগ্রসর হতে পেরেছে। অন্যদিকে ইসলামপন্থী সংগঠনগুলো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নববী তরিকা কোনটি, তা নিয়েই ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকে। এটি সত্যিই খুবই লজ্জাজনক ও দূষনীয় একটি ব্যাপার। অথচ ইসলাম পন্থীদের কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রচুর (মানব সম্পদ ও অর্থ) সম্পদ ছিল। কিন্তু ফলাফল এই হল যে, যাদের তেমন কোন সম্পদ ছিল না তারা খুব সহজেই রাষ্ট্রের শাসক হয়ে ওঠল এবং যাদের প্রচুর সম্পদ ছিল তারা নির্বাসিত হল - তাদের হাতে এক মিটার জমিও থাকল না যেখানে তারা শান্তিতে একটু মারা যেতে পারবে।

অন্যান্য লোকেরা যখন (নিজেদের বানানো পদ্ধতি দিয়ে) রাষ্ট্র গঠন করেছে, (নতুন নতুন) রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছে এবং সেগুলোকে শক্তিশালী করেছে। রাষ্ট্রের সম্পদ সুরক্ষিত করেছে এবং তারা যা যথাযথ মনে করেছে সে অনুযায়ী উম্মাহকে দিক নির্দেশনা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে (বাহ্যত) অনেক কিছু অর্জন করেছে তখন ইসলামপন্থীরা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আদর্শিক পদ্ধতি কোনটি, তা নিয়েই তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত রয়েছে। প্রত্যেকেই দাবি করেছিল, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের পদ্ধতিটি নববী পদ্ধতি থেকে নেওয়া।

আফসোস, কিছু লোক এখনও মনে করেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আদর্শিক পদ্ধতি নিয়ে আরও গবেষণা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আবার ধর্ম সম্পর্কে কিছু ধারণা রাখে এমন অনেককে দেখা যায়, তারা তাগুতের পতন ঘটানোর জন্য বা খেলাফত পুণঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আদর্শ পদ্ধতি কি হবে তা নিয়ে কিছু বলার জন্য লোকদেরকে জড়ো করেন। (অথচ কোরআন-সুন্নাহতে এ বিষয়টি কত সুস্পষ্ট ভাবে বলে দেয়া আছে)

বিভিন্ন রিপোর্ট মতে, হাসান আল-বান্নার সময়ে মিশরে মুসলিম ব্রাদার্সের সংখ্যা ছিল প্রায় এক মিলিয়ন। তখন মিশরের জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক ২০ মিলিয়ন। তাদের বিশেষ সামরিক সংগঠনটির একটি গোয়েন্দা শাখা ছিল, যা তৎকালীন মিশর সরকারের গোয়েন্দা শাখার চেয়েও শক্তিশালী ছিল। তারা অন্যান্য দলগুলোর (উপর নজরদারি করার) জন্য যুবকদের কিছু গ্রুপ তৈরি করেছিল। যারা মিশর সরকারে থাকা ব্রিটিশ সদস্য ও তাদের সহযোগীদের গুপ্তহত্যা করার জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলো। অথচ ফারুকের গোয়েন্দারা এ বিষয়ে কিছুই জানত না। এখানে আমি পাঠককে আহমাদ আদেল কামালের লেখা النقاط فوق الحروف - 'পয়েন্টস অফ দ্য লেটারস' বইটি পড়তে বলবো, যিনি

চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে মুসলিম ব্রাদারহুডের একটি বিশেষ এজেন্সির অন্যতম সদস্য ছিলেন। বইটিতে তিনি তৎকালীন সময়ে তাদের পদ্ধতিগত পদস্খলন এবং ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোর কথা বেশ খোলামেলা ভাবে তুলে ধরেছেন, যে সব ত্রুটি বিচ্যুতির ফলে সে সময় অনেক সুযোগ তাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল।

এতে তিনি দেখিয়েছেন যে, জামাল আবদুল নাসের এমন একটি সংগঠনের উপর ভরসা করত যা ব্রাদার্সের সংগঠনটির চেয়ে অনেক দুর্বল ছিল; ফলে বিপ্লবের আগে এবং বিপ্লবের পরের প্রথম বছরগুলিতে ব্রাদার্সের (মতো শক্তিশালী সংগঠনের) সমর্থন তাকে বেশ সহায়তা করেছিল। স্বভাবতই তখন ব্রাদার্স এমন একটি অবস্থান গ্রহণ করেছিল যা সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ নীতির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। যাই হোক তারা তাদের পথ ও লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। এরপর ধীরে ধীরে তারা এগুলোকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করতে থাকে এবং পিছনে ছুঁড়ে ফেলে, অথচ তারা তখন এই পদ্ধতির (সামান্য) যেটুকু অংশ ধরে রেখেছিল তা ছিল তাদের দৃষ্টিভঙ্গি (মানহাজ) অনুযায়ী একমাত্র সঠিক বিষয়।

শায়খ তানতাবী (আল্লাহ তাঁকে এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন) একটি খুতবার মাধ্যমে পুরো দামেস্ককে আলোড়িত করতে সক্ষম ছিলেন এবং তিনি দামেস্কের জনগণকে তার ইচ্ছামত যে কোন উদ্দেশ্যে কোথাও জড়ো করতে পারতেন। অপর দিকে বাথ পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আল্লাহর শত্রু মিশেল আফলাক কোন প্রতিবাদ সমাবেশের জন্য বা কোন কিছু শিখানোর জন্য একশ লোককেও জড়ো করতে পারতো না। বরং বাথবাদী ও কমিউনিস্টরা তাদের নামের পূর্বে শায়খ বা হাজী টাইটেল লাগানোর আগ পর্যন্ত সিরিয়ার গ্রামের অজ্ঞ লোকদের সমর্থনও তারা পেত না।

(বাস্তবতা হচ্ছে) যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত মুসলমান, তাদের সাথেই রয়েছে আল্লাহ তাআলার তাওফীক (ও সাহায্য)। ফলে লক্ষ্যে পৌঁছানোর সম্ভাবনা কাফেরদের চেয়ে মুসলমানদেরই বেশি। আমাদের শরিয়তের অপর একটি নাম হল, ‘হেদায়েত’। যার অর্থ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য গভীরভাবে উপলব্ধি করা। ফলে লক্ষ্য অর্জন করার জন্য শরিয়ত সম্মত পদ্ধতিটি অন্য যে কোনো পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি শরিয়ত সম্মত পদ্ধতি মোতাবেক চলে, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করার ক্ষেত্রে তার সফল হওয়ার সম্ভাবনা ঐ ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশি যে সে মোতাবেক চলে না।

কেন এখনও পর্যন্ত ওসব শাইখগণ নিজের মনকে একটু জিজ্ঞাসা করেননি যেন, কী কারণে ওসব বেঈমানরা তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারল আর ইসলাম পন্থীরা লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হল? কেন বাথবাদীরা দু-দু'টি রাষ্ট্র গঠন করতে পারল আর ইসলাম পন্থীদের শাইখগণ নিজেদের জন্য নিরাপদ একটু জায়গাও তৈরি করতে পারলেন না? অথচ যুদ্ধের সমস্ত সরঞ্জামাদি ছিল ইসলামপন্থী ও তাদের শাইখের হাতে, যেমনটি আমরা আগেই বর্ণনা করেছি এবং খুব কম সংখ্যাকই ছিল তাদের শত্রুদের হাতে, যা আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

এই প্রশ্নটি কি আমাকে এবং প্রত্যেক যুক্তিবাদী ব্যক্তিকে, যে নিজের বিবেককে অন্যের কাছে বিকিয়ে দেয়নি, এটা বিশ্বাস করতে বাধ্য করে না যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শায়খগণ যা বলেছেন তা নববী তরিকার কোন ভুল নয় বরং নববী তরিকার ভুল ব্যাখ্যা?

নববী তরিকাটি মূলত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক পদ্ধতি। তবে হ্যাঁ, যে কোন শরয়ী বিষয় শরয়ী দলিল দ্বারাই প্রমাণিত হয়। (দলিল ছাড়া কেবল কার্যকর হলেই তা শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয় না)

এ ক্ষেত্রে জঘন্য ভুলগুলোর মধ্যে একটি হল, কারো কারো ধারনা, নববী তরিকার একটি বিশেষ ধারা ও নীতি রয়েছে, যা কিনা অন্য সব মানুষের মাঝে প্রচলিত (যে কোন সমাজ বা রাষ্ট্র) পরিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়ম ও ধারা থেকে আলাদা। যারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নববী তরিকাকে এমন এক বিশেষ পদ্ধতি মনে করে যা কিনা মুসলমানরা ছাড়া আর কেউ জানে না, উপরের কথার মাঝে তাদের এ ধারণার খণ্ডন রয়েছে।

দুনিয়ার বিজ্ঞজনরা তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে স্বাভাবিক যে পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে হুবহু ওটাই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নববী তরিকা, কারণ, ‘রাষ্ট্র’ হচ্ছে একটি জাগতিক জিনিস। ‘রাষ্ট্র’ বলে এমন একটি জিনিস বুঝানো হয় যা সবার কাছে একই। তবে প্রতিটি রাষ্ট্রের কিছু আইন কানুন ও মূল্যবোধ থাকে যা দ্বারা ওই রাষ্ট্রটি পরিচালিত হয়। কোনটিকে বলা হয় ইসলামী রাষ্ট্র, কারণ, তা ইসলামি আইন কানুন দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তার মূল্যবোধগুলি ইসলাম থেকে নেয়া হয়। কোনটিকে বলা হয় কমিউনিস্ট রাষ্ট্র, কারণ তা কমিউনিজমের মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। আর কোনটিকে বলা হয় বাথিস্ট রাষ্ট্র, কারণ তা বাথিস্ট দলের মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্ত ‘রাষ্ট্র’ শব্দের প্রয়োগ সবগুলোর উপরই সমানভাবে হয়। কারণ, রাষ্ট্র একটি জাগতিক জিনিস। ধর্ম ও মূল্যবোধ যাই হোক না কেন জাগতিক জিনিস সব মানুষের কাছেই সমান।

আমি ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ও ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.র মতো পূর্ববর্তী আলেমদের কথা দ্বারা প্রবন্ধের কথাগুলোর দলিল দিতে পারব, তবে কারো বিবেক যদি এই বাস্তব কথাগুলোকে এ সব আলেমদের বক্তব্য শুনা ছাড়া বুঝতে না পারে তাহলে তাদের বক্তব্য শুনেও তেমন কী লাভ হবে?

পূর্বে এক ব্যক্তির মন্তব্যের ব্যাপারে আমি বলেছিলাম যে, ‘তার মন্তব্যটি একটা পর্যায়ে সঠিক।’ (আশা করি) উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে পাঠকের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। তবে আমি এটাও বলেছিলাম যে, এ ক্ষেত্রে কিছু ভিন্নতাও আছে। এর কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ:

- কাফেরদের লক্ষ্যগুলোর মধ্যে এমন কিছু লক্ষ্যও থাকে যেগুলোকে আমাদের শরিয়তও অনুমোদন দেয়, আবার কিছু থাকে যেগুলোকে আমাদের শরিয়ত অনুমোদন দেয় না। সুতরাং প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে যখন লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়ন হতে থাকবে তখন সেখানে শরিয়ত অনুমদিত ও অননুমোদিত দু‘ধরণের বিষয়েরই সংমিশ্রন থাকবে।

কারণ, শরিয়তের প্রতিটি হুকুম এবং যে কোনও লক্ষ্য অর্জনের জন্য শরিয়ত অনুমোদিত বা নির্দেশিত পদ্ধতিটি অবশ্যই ওই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যত পদ্ধতি হতে পারে তার মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য আমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে সবচেয়ে নির্ভুল দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্যই তা আমাদেরকে দিয়েছেন। অপরদিকে দুনিয়ার সব কিছুই আমাদের শরিয়তের অংশ হবে না। যেমন চুরি করেও অর্থ উপার্জন করা যায়, অথচ তা শরিয়ত অনুমোদিত নয়।

- কাফেরদের কিছু লক্ষ্য এমন আছে যেগুলো মুসলমানদের লক্ষ্যগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, আবার কিছু আছে যেগুলো সম্পূর্ণ বিপরীত। উদাহরণস্বরূপ, তাদের একটি লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা; তবে সেই রাষ্ট্রে আধিপত্য ও ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির কাছে কুক্ষিগত থাকে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের রাষ্ট্রে সবাই সমান।

- মুসলমানদের রাষ্ট্রের একটি লক্ষ্য হচ্ছে (মুসলমান-অমুসলমান) সকলের প্রতি সদয় আচরণ করা। যেন যে মানবতাকে শয়তান বিপথগামী করে ফেলেছে, ওই মানবতাকে হেদায়েতের

পথে আনার জন্য দাওয়ার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি হয়। পাশাপাশি বিনা কারণে কারো কোনও সম্পদ যেন বিনষ্ট না হয় এবং কারো রক্ত যেন না ঝরে।

সুতরাং তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের আয়ত্ত্বে থাকা জাগতিক উপকরণগুলো ব্যবহার করা প্রয়োজন। যুদ্ধকে তারা জাগতিক উপকরণ হিসেবেই গ্রহণ করে। এতে তারা শরিয়ত অনুমোদিত জাগতিক সকল উপকরণ গ্রহণ করে। এভাবে তারা তাদের লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করে থাকে। তাই তো তারা কাফের শিশু ও নারীদেরকে নিশানা বানানো থেকে বিরত থাকে, যতক্ষণ না তাতে কোন বৃহত্তর শরয়ী কল্যাণ থাকে – যেমন কোন কোন আলেমের মতে শত্রুরা যেন আমাদের শিশু ও নারীদেরকে নিশানা বানানো থেকে বিরত থাকে, এ উদ্দেশ্যে তাদের শিশু ও নারীদেরকে নিশানা বানানো বৈধ হবে।

- মুসলমানরা শত্রুদেরকে তাদের জাতীয়তার কারণে নিশানা বানায় না। (যেমন, তারা খ্রিষ্টান বা ইহুদি শুধু এ কারণে তাদের কাউকে হত্যা করা হয় না, যতক্ষণ না তারা হত্যাযোগ্য কোন অপরাধ করে) এ জন্যই দেখা যায়, শত্রুদের মধ্যে যারা (নিজের কুফুরি জীবন থেকে) তাওবা করে (ইসলাম গ্রহণ করে) ফেলে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে অনেক সময় আগ থেকেই মুসলমান এমন ব্যক্তিদের চেয়েও ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানে উত্তম মর্যাদা লাভ করে ফেলে। এদিকে কাফেররা এসব নীতির প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করে না, যদি না তাদের একান্ত নিজস্ব লক্ষ্য অর্জনের জন্য বা মুসলমানদের লক্ষ্যগুলো সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য এগুলোর প্রয়োজন দেখা দেয়।

- তেমনিভাবে কাফেরদের জন্য নিজেদের আকিদা বিশ্বাসের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত কোন দলের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে কোন বাধা নেই, যখন উভয় দলের শত্রু অভিন্ন হয়। পক্ষান্তরে মুসলমানদের লক্ষ্যগুলোর মধ্যে একটি লক্ষ্য হল, নিজেদের চিন্তাধারা ও আকিদা বিশ্বাসকে সব ধরণের মিশ্রণ ও দুর্নীতি থেকে মুক্ত রাখা। তাই তারা এই নীতিটি এভাবে অনুসরণ করে না। এই শেষ পয়েন্টটির বিভিন্ন ধাপ রয়েছে এবং তা বিস্তারিতও। (এখানে ওগুলো উল্লেখ করছিনা)

- তেমনিভাবে মতাদর্শের বিজয় এবং পরকালে প্রতিদান পাওয়ার বিষয়টি মুসলমানদের কাছে জাগতিক লাভের চেয়ে অগ্রগণ্য। এজন্যই তারা পরাজিত হলেও শাহাদাত অর্জনের আশায় কিংবা শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ না করার জন্য যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। অপরদিকে কাফেররা নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য অর্জন করা বা বস্তুগত কোন কল্যাণ লাভ করার জন্য - যা একদম কিছুই না পাওয়ার চেয়ে ভালো- আত্মসমর্পণ করতে পারে।

ব্যতিক্রমী এ বিষয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলোকে আমরা আলাদা ভাবে উল্লেখ করতে চাই তা নিম্নরূপঃ

১। আমরা যেসকল শরিয়া লক্ষ্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করছি সে দিকে লক্ষ্য রেখে জাগতিক উপকরণগুলো সীমিত পরিসরে গ্রহণ করা। (যতটুকু দরকার ততটুকুই, এর বেশি না) এ ক্ষেত্রে আমাদের থেকে যেন সীমালংঘন না হয়ে যায়। সুতরাং জিহাদি আন্দোলনের কর্মীরা যখন যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কিত কাফের লেখকদের বই পুস্তক, যেমন গেরিলা যুদ্ধ ও যুদ্ধের নানা কৌশল সম্পর্কিত বিভিন্ন বই পড়েন তখন তাদের উচিৎ, খুব সতর্ক থাকা এবং এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখা যে, তারা তাদের বইয়ে এমন কৌশলও উল্লেখ করে থাকে যার মাধ্যমে আমাদের শরয়ী লক্ষ্যগুলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ লক্ষ্য যেমন অর্জন করা যায় পাশাপাশি সাদৃশ্যপূর্ণ নয় এমন লক্ষ্যও অর্জন করা যায়।

আলহামদুলিল্লাহ গত দশকে বিশুদ্ধ তাওহীদের অনুসারী লেখকদের গবেষণা মূলক প্রচুর লেখা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে কাফের লেখকদের লিখিত যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কিত বইগুলোকে অবৈধ বিষয়াদি থেকে মুক্ত করা হয়েছে। (অতএব কাফের

লেখকদের বইগুলো না পড়ে এগুলোই পড়া চাই) হ্যাঁ, কাফের লেখকদের কিছু কিছু বই পড়া প্রয়োজন হতে পারে যখন ওই বিষয়ে সংশোধিত বই না পাওয়া যাবে। (তখন পড়া যেতে পারে তবে খুব সতর্ক থাকতে হবে)

বিগত দশকগুলোতে এমন কিছু কিছু দলের বই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল যারা প্রতারণা ও বিভ্রান্তির মাধ্যমে কাফেরদের বেশিরভাগ রাজনৈতিক ও সামরিক পদ্ধতিকে বৈধতা দিয়েছিল, বিশেষ করে তাদের রাজনৈতিক পদ্ধতিগুলোকে। তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অবাস্তব এক দাবী করে যে, এগুলো নববী ও শরয়ি নীতি থেকেই নেয়া হয়েছে, যেখানে তখন এ বিষয়ে গোছানো আলোচনা পাওয়াই দুষ্কর ছিল।

এখানে আমি একটি বিষয়ে সতর্ক করছি যে, রাজনীতি, নিরাপত্তা এবং সামরিক বিষয়ে যেসব বই ব্রাদার্সের মতো বিভ্রান্ত কিছু কিছু দল প্রকাশ করেছে সেগুলো কাফের লেখকদের লেখা বইগুলোর চেয়েও বেশি মারাত্মক। কারণ, তারা কোরআন-সুন্নাহ এবং সীরাহ‘র বিভিন্ন ঘটনাবলীকে বিকৃত করে (নিজেদের ভ্রান্ত মতাদর্শের পক্ষে) প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করে থাকে। (তাই পাঠকদের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে) পক্ষান্তরে কাফেরদের লেখা বইগুলো পড়ার সময় সবাই এ কথা জেনেই পড়ে যে, এগুলো কাফেরদের লেখা বই। (তাই বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব একটা থাকে না)

জিহাদি গ্রুপগুলোর বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামোতে ব্রাদার্সের চিন্তা-চেতনার অনুপ্রবেশ খুবই বিপজ্জনক ও ধ্বংসাত্মক। আর যদি জিহাদের দাওয়া গ্রুপ হয় তবে ক্ষতির মাত্রা আরও বেশি। এর কারণ, ব্রাদার্সের কোন কোন নেতার আগের কিছু বইয়ে জিহাদের প্রতি দাওয়া আছে। ফলে ওসব বই যারা পড়বে তারা ভাববে, এ বিষয়ে লেখকের বুঝ অত্যন্ত পাকা। অথচ তারা বুদ্ধিবৃত্তিক বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। বলতে গেলে যারাই তাদের সাথে যুক্ত হয়েছে একমাত্র শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ ছাড়া প্রায় কেউই তাদের বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পায়নি। বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গেলে আলোচনা দীর্ঘ হবে। (তাই এখানে তা করছি না।)

প্রথম আফগান জিহাদে হেকমতিয়ার (আল্লাহ তাআলা তাকে এবং আমাদের সবাইকে হেদায়েত দান করুন), সাইয়াফ এবং রাব্বানীর সাথে যা ঘটেছিল তা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। প্রবন্ধটি দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে আমি দেখাতাম যে, তারা যে সব মূলনীতির উপর নিজেদেরকে গড়ে তুলছিল তা কীভাবে ব্রাদার্সের বিকৃত বইগুলো থেকেই নেয়া হয়েছিল, যদিও মূলনীতিগুলো অনারবি ভাষায় হওয়ায় ওগুলোকে ওভাবে যাচাই করে দেখা সম্ভব হয়নি। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে, আল্লাহ যখন কোনো অনারবি ব্যক্তির মঙ্গল চান তখন তাকে সুন্নাহর অনুসারী কোন ব্যক্তির দিকে পথ দেখান।

২। দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমাদের জানা উচিত – এটি অবশ্য প্রথমটির সাথেও সম্পৃক্ত - তা হল, ইসলামের রাষ্ট্রনীতি যখন প্রকৃতির স্বাভাবিক নীতি বা জাগতিক নীতিগুলোকে গ্রহণ করে -যেগুলোকে কাফেররাও গ্রহণ করে থাকে- তখন সেগুলোকে তার আদর্শ রূপরেখার উপরই গ্রহণ করে থাকে।

উদাহরণত, বামপন্থী আন্দোলনগুলো অর্থনৈতিক দিকটিকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাদের ও তাদের শত্রুদের আন্দোলনে এর একটি বিরাট প্রভাব রয়েছে। অর্থনীতিকে তারা মানুষের মাঝে পারস্পরিক সংঘাত ও লড়াইয়ের জন্য সবচেয়ে বড় চালিকা শক্তি মনে করে। পক্ষান্তরে আমাদের শরিয়া পলিসি অর্থনীতির ভূমিকা এবং মানুষের উপর এর প্রভাবকে অবহেলা করে না। তবে অর্থনীতিকেই পারস্পরিক সংঘাতের একক অনুঘটক বা প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে না, বিশেষত ঈমানদারদের ক্ষেত্রে। আমাদের শরিয়ত সৃষ্টিকর্তার দাসত্ব করতে গিয়ে মুমিনের আত্মার যে চাহিদা বা প্রয়োজন রয়েছে এর উপর জোর দিয়ে থাকে। আর এটাই হচ্ছে (কাফেরদের সাথে মুমিনদের) সংঘাতের সবচেয়ে বড় উদ্দীপক ও অনুঘটক। কারো সহজাত চরিত্রে বিকৃতি না ঘটে থাকলে তার সুস্থ চরিত্রের দাবি এমনই হয়ে থাকে। পাশাপাশি আমাদের শরিয়ত (শত্রুর সাথে) সংঘাতের ক্ষেত্রে

অর্থনৈতিক ভূমিকার উপর ততটুকু গুরুত্বারোপই করে থাকে যতটুকু বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শত্রুপক্ষের অধিকাংশ নেতা এবং বহু সৈনিক ও অনুসারীদের কাছে এ অর্থনীতিই হল (সংঘাতের) প্রধান কারণ। এজন্যই শত্রুদের উপর অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করা শরিয়া পলিসির একটি অংশ। (এতো হল সম্পদের ক্ষেত্রে কাফেরদের অবস্থা) অপরদিকে মুমিনদের অবস্থা এ ক্ষেত্রে একদম ভিন্ন। শরিয়ত এ কথা অস্বীকার করে না যে, কিছু কিছু নও মুসলিম ও দূর্বল ঈমানদারদের ক্ষেত্রে সম্পদ অনুপ্রেরণাদানকারীর ভূমিকা পালন করে, আর কিছু কিছু ঈমানদারদের জন্য তা হয় গৌণ ও দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়। তবে এটি মুমিনদেরকে উৎসাহিত করার জন্য ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

অবশ্য শরীয়ত সম্পদকে মুমিন ও কাফেরদের মধ্যকার যুদ্ধ ও সংঘাতের ক্ষেত্রে জ্বালানির মতো মৌলিক উপাদান হিসেবে গুরুত্ব দেয়। তাই তো কোরআনে একটি আয়াত এসেছে যা নির্দেশ করে যে, সম্পদ হচ্ছে যুদ্ধের ধমনী এবং যুদ্ধের খাতে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাতে সম্পদ ব্যয় না করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশপাশের লোকজন তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে। তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই বলে মুমিনদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে, যদি যুদ্ধের খাতে এবং তাদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাতে সম্পদশালীদের অর্থ আসার পথ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে (আল্লাহ অন্যভাবে এসবের ব্যবস্থা করে দিবেন। কারণ,) আসমান ও যমীনের সকল ভাণ্ডার আল্লাহরই [সূরা আল মুনাফিকূন ৬৩/৭]।

এসবের পাশাপাশি মুমিনদেরকে আল্লাহর পথে নিজের সম্পদ ব্যয় করতে উৎসাহিত করা এবং যাকাত, গনিমত ও এ জাতীয় শরীয়তের হুকুম আহকাম যার মাধ্যমে সম্পদের ব্যবস্থা হয়, এগুলোর প্রতি গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টি তো আছেই।

এই বিষয়ে আরেকটি উদাহরণ পেশ করছি, তা হচ্ছে গোপনীয়তা। আমরা দেখতে পাই যে, সামরিক বিষয়ে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবে গোপনীয়তার গুরুত্বকে আমাদের শরিয়ত অবহেলা করে না। তবে তা এ কথাও ভুলে যায় না যে, আমরা মূলত একটি হেদায়েতের আন্দোলন করে যাচ্ছি। (যার উদ্দেশ্য হচ্ছে, হেদায়েতের আলোকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া) তাই আমরা যদি গোপনীয়তা অবলম্বন করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করি তাহলে আমরা হেদায়েতের আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ছেড়ে মাফিয়া গ্যাং বা গোপন আন্দোলগুলোর প্রেক্ষাপটে ঢুকে যাবো। গোপনীয়তার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা হলে আন্দোলনের সদস্য বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হবে, দেখা যাবে, দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পরও এর সদস্য সংখ্যা হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র। পাশাপাশি সদস্যদের গুনগতমান বৃদ্ধিও বাধাগ্রস্ত হবে। গুনগতমান বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি মূল বইয়ের উপসংহারে উল্লেখ করেছি। এ জন্যই আমাদের শরিয়ত প্রকৃতির স্বাভাবিক এই নীতিটিকে অর্থাৎ গোপনীয়তাকে (বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়িমুক্ত) একটি আদর্শরূপে গ্রহণ করে থাকে, যা আন্দোলন এবং ইসলামি পদ্ধতির জন্য উপযুক্ত।

এই বিষয়টির উদাহরণগুলোর মধ্যে সামরিক অভ্যুত্থান সম্পর্কিত একটি উদাহরণও মূল বইয়ের উপসংহারে উল্লেখ করেছি। সেখানে উল্লেখ করেছি যে, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রকৃতির স্বাভাবিক নীতি হিসেবে এর মাধ্যমে কখনও কখনও সফলতা আসলেও তা আংশিক ভাবে আসে। কারণ, এর উপাদানগুলো ত্রুটিপূর্ণ। তাই ত্রুটিপূর্ণ ফলাফলই প্রকাশ পায়, যা উল্টে যেতেও দেরি হয় না। এটি এমন একটি সমাধান যা আমাদের আন্দোলনের পরিপূরক অংশ হিসেবে গৃহিত হতে পারে, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত হতে পারে না। (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের একদম শেষ দিকে ইয়েমেনের এক মিথ্যা নবুওয়তের দাবীদার) আসওয়াদ আল আনসির বিরুদ্ধে হযরত ফাইরুয দাইলামী রাযি.র নেতৃত্বে এ পদ্ধতিটি কার্যকর হয়েছিলো। এ পদ্ধতিকে বলা হয় সামরিক অভ্যুত্থান। হ্যাঁ, এটি এমন একটি পদ্ধতি যেখানে সুন্নাহ‘র একটি দিক অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি অবলম্বনকারীদের পক্ষে কখনো কখনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব, তবে ওই রাষ্ট্রের জন্য পূর্ণাঙ্গ ইসলামী

রূপরেখার উপর টিকে থাকা বেশ কঠিন। হ্যাঁ, তবে যদি এই পদ্ধতিকে পূর্ণাঙ্গ সুন্নাহসম্মত পদ্ধতির আংশিক পদক্ষেপ ও আংশিক কলা-কৌশল হিসেবে ধরা হয় (যা মূলত এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়) তাহলে ভিন্ন কথা। হযরত ফাইরুয দাইলামী রাযি.র পদ্ধতিটি ইসলামী পদ্ধতির একটি অংশ ছিল মাত্র, এটিই মূল পদ্ধতি ছিল না। মনে রাখবেন, অনৈসলামিক আন্দোলন -যার একমাত্র লক্ষ্য হলো ক্ষমতা লাভ করা- তার জন্য এটি কখনো কখনো পূর্ণাঙ্গ সমাধান হতে পারে। তবে ইসলামিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে (একে পূর্ণাঙ্গ সমাধান বলা যায় না। কারণ, ইসলামিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ক্ষমতা লাভ করা ছাড়া) আরও বিভিন্ন লক্ষ্য থাকে।

প্রথম এবং দ্বিতীয় পয়েন্টের একত্রে আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে ওই সকল প্রতিষ্ঠান, যেগুলো থেকে প্রথমে কোন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, পরবর্তীতে তা থেকে রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে। যেমন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এগুলো ওই সকল জরুরি বিষয়ের মধ্যে পড়ে যেগুলোর নির্দেশ শরিয়ত (আমাদেরকে) দিয়েছে, কোনোটা ব্যাপক নির্দেশনার আওতায়, কোনোটা সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার আওতায়। তবে কেউ কেউ আবার অপরিপক্ব ভাবে বা শরিয়ত অনুমোদিত আদর্শ পদ্ধতি গ্রহণ না করে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিল এবং এ ক্ষেত্রে তারা ইহুদি, রাফেযি এবং তাগুতি রাজনৈতিক দলগুলোর অনুকরণ করার চেষ্টা করেছিলা, ফলে অনিবার্যভাবে তাদের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়।

দেখা যায়, ইহুদিরা (এ ধরণের কোন প্রতিষ্ঠান করার জন্য) প্রথমে ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব যাদের হাতে আছে, তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়, যদিও তারা তাদেরকে কাফের মনে করে। যেমন, ইহুদিরা খ্রিস্টানদেরকে কাফের মনে করে, কিন্তু তারা তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আছে এমন যে কোনো কাফেরের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়েই তাদের প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলো প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ জন্যই আমরা কখনও কখনও ইসলামী নির্দেশনা মূলক কিছু কিছু আলোচনাতে প্রকৃতির স্বাভাবিক যে নীতি তার প্রতি গুরুত্ব দেয়ার বিষয়টি দেখতে পাই কিন্তু আমরা যখন ওগুলোর প্রয়োগের দিকে তাকাই তখন ওখানে সুস্পষ্ট কিছু ত্রুটি দেখতে পাই। উদাহরণত, শাইখ হাকেম আল মুতাইরী, যিনি কুয়েতের সালাফি আন্দোলনের সেক্রেটারি জেনারেল, তিনি ‘ইসলাম টুডে’-‘আল ইসলাম আল ইয়াওম’ নামক এক সাইটে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, ইসলামী আন্দোলনগুলো কীভাবে ক্ষমতার অর্জনের নীতি এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা ও প্রথমে কর্তৃত্ব অর্জন করার বিষয়টিকে উপেক্ষা করে থাকে আর এটি কীভাবে তাদেরকে একটি দুষ্ট চক্রের মধ্যে ফেলে রাখে। এমনকি তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, তাদের বেশিরভাগ আলেম উলামা এবং দাঈগন এই ঐশ্বরিক নীতি থেকে বিপথগামী হয়েছিল। তিনি আরও বলেছেন, কর্তৃত্ব অর্জন করা ছাড়া এই আন্দোলনগুলো হাজার বছর পার হয়ে গেলেও বিপুল সংখ্যক লোক আকর্ষণ করতে পারে না। (এতো হল শাইখের কথা কিন্তু) আমরা যখন এর প্রয়োগের দিকে তাকাই তখন দেখতে পাই যে, তার আন্দোলনটি তাঁর দেশের ক্ষমতাসীন তাগুতদের নৈকট্য লাভের মাধ্যমেই ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করছে। এমনকি আমেরিকানদের নৈকট্য লাভের মাধ্যমেও তারা এ চেষ্টা করছে। সম্প্রতি তারা যখন মার্কিন দূতাবাসে মার্কিন এক প্রতিনিধির সাথে মিলিত হয়েছিলেন তখন তিনি এবং তার আন্দোলনের নেতারা সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এ অঞ্চলে আমেরিকানদের পরিকল্পনায় অনেক কল্যাণ রয়েছে! (এবার বলুন) ইহুদের পদ্ধতি এবং তাদের পদ্ধতির মাঝে কী পার্থক্য থাকল? কেবল একটিমাত্র পার্থক্যই বাকি থাকল। আর তা হল, ইহুদিরা কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিদের নৈকট্য লাভ করার জন্য তাদের নারীদেরকে ব্যবহার করে, (যা তারা করে না। এ পার্থক্যটি ছাড়া আর কী বাকি রইল?)

সারকথা

সারকথা হল, বৈধ উপায়ে অর্জিত বৈধ ক্ষমতার মাধ্যমে কোন সংগঠন গড়ে তোলাকে ইসলাম বৈধতা দেয়, পাশাপাশি এও সতর্ক করে যে, শরীয়ত কোনও সংগঠন বা অন্য কিছু প্রতিষ্ঠা

করাকে নিষেধ করে না - যা প্রাথমিক পর্যায়ে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ছাড়াই অর্জন করা যায় - যতক্ষণ তা বৈধ পন্থায় হয় এবং যথাযথ সময়ে শুরু করা হয়।

পরিশেষে, আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, দুনিয়াতে প্রকৃতির এমন কিছু স্বাভাবিক নিয়ম-নীতি আছে, যেগুলোকে ছাড়াও যাবে না, আবার এগুলোর বিরোধিতাও করা যাবে না। এসব স্বাভাবিক নিয়ম-নীতির সামনে যে-ই বাধা হয়ে দাঁড়ায় কিংবা যে-ই ওগুলোকে ক্রিড়াচ্ছলে গ্রহণ করে কিংবা আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর যিকির ও ইবাদত নিয়ে ব্যস্ত থাকার অজুহাতে উপেক্ষা করে - তাকেই প্রকৃতির এই নিয়মগুলো পিষে ফেলে। ঐশ্বরিক এই নীতিগুলো কারও পক্ষপাতিত্ব করে না এবং কারও ইচ্ছায় পিছিয়েও থাকে না, সে যেই হোক না কেন। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের প্রতি একটি পরিপূর্ণ অনুগ্রহ।

সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ছিলেন সর্বোত্তম জামাত যারা জাগতিক বিষয়াদির ওপর পূর্ণাঙ্গ দক্ষতা এবং শরয়ী বিষয়াদির ওপর পাকাপোক্ত বুঝের সমন্বয় ঘটাতে পেরেছিলেন। এ জন্যই তাঁরা দ্বীনী নেতৃত্ব এবং জাগতিক কর্তৃত্ব লাভের উপযুক্ত হয়েছিলেন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে তাঁদের পথে পরিচালিত করেন এবং (জান্নাতে) তাঁদের সাথে মিলিত করেন। নিঃসন্দেহে তিনিই সব কিছুর অভিভাবক এবং সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।([26]) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা।

## পঞ্চম প্রবন্ধ

## আমাদের পথ পুরো বিশ্ববাসীর জন্য রহমত

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.

আমি আপনাকে পুরো বিশ্বজগতের জন্য শুধুই রহমত রূপে প্রেরণ করেছি। সূরা আম্বিয়া ১০৭

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী এবং রাসূল, হেদায়েতের মশালধারী, বিশ্বজগতের রহমত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, যাকে কেয়ামতের পূর্বলগ্নে তরবারি দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন শুধু এক আল্লাহর উপাসনা হয় এবং যার বিরোধিতাকারীদের জন্য ধার্য করা হয়েছে লাঞ্চনা ও অপমান। এবং (সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) তাঁর পরিবার ও সাথীবর্গের উপর এবং যারা তাঁর অনুপম আদর্শকে নিজেদের জীবনে ধারণ করেছেন তাদের উপর।

যিনি এই সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ধর্ম নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবেন, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য ধার্যকৃত সকল বিধানে রহমতের ছাপ খুঁজে পাবেন।

যদি ইবাদাতের কথা ধরি, তাহলে অন্যান্য ইবাদত তো আছেই এমনকি যেসব ইবাদত পালন করতে কষ্ট হয় ও যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়, সেগুলোও যখন কেউ কষ্ট করে পালন করবে, তখন সে ব্যক্তিজীবনে ও সামাজিক জীবনে বিভিন্ন দিক থেকে নিজের দিকে রহমত ছুটে আসতে দেখবে।

আর পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে, (আমাদের এই ইসলাম ধর্মে) পুরো মানবজাতির জন্য লেনদেনের একটি সুস্পষ্ট পথ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। একটি সমাজে মানুষের পারস্পরিক আদব-আখলাক কিরূপ হবে, এমনকি সমাজের ক্ষুদ্র একটি অংশ অর্থাৎ পারিবারিক জীবনে পারস্পরিক শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণ কিরূপ হবে সে দিকনির্দেশনাও তিনি দিয়ে দিয়েছেন। আবার প্রতিবেশী বিভিন্ন সমাজের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ হবে এ ব্যাপারেও এমন এমন দিকনির্দেশনা দিয়েছেন যা এ

ধর্মটি যে ঐশী ধর্ম তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং এ কথা বুঝিয়ে দেয় যে, বান্দার প্রতি যিনি অতিশয় মেহেরবান সেই রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকেই এ ধর্ম এসেছে।

কেউ কেউ হয়তো অবাক হন যখন আমরা বলি যে- শরিয়তের যেসব বিধান বান্দার জন্য সবচেয়ে বেশি রহমত বয়ে আনে তন্মধ্যে জিহাদের বিধানটি অন্যতম, যদিও বাহ্যত মনে হয় তাতে রয়েছে ছিন্নভিন্ন দেহ, খুলি আর রক্তপাতের মত বিষয় এবং এর বৈশিষ্ট্য হলো হত্যা, হানাহানি আর কাটাকাটি।

বিশেষত আমাদের শরিয়তে এ ইবাদতটির এমন এমন অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে –যেগুলো শুধুমাত্র আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর অনুসারীদের জন্যই দেয়া হয়েছে - এসব বৈশিষ্ট্য এ ইবাদতটিকে খুবই উত্তমভাবে এ আয়াতের প্রতিচ্ছবি হিসেবে তুলে ধরে।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.

আমি আপনাকে পুরো বিশ্বজগতের জন্য শুধুই রহমত রূপে প্রেরণ করেছি। সূরা আম্বিয়া ১০৭

বেশকিছু প্রশ্ন**,** যেগুলোর উত্তর খুঁজতে গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজনঃ

- ইসলাম কেন এ ইবাদতকে এত গুরুত্ব দেয়? এমনকি তাকে ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া আখ্যা দেয়।
- কেউ যদি জিহাদ ফরজ হয়ে যাওয়ার পর তা পরিত্যাগ করে, তাহলে শরিয়ত কেন তাকে মুনাফিক আখ্যা দেয়? এমনকি কারো অন্তরে যদি এর প্রতি আগ্রহবোধ জাগ্রত না হয়, তাহলে সে নিফাকের একটি বিরাট অংশ নিজের মধ্যে ধারণ করে।
- কেন বিধানদাতা এর মাধ্যমে অর্জিত রিযিককে সর্বোত্তম রিযিক ঘোষণা দিয়ে এর প্রতি বান্দাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন? যেন জীবনধারণের জন্য আবশ্যকীয় রিযিক উপার্জন করতে গিয়ে কেউ জিহাদ পরিত্যাগ না করে।
- এটি পুরো বিশ্বজগতের জন্য রহমত কীভাবে **?**

আমরা এই প্রশ্নগুলো রেখেছি যেন মুমিনগণ এগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে এবং এগুলো অনুধাবন করতে পারে। এই নিবন্ধে আমরা শেষ প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করবো। আল্লাহর তাওফিক কামনা করে পরবর্তী আলোচনায় যাচ্ছি।

রাব্বুল আলামীনের দেয়া এই ইবাদতের প্রতি -তার আনুষাঙ্গিক যাবতীয় বিষয় সহকারে - যারা শত্রুতা পোষণ করে তারা হয় চরমপন্থী বা কুচক্রী কিংবা মূর্খ। যদিও ‘মূর্খ’ শব্দের মধ্যে সবগুলোই এসে যায়।

১। চরমপন্থী গোষ্ঠী - ইসলামের কঠোর বিরোধী ও নির্বোধ কুফফার গোষ্ঠী। অর্থাৎ ইহুদি, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মের সেসব কুফফার চক্র যারা ইসলামের যাবতীয় বিধানের ব্যাপারে রূঢ়তা, কঠোরতা ও নির্দয়তার অপবাদ দিয়ে থাকে, যাদের উত্তরসূরীরাই ওদের নির্বুদ্ধিতার ব্যাপারে অভিযোগ করে থাকে।

২। কুচক্রী গোষ্ঠী - আগে যাদের বিবরণ গেছে তারাই, সাথে সাথে সে সব লোক যারা এ বুলি আওড়ায় যে, ইসলাম দয়া ও শান্তির ধর্ম, তবে জিহাদ হচ্ছে প্রান্তিকতা ও বাড়াবাড়ি!! এর সাথে ইসলামের কোনও সম্পর্ক নেই!

৩। মূর্খ **-** যাদের মধ্যে বাড়াবাড়ি, কুটিলতা, মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা - এ সবগুলোই রয়েছে বা এর কিছু রয়েছে এরা হচ্ছে আমাদেরই স্বজাতি, যারা আমাদের পূর্ববর্তী জাতি

বনি ইসরাইলের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করেছে, তারা কোনো গুঁইসাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকলে এরাও তা-ই করেছে।

এদের কেউ কেউ তো পুরোপুরি মুরতাদ হয়ে গেছে। যেমন জাতীয়তাবাদী দল, গণতান্ত্রিক দল এবং বাথপার্টি। আর কেউ কেউ (মুরতাদ না হলেও) গোমরাহীতে নিমজ্জিত। যেমন, শান্তিপ্রিয় কিছু কিছু ইসলামী আন্দোলন।

এ দু'গ্রুপের মাঝে পার্থক্য হলো, মুরতাদ গ্রুপগুলো 'আক্রমণাত্মক জিহাদ'কে ইসলামী শরিয়তের অংশ বলে অস্বীকার করলেও 'প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ'কে তারা বিভিন্ন পর্যায়ে স্বীকার করে এবং এর প্রতি আহবানও জানায়। যদিও এক্ষেত্রে তাদের মাঝে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে।

অপরদিকে শান্তিপ্রিয় ইসলামী আন্দোলনগুলো তাত্ত্বিকভাবে 'আক্রমণাত্মক' এবং 'রক্ষনাত্মক' জিহাদের স্বীকৃতি দিলেও উভয় প্রকার জিহাদের জন্যই এমন এমন শর্তারোপ করে, যেসব শর্ত ওহী নাযিল হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি কখনোই পাওয়া যায়নি। (তাদের মনগড়া) ওসব শর্ত না পাওয়া গেলে তাদের মতে জিহাদ রহমত তো হবেই না, বরং ফাসাদ তৈরিতে সহায়ক বলে বিবেচিত হবে।

এখানে আমরা যে বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করবো তা হল, এ কথা স্পষ্ট করা যে, উপরোক্ত তিনটি গোষ্ঠী–কাফের, মুরতাদ, গোমরাহ- তারা এমন পথ ও পন্থা অবলম্বন করেছে যা মানবতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে এবং রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে দেয়া রহমত থেকে মানবজাতিকে দিন দিন দূরে ঠেলে দিচ্ছে।

অথচ জিহাদ যাকে শয়তান মানব মস্তিষ্কে এই বলে চিত্রায়িত করছে যে, তা হত্যা ও রক্তপাতে ভরপুর- সেই জিহাদ মূলত মানবজাতির জন্য রহমত লাভের সর্বোত্তম পন্থা এবং জীবনের নিরাপত্তা লাভের সর্বোত্তম উপায়।

প্রথমত, আমাদের জানা উচিত- এই সুবিশাল ও সুনিপুণ বিশ্বজগতের স্রষ্টা তিনিই হবেন যার রয়েছে নানাবিধ উত্তম গুণাবলী এবং এসব গুণাবলীতে সর্বোচ্চ পূর্ণতা। তিনি হবেন- খালিক, বারি' ও মুছাওয়্যির-সৃষ্টিকর্তা, কারিগর ও রূপকার। তিনি হবেন- রহমান, রহীম - পরম দয়ালু ও করুণাময়। তিনি হবেন- মুনতাকিম, জাব্বার ও মুতাকাব্বির-প্রতিশোধ গ্রহণকারী, শক্তিধর, গৌরবান্বিত এবং এটাও জানা উচিত যে, এ বিশ্বজগতে শরঈ নিয়মে এবং মহাজাগতিক নিয়মে যা কিছুই ঘটে সবকিছু মূলত মহান রাব্বুল আলামীনের নাম ও গুণাবলীরই প্রতিফলন।

বান্দার প্রতি তাঁর রহমতের পূর্ণতা এটাও যে, যুগে যুগে তিনি তাঁর বান্দাদেরকে যেসব ফরয বিধান দান করেছেন সেগুলোর উপকারিতা ও লাভ-পূর্ববর্তী নবীদের অভিজ্ঞতাগুলো উল্লেখ করে- নিজ নিজ যুগের নবীর যবানে বান্দাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। যেন বিধান প্রণয়নে আল্লাহ তা'আলার যে হিকমাহ ও প্রজ্ঞা রয়েছে তা বান্দার সামনে স্পষ্ট হয় এবং নবী ও তাঁর অনুসারীরা বুঝতে পারে যে, এই বিধানটি মহান আল্লাহর হিকমাহ তথা প্রজ্ঞা দ্বারা সমর্থিত। সুতরাং তিনি তাদেরকে সর্বদিক থেকে যা হক তার প্রতিই আহ্বান করছেন। ফলে বান্দাগণ স্বানন্দে তা গ্রহণ করে নিতে উৎসাহিত হয়। যেহেতু তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য যে বিধানই প্রণয়ন করেন, তা মহাজাগতিক বাস্তবতার সাথে (বা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের সাথে) সামঞ্জস্য রেখেই করেন। যা অস্থির মানবাত্মার মাঝে স্থিরতা ও দৃঢ়তা তৈরি করে। যেহেতু সে জানে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা বলেছেন ও যে বিধান দিয়েছেন তা সৃষ্টির প্রাকৃতিক ধারার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا . وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ
مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا . إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا . رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ
دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا .

তাদের গুনাহের কারণেই তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল, তারপর তাদেরকে দাখিল করা হয়েছিল আগুনে, আর আল্লাহ ছাড়া তারা অন্য কোনো সাহায্যকারী পায়নি। নূহ আরও বলেছিল, হে আমার রব! এই কাফেরদের মধ্য হতে কোনো বাসিন্দাকেই পৃথিবীতে বাকি রাখবেন না। আপনি তাদেরকে বাকি রাখলে তারা আপনার বান্দাদেরকে বিপথগামী করবে এবং তাদের যে সন্তানাদি জন্ম নিবে তারাও পাপিষ্ঠ ও ঘোর কাফেরই হবে। হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার পিতা-মাতাকেও এবং প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকেও যে ঈমানের অবস্থায় আমার ঘরে প্রবেশ করেছে, আর সমস্ত মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকেও। আর যারা জালেম তাদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন। [সূরা নূহ : ২৫-২৮]

এটাও মূলত দুনিয়া ও আখিরাতে মানবতার প্রতি পরিপূর্ণ রহমত।

প্রথমত **:** মানবজাতির মাঝে কুফর, শিরক, অন্যায়-অবিচার ছেয়ে যাওয়ার পর যখন তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়, তখন তাদের পরবর্তী প্রজন্মের মাধ্যমে পৃথিবীতে বিপর্যয়ের যে সুযোগ ছিল, তা আর থাকে না।

দ্বিতীয়ত **:** আগত প্রজন্মকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দেওয়া হয়। (যদি এই আযাব সকল কাফেরদের শেষ না করে দিত তাহলে) হয়তো বা পরবর্তী প্রজন্মে এমন কেউ আসতো যারা আল্লাহর এ আযাব দেখার পর একটা সময় পর্যন্ত প্রভাবিত হতো ঠিকই কিন্তু কিছু দিন পর আবার ভুলে যেত এবং আল্লাহর শত্রু ও বনী আদমের শত্রু ইবলিস তাদেরকে পুনরায় পথভ্রষ্ট করার মাধ্যমে নিজ মিশনে সফলতা লাভ করতো।

পাশাপাশি একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় যা সকলের জানা উচিত তা হলো**,** দুনিয়াবী শাস্তি মুশরিক**,** কাফের**,** জালেম**,** এমনকি ওই সমস্ত মুমিন যারা অসৎ কাজে বাধা দেয়নি তাদের উপরেও আসে।

পক্ষান্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশেষ বার্তা দিয়ে যখন আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠানো হলো, তাকে পুরো বিশ্বজগতের জন্য রহমত বানিয়ে পাঠানো হলো। আর তাঁর প্রতি যেসব বিধান অবতীর্ণ হলো তা ছিল মানবজাতির জন্য সর্বোচ্চ রহমত সম্বলিত।

আর এরই মধ্য হতে একটি বিধান হলো 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'। একসাথে সবার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ভয়ংকর আযাব আসার তুলনায় এটি মানবতার জন্য অনেক বেশি রহমত সম্বলিত বিধান। সুতরাং আল্লাহ তাআলা এ উম্মতকে যে বিধান দিলেন তা হলো, যারা শাস্তির উপযুক্ত তাদেরকে মুমিনদের হাতেই শাস্তি দেওয়া হবে। আবার কখনও কখনও আল্লাহ তা'আলা নিজেও শাস্তি দেন, যখন মুমিনরা শাস্তি প্রদানে দেরি করে বা অসৎকাজে বাধা প্রদানের ক্ষেত্রে এবং জিহাদের ক্ষেত্রে অবহেলা করে। তবে কখনো আবার মুজাহিদীনের সহযোগিতায় ক্ষুদ্রাকারে শাস্তি নাযিল করেন, বিশেষ করে যখন তারা দূর্বল থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ . وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দিবেন। তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন এবং তাঁদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করবেন, আল্লাহ পূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী। [সূরা তাওবা ১৪-১৫]

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ . وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ .

সুতরাং তাদের উপর তরবারির শাস্তি নেমে আসার মাধ্যমে তাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রহমত হলো। যার ফলে পরবর্তী প্রজন্মে যাদের ভাগ্যে হিদায়েত লিখা আছে তারা ফিরে আসবে।

- আহলে কিবলা অর্থাৎ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যারা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় - তাদের বিরুদ্ধে চলা তরবারি। এই গোষ্ঠীর ফেতনা যখন ব্যাপক আকার ধারণ করে, তখন তারা মানবতাকে এক অসহনীয় আযাবের মধ্যে ফেলে।

উদাহরণস্বরূপ সুদের কথা ধরা যাক; শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.র ভাষ্যমতে সুদ হচ্ছে (কোরআনে আসা) সর্বশেষ হারাম বিধান [27] এবং এটি এমন একটি গোনাহ যা দু‘পক্ষের সম্মতিতে সংঘটিত হয়। তাহলে যেসব নিষিদ্ধ কাজ কখনো কখনো এক পক্ষের সম্মতি ছাড়াই করা হচ্ছে ওগুলোর কী অবস্থা! (ওগুলোর কারণে সমাজে কী পরিমাণ বিপর্যয় আসবে!)

সুদের ক্ষেত্রে কঠিন শাস্তির কথা এসেছে। মুফাসসিরগণ বলেছেন, কোরআনে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আয়াত যে বিষয়ের উপর নাযিল হয়েছে তা হচ্ছে সুদ। আয়াতে মুমিনদেরকে সেই শাস্তির ধমকি দেয়া হয়েছে যা মূলত প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ .

হে মুমিনগণ! তোমরা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে সুদ খেও না এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার। এবং সেই আগুনকে ভয় করো, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। [সূরা আলে ইমরান : ১৩০-১৩১]

এ কারণে মুসলিম জনগোষ্ঠী যখন এই গুরুতর পাপে লিপ্ত হয় তখন তাদের ক্ষেত্রেও তরবারির বিধান এসেছে। আর এটিই তাদের জন্য রহমত। তরবারির এই বিধানের ব্যাপারে উম্মতের সমস্ত ওলামায়ে কেরাম একমত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমরা যদি প্রকৃত মুমিন হয়ে থাকো তবে সুদের যে বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও। এরপরও যদি তোমরা এটা না কর তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর তোমরা যদি (সুদ থেকে) তাওবা করো তবে তোমাদের মূল পুঁজি তোমরা পাবে। তোমরা কারও প্রতি জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না। [সূরা বাকারা : ২৭৮-২৭৯]

ওলামায়ে কেরাম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন যে, এই ধমকি কেবল তাদের জন্যই নয় যারা সুদকে হালাল মনে করে, বরং ওইসব লোকের জন্যও প্রযোজ্য যারা এ ধরণের লেনদেনে জড়িত (যদিও হালাল মনে করে না)। উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কোনো জনগোষ্ঠী সুদী কারবার করার ব্যাপারে একমত হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে।

উপরোক্ত তরবারির বিধানের সাথে যুক্ত আরও কিছু তরবারি হলো যেমন, মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে তরবারি বা মুরতাদ শাসিতগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তরবারি। অর্থাৎ যারা ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলাম ত্যাগ করেছে, ফলে অন্যান্য মুমিনদেরকে ফেতনাগ্রস্ত করছে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ও অন্যায়-অবিচারের প্রসার ঘটাচ্ছে।

এই প্রবন্ধ থেকে যেসব ধারণা ও উপলব্ধি নিয়ে আমরা বের হতে চাই সেসব ধারণা ও উপলব্ধিগুলোকে যে বিষয়গুলো আরও স্পষ্ট করে তন্মধ্যে একটি হলো, যতগুলো গোষ্ঠী মুসলমানদের জিহাদী কর্মকান্ডের বিরোধিতা করে, তাদের সকলেই বিশ্ব মানবতার উপর এমন হত্যাকান্ড, ধ্বংসযজ্ঞ ও বিপর্যয় চালিয়েছে যা সেসব হত্যাকান্ডের চেয়ে ঢের বেশি যেগুলোর কথা তারা মিথ্যামিথ্যিভাবে মুজাহিদীনের ব্যাপারে বলে থাকে। তারা বলে যে, এতসব ধ্বংসযজ্ঞ নাকি জিহাদী কর্মকান্ডেরই ফল। যেখানে বাস্তবতা হলো, এসবকিছু তাদের সন্ত্রাস ও কর্মকান্ডের ফল। বস্তুত, আল্লাহর শরিয়ত যে কোনো ধরণের ফাসাদ ও বিপর্যয় ঘটানো থেকে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।

[জিহাদী কর্মকান্ডের বিরোধী গোষ্ঠী]

জিহাদী কর্মকান্ডের বিরোধী গোষ্ঠী বলে আমার উদ্দেশ্য হলো- ইহুদি, খ্রিস্টান, মুরতাদ (জাতীয়তাবাদী, বাথবাদী এবং গণতন্ত্রপন্থী) গোষ্ঠী, তেমনিভাবে শান্তিপ্রিয় বিভ্রান্ত ইসলামী দলসমূহ। এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ,

[ইহুদি ও খ্রিস্টান]

ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের কথাই ধরুন। শুধুমাত্র বিংশ শতাব্দীতেই তারা নিজেদের মাঝে এবং মুসলিমদের ঘাড়ে যে পরিমাণ গনহত্যা চালিয়েছে, তা মানব ইতিহাসে আর দেখা যায়নি। এমনকি বর্বর, অসভ্য তাতার গোষ্ঠীও এতো রক্ত ঝরায়নি। তারা যমীনে কুফর, পাপাচার ও অশ্লীলতা ছড়ানোর জন্য মুসলমানদের প্রচুর সম্পদ এবং তাদের নিজেদের প্রচুর সম্পদ (যা মূলত আল্লাহর সম্পদ) নষ্ট করেছে। যেখানে বিশ্বজুড়ে অনাহারে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে, যাদের সংখ্যা এতই বেশি যে, যদি কোনো পুস্তকে এর পরিসংখ্যান দেখানো হতো তাহলে কোনো কোনো মানব বিবেক তা বিশ্বাসই করতে পারতো না।

[মুরতাদ গোষ্ঠী]

আর জাতীয়তাবাদী, বাথবাদী ও গণতন্ত্রপন্থী গোষ্ঠীর অবস্থা হলো, তারা মুসলিম উম্মাহর দ্বীন-ধর্ম তো নষ্ট করেছেই পাশাপাশি সাধারণ মানুষ এত বেশি হত্যা করেছে যে, তা শুনলে শরীর শিহরিয়ে উঠে। সাদ্দাম হোসেন, বাশার আল-আসাদ, মুবারক, ফাহাদ, ইয়েমেনের সমাজতান্ত্রিক দলসহ অন্যরা যে পরিমাণ প্রাণহানী ঘটিয়েছে তার সংখ্যা এ শতাব্দীতে মুজাহিদীনের লড়াইয়ে যত প্রাণহানী ঘটেছে তার চেয়ে অনেক বেশি। তাছাড়া আরও একটি পার্থক্য হলো, তারা এসব প্রাণহানী ঘটিয়েছে শয়তানের পথে এবং তারা উম্মাহ থেকে আল্লাহর আযাবকে প্রতিহত করতে পারেনি, সেই আযাব হতে পারে আমাদের এক পক্ষকে অপর পক্ষের উপর চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে বা অন্য কোনো উপায়ে। পক্ষান্তরে মুজাহিদরা যা কিছু করেছে সবই ছিলো হক্বের পথে, ইনসাফের পথে, আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যার্থে এবং এ উম্মাহকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে। সুতরাং আমাদের ভালোভাবে উপলব্ধি করা উচিত যে, যদি কোনো অঞ্চলে জিহাদের আমল প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে অবশ্যই সেখানে আল্লাহ তাআলা আযাব প্রেরণ করবেন বা সেখানে কুফরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে এতটাই ক্ষয়-ক্ষতি ও অনিষ্ট সাধিত হবে যে, জিহাদের ক্ষেত্রে যে ধরণের ক্ষয়-ক্ষতি ও অনিষ্টতার (?) কথা ভাবা হয় তা অতি নগন্য ও তুচ্ছ মনে হবে। হ্যাঁ, জিহাদ করতে গিয়ে যদি কিছু অনিষ্ট সাধিত হয়েও থাকে, তবে তা মূলত কিছু দুষ্কৃতকারীর কাজ। এর কারণে জিহাদের ফরয বিধান কোনোভাবেই কলুষিত হতে পারে না।

[শান্তিপ্রিয় বিভ্রান্ত ইসলামী দল]

আর শান্তিপ্রিয় ইসলামী দলগুলোর অবস্থা হলো, তারা নিজেরা তো জিহাদ ছেড়েছেই, পাশাপাশি উম্মাহকেও জিহাদ পরিত্যাগে উদ্বুদ্ধ করছে। ফলে তাদের এসব অপকর্ম উম্মাহর উপর আযাব আসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ বনেছে। এই আযাব হয়তো আমাদেরই এক

পক্ষকে অপর পক্ষের উপর লেলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে হচ্ছে, যেখানে দ্বীনের সহযোগিতা বলতে কিছু নেই, অথবা আল্লাহর দুশমনদেরকে আমাদের উপর আধিপত্য দেয়ার মাধ্যমে বা আমাদের উপর তাদের খবরদারির মাধ্যমে অথবা নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে, যা আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করেন। যেমন, ভূমিকম্প, সুনামি ইত্যাদি।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এসব শান্তিপ্রিয় ইসলামী আন্দোলনগুলো তাওহীদবাদী জিহাদপন্থীদের সাথে হাত মেলাতে শুধু যে নাক ছিটকায় তা-ই না, বরং অভিযান চালিয়ে তাদের মূলোৎপাটন করাকে তারা বৈধতাও দেয়। আর বাহানা হিসেবে দাঁড় করায় যে, মুসলিম উম্মাহর উপর নেমে আসা হত্যাযজ্ঞের মূল কারণ নাকি মুজাহিদরাই। যেখানে একই সময়ে রাজনৈতিক বিভিন্ন মোর্চা বা দলের সাথে হাত মেলাতে তাদের কোনো বাধা নেই। এমনকি খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের সাথে হাত মেলাতেও তাদের আপত্তি নেই, যাদের হাতে সংঘটিত হয়েছে অধিকাংশ ভয়ংকর ও নৃশংস গণহত্যা। অথচ তারা জানে যে, ক্রুসেডার কুলাঙ্গারেরা তাদের গৌরবময় (!) ইতিহাসে সেসব গণহত্যাকারীদেরকে জাতীয় বীর খেতাবে ভূষিত করেছে, চাই তারা কোনো গোষ্ঠী হোক বা কোনো রাষ্ট্র। তুমি সেসব ইসলামী আন্দোলনগুলোকে দেখবে, মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত যে কোনো গোষ্ঠীর সাথে ঐক্য গড়তে বা সহাবস্থান করতে বা সহাস্যে আলোচনার টেবিলে বসতে ও সাক্ষাত করতে তাদের কোনো আপত্তি নেই।[28] যেখানে একই সময়ে মুজাহিদীনের সাথে তাদের আচরণ সম্পূর্ণ উল্টো!! সুবহানাল্লাহ, এই তো আল্লাহর লীলাখেলা। কাউকে হেদায়েত দেন, আবার কাউকে গোমরাহ করেন।

বিশ্ব মানবতা আজ তীব্র থেকে তীব্রতর কুফর ও আল্লাহদ্রোহীতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। কেউ যদি শেষের দশকগুলোতে পশ্চিমা বিশ্বের পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করে, তাহলে স্পষ্ট দেখবে যে, কয়েক প্রজন্ম ধরে কুফর ও পাপের রাজ্যে তাদের কতটা অধঃপতন ঘটেছে। বরং তোমার মনে হবে যে, তা খুব দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। দিন দিন তাদের কুফরী তাদের সমাজের গভীর থেকে গভীরে শিকড় গেড়ে চলেছে।

অপরদিকে মুসলিম উম্মাহর অবস্থা হলো, বিভিন্ন কুফরী কর্মকান্ডে ও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে দিন দিন তাদের গোমরাহী তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। মানুষ আজ সুদী লেনদেন, অশ্লীলতা আর মানব রচিত আইনের কাছে ধরনা দিয়ে ধুকে ধুকে মরছে। এসবকিছুরই পরিণতি হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি। দুনিয়ার শাস্তি হলো, আল্লাহ তাআলা এমন (দুষ্ট) লোকদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিবেন যারা –দ্বীন কায়েম করার লক্ষ্যে জিহাদ সংঘটিত হলে- বিপুল পরিমাণ সাধারণ মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিবে। এসবই হচ্ছে (দুনিয়ার ক্ষেত্রে) আল্লাহ তাআলার চিরাচরিত নীতি, যা তিনি বান্দাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন।

[জিহাদের বিধান দিয়েছেন কয়েকটি উদ্দেশ্যে]

তাই বলা চলে, আল্লাহ তাআলা কয়েকটি উদ্দেশ্যে এ উম্মতের জন্য জিহাদের বিধান দিয়েছেন। এক. কাফেরদের শক্তিকে তিনি রুখে দিবেন। দুই. যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। তিন. যার ব্যাপারে হেদায়েত গ্রহণ করার যোগ্য বলে তিনি জানেন, তাকে স্বীয় রহমতের মাধ্যমে হেদায়েতের পথে ফিরিয়ে আনবেন। তাই এ সবগুলো বিষয়ের সমাধান ও চিকিৎসা হলো, দ্বীনের দাঈগণ কিতালের সকল গুণাগুণ রক্ষা করে এবং সকল গুণাগুণের সমন্বয় ঘটিয়ে কিতাল তথা যুদ্ধ করা। আর এর মাঝেই নিহিত রয়েছে বান্দাদের জন্য পূর্ণ রহমত, যেমনটা আমরা পূর্বেও বলেছি। এমনকি হাদীসে এসেছে, কিয়ামতের দিন কিছু মানুষ এমন হবে যাদেরকে শিকল দিয়ে টেনে জান্নাতের দিকে নেয়া হবে। সুতরাং কিতাল করতে গিয়ে যদি বাস্তবসম্মত শরঈ কোনো অপারগতা সামনে আসেও, আবশ্যকীয়ভাবে সেই অপারগতা দূর করতে হবে।

[একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর]

কেউ হয়তো বলবে যে, (জিহাদ করতে হবে তা বুঝলাম, কিন্তু) দাওয়াতের কি হবে? সৎকাজের আদেশ ও এর বিভিন্ন পর্যায়গুলো কোথায় যাবে?

উত্তরে আমি বলবো, প্রত্যেকটির জন্যই আলাদা আলাদা পর্যায় ও ধাপ রয়েছে। দাওয়ার আলাদা ধাপ রয়েছে, যারা (জিহাদ ছেড়ে) হাত গুটিয়ে বসে আছে তারা আজ পর্যন্ত দাওয়াতের সেই ধাপ বুঝেই উঠতে পারেনি। তেমনিভাবে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ - এগুলোরও আলাদা আলাদা ধাপ রয়েছে। (জিহাদ ছেড়ে) যারা হাত গুটিয়ে বসে আছে, তারা আজ পর্যন্ত তা বুঝেওনি, প্রতিষ্ঠিতও করতে পারেনি। আমরা পূর্বের বিস্তারিত গবেষণায় ও প্রবন্ধগুলোতে বিষয়গুলো জেনেছি।

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে দ্বীনের সারগর্ভ জ্ঞান, তাঁর বিধানাবলীর মহত্ত্ব ও বড়ত্ব বুঝার তাওফিক দান করেন এবং বিধানাবলীর সাথে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের যে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রয়েছে তা বুঝার তাওফিক দান করেন। পরিশেষে, সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য।

ষষ্ঠ প্রবন্ধ

পরিভাষার ফেতনা

কল্যাণ-অকল্যাণঃ পরিভাষার ফেতনার একটি নমুনা

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ البقرة: ٤٢

“তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রন করো না এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে গোপন করো না।” (সূরা বাক্বারাহঃ ৪২)

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহর উপর, তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবাগণ ও তাঁর অনুসারীগণের উপর।

অতঃপর, একথা অত্যুক্তি হবে না যদি বলি যে, শ্লোগান আর পরিভাষার ফিতনা এ যুগে জনসাধারণের উপর তো বটেই, এমনকি বিশেষভাবে মুসলিম যুবক শ্রেণির উপর প্রকট আকার ধারণ করেছে। বরঞ্চ যুগ যুগ ধরে অতীতের বিভিন্ন উম্মতের মাঝেও আমরা দেখি যে, লোকেরা হেদায়েতের পথ থেকে সটকে পড়লেও তখনই পড়তো যখন তাদের মনোবাসনা পূরণের নিশ্চয়তা দিয়ে এবং মস্তিষ্কে ঝেঁকে থাকা বিভিন্ন সংশয় ও কুবুদ্ধির সমর্থনে তাদেরকে চমকপ্রদ নানা শ্লোগান শোনানো হতো।

এদিকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতের অবস্থা হলো, ইসলামের প্রথম যুগ থেকে আমাদের সাথে সময়ের ব্যবধান যতই বাড়ছে ততই যেন এ ধরনের ফিতনা প্রকট হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দার ব্যাপারে মঙ্গল চান তখন তাকে এসব ফিতনা থেকে হেফাজত করেন এবং তাকে হেদায়েতের ঝান্ডাবাহী সেসকল ইমামগণের সান্নিধ্যে থাকার তৌফিক দান করেন যারা কিয়ামত পর্যন্ত ভ্রান্তবাদীদের অপব্যাখ্যা ও দ্বীন বিদ্বেষীদের বিকৃতি থেকে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। যারা সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের উত্তম অনুসারীদের বুঝ অনুযায়ী কোরআন-সুন্নাহ‘র ঝান্ডার নিচে দৃঢ়পদ ছিলেন।

কোরআন-সুন্নায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর সাথে শরঈ বিধান, জাগতিক বিধান দু‘টোরই সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং যখন কেউ এসব গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলোতে বিকৃতি ঘটায়, তখন স্বভাবতই শরঈ বিধানগুলো তার নিজস্ব রূপ হারিয়ে ফেলে। আর তখনই এমন ফিতনার উদ্ভব হয় যার

সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাতের উপর দাজ্জালের ফিতনার চেয়েও বেশি আশংকা প্রকাশ করেছেন।

এ প্রবন্ধে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমন দু’টি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো যে দু‘পদ্ধতিতে এই ফিতনা বেশিরভাগ হয়ে থাকে। আর ইন্টারনেটে প্রকাশিত দরস সমূহে শাইখ ওমর মাহমুদ আবু ওমর ইতোমধ্যেই এ দু‘টি পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন (আল্লাহ তাঁকে কারামুক্ত করুন)। তারপর দ্বিতীয় পদ্ধতি সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ পেশ করতে চেষ্টা করবো।

প্রথম পদ্ধতি: যুবকদের নেতৃত্বে যারা রয়েছে তাদের কেউ কেউ বাস্তব পরিস্থিতিকে শরঈ বিধানের মাধ্যমে ও শরিয়তের নির্ধারিত শব্দগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে মোকাবেলা না করে এমন এমন ভাষা ও শব্দ প্রয়োগের আশ্রয় নেয়, যেগুলোতে ব্যাপকতা থাকার দরুন একাধিক উদ্দেশ্য নেওয়ার সুযোগ থাকে। ঠিক আরব্য পোষাক ‘আবা’ (আলখেল্লা) এর মত; যা স্থূলদেহ, জীর্ণদেহ সব দেহেই সুন্দরভাবে ফিট হয়ে যায়। যখনই কোনো জটিলতা দেখা দেয় বা কোনো বিপদ সংঘটিত হয় কিংবা এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয় যা জিহাদ বা আন্দোলন গড়ে উঠার দাবি রাখে, তখন কেউ এসে যখন এসব মাশায়েখদের মধ্য হতে কারো কাছে কিছু জানতে চায়, তখনই তারা নিজেদের অজ্ঞতা বা কাপুরুষতা ঢাকতে, অথবা নিজেদের জবাবদিহিতা এড়াতে অথবা তারা যে অবস্থান গ্রহন করেছে এর বিপরীত কিছু প্রকাশ পেলে পুনরায় যেন কিছু বলার সুযোগ থাকে- এসব বিষয় মাথায় রেখে তখনই তারা দ্বিমুখী শব্দের প্রয়োগ শুরু করে দেয়। যেন লোকেরা এমন মনে করে যে, তিনি এমন ব্যক্তি যার ভুল হতে পারে না, তিনি গবেষক এবং ফতোয়া ও মশোয়ারার ক্ষেত্রে সর্বাধিক আস্থাভাজন। সুতরাং (এসব অসৎ উদ্দেশ্যে) তারা শরিয়তের এমন যে কোনো সুনির্দিষ্ট শব্দের প্রয়োগ থেকে পালিয়ে বেড়ায়, যা অবস্থানকে স্পষ্ট করে দিবে এবং কোনো আন্দোলন ও প্রত্যয়ের জন্ম দিবে, যেগুলো প্রয়োগ করলে তার নিজের জন্য এবং প্রশ্নকারীর জন্যও বিভিন্ন ফরজ বিধান আবশ্যক হয়ে পড়বে। এসব করার পর পরিস্থিতি কোনদিকে গড়ায় দূর থেকে তা পর্যবেক্ষণ করতে থাকে, এটা কি সেই জিহাদই যা ফল দেয়া শুরু করলো? তবে তো সে এ যুদ্ধের আগুন উস্কে দিয়েছে, আর এই অভিমত তো সে পূর্বেই দিয়ে রেখেছে।

পক্ষান্তরে যদি আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ী কোনো কারণে পরাজয় ঘটে, তবে জুব্বার নিচ থেকে ছড়ি বের করে জিহাদ করার কারণে মুসলিমদের উপর কষাঘাত করতে থাকে। মূলত এমন পরিস্থিতিতে সব ধরণের বিপদ ও দূর্ভোগের মূল হোতা কিন্তু ওরাই, যেখানে ওরাই কিনা উম্মাহকে গোমরাহী থেকে বাঁচানোর ত্রাণকর্তা!! পাশাপাশি এ বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে যে কোনো চিন্তাশীলই উপলব্ধি করবেন যে, এমন পরিস্থিতিতে মুসলমানদের পরাজয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বরং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, এসব মাশায়েখ বিবদমান জিহাদী পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত শরঈ বিধানগুলোকে হালকা করে দেখানোর পাশাপাশি জাতি ও যুবক শ্রেণিদের নিয়ে খেলা করছে এবং তাদেরকে দ্বিধান্বিত পরিস্থিতিতে ফেলে রেখেছে, বিশেষত সেসব যুবকদেরকে যারা তাদের উপর আস্থা রাখে। আর পরিস্থিতি এমন যে, কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ রাখে না। ফলে যুবকরা এটা জানে না যে, জিহাদ কি ফরজ বিধানগুলোর মধ্যে একটি ফরজ বিধান? নাকি এমন নানান উপকরণের মধ্যে একটি উপকরণ মাত্র, যার মধ্য হতে যে কোনোটি গ্রহণ করা যায়? তেমনিভাবে যুবকরা শত্রুপক্ষের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে লড়াইয়ের বিধানাবলী বিশদভাবে জানে না। মাশায়েখদের কাউকে দেখবেন, যদি শত্রু বাহিনী সম্পর্কে তাদেরকে প্রশ্ন করা হয় তারা উত্তরে বলে যে, ‘তারা অপরাধী’। যদি বলা হয় যে, আমরা আরও পরিস্কার, বিস্তারিত ও সুবিন্যস্ত সিদ্ধান্ত জানতে চাই যার উপর ভিত্তি করে একটি আন্দোলন ও প্রত্যয় গড়ে উঠবে এবং সুনির্দিষ্ট শরঈ বিধান পালন করা যাবে, তখন দেখবেন যে, তারা পলায়ন করছে এবং ‘তারা অপরাধী’ এ কথার চেয়ে আর বেশি কিছু বলতে চাচ্ছে না! পাঠক লক্ষ্য করুন, এ নিবন্ধে দরবারি আলেমদের কথা বলা হচ্ছে না।

সারকথা

[দ্বিমুখী শব্দ প্রয়োগের প্রবণতা ] এটা ওসব মাশায়েখদের শাস্ত্র যারা 'বড় বড় শ্লোগান শাস্ত্র ' রপ্ত করার পর এই শাস্ত্রকে রপ্ত করেছেন। অন্যথায় এসব মাশায়েখদের ওই আলোচনাগুলো কোথায়, যেখানে তারা জাতিসংঘ ও তার সনদ সম্পর্কে এবং এ সংস্থাটি আন্তর্জাতিকভাবে গড়ে উঠার বৈধতা সম্পর্কে আল্লাহর কী হুকুম , তা নিয়ে আলোচনা করেছেন? পাশাপাশি জাতীয়তাবাদ , ভৌগলিক সীমারেখা ও দেশাত্মবোধ সম্পর্কে আল্লাহর কী হুকুম , তা নিয়েও আলোচনা করেছেন? এ সকল বিষয় এবং আরও যেসব বিষয়ের আলোচনা থেকে তারা পলায়ন করে থাকেন ওগুলো সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিস্তারিত হুকুম আহকাম কী ? তেমনিভাবে এগুলোর কারণে যেসব সমস্যা তৈরি হয় সেগুলো প্রতিকারের জন্য আল্লাহ তাআলা কী বিধান দিয়েছেন ?

দ্বিতীয় যে পদ্ধতিতে পরিভাষার ফিতনা হয়ে থাকে তা হল - - ,

পরিভাষাসমূহকে ভুলভাবে , বিকৃত করে সীমাবদ্ধ করে ফেলা। যার ফলে এসব পারিভাষিক শব্দ থেকে বের হওয়া বিষয় ও বিধানগুলোতে বিকৃতি ঘটে। এখান থেকেই লোকদের মধ্যে ব্যাপক ফেতনা -ফাসাদ সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর উম্মাহ এমন অনর্থক বিষয়াদির মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে যা আল্লাহর দ্বীনের কোনই কাজে আসে না।

যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক ব্যবহৃত অনবদ্য শব্দগুলোর অর্থে বিকৃতি ঘটবে এবং এর ফলে শরয়ী আহকামকে তার যথার্থ রূপে বিশ্লেষণ করা না হবে [উদাহরণত 'ঈমান'- এই পরিভাষাটির কথাই ধরা যাক ], যদি ঈমান শব্দটির অর্থ নির্ধারণে মিশ্রন ঘটে ও ভুল হয় , তাহলে তার সঠিক মর্ম বুঝার ক্ষেত্রে এবং তার সাথে সম্পর্কিত বহু শরয়ী বিধান পালনের ক্ষেত্রে বিপর্যয় তৈরি হবে। তেমনিভাবে ঈমানের সঠিক বাস্তবায়ন ছাড়া প্রকৃতির স্বাভাবিক বিধানগুলোও সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হবে না।

এমনিভাবে পাঠকের উচিত 'কুফর' শব্দটি নিয়ে চিন্তা করা। এটা কি লজ্জাজনক নয় যে , কোনো একটি দল দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে যুবকদেরকে পরিচালিত করার পর যখন কোনো ফেতনা দেখা দিল , তখন দেখা গেল যে , ওই যুবকরা 'কুফর' শব্দের মর্মই বুঝতে পারছে না ?!

'জিহাদ ' পরিভাষাটিও এমনই। উম্মাহ একে অপরের বিরুদ্ধে তাগুতের পথে লড়াই করে এরই নাম দিবে 'জিহাদ '- এটা কি করে হতে পারে ? লোকেরা জিহাদের মত এমন একটি মহান ও সম্মানিত পরিভাষার পেছনে পেছনে ছুটবে , কিন্তু মৃত্যুবরণ করবে এমন পথে যা আল্লাহর পথ নয় - এটা কি করে হতে পারে ?

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে , আমাদের বর্তমান বাস্তব জীবনে এমন অনেক পরিভাষা রয়েছে যেগুলোকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে এবং ওই শব্দগুলো যে মর্মের উপর নাযিল হয়েছিল সে মর্ম নির্ধারণের ক্ষেত্রে –ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় - এমন এমন ভুল হচ্ছে যা বড় ধরণের বিপর্যয় ও বিরামহীন ফিতনার জন্ম দিচ্ছে। কখনো বা মর্ম নির্ধারণে বাড়াবাড়ি হচ্ছে , কখনো আবার ছাড়াছাড়ি। এ ধরণের পরিভাষার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যেমন , হারবী (সামরিক ), মাদানী (বেসামরিক ), জাহিলিয়্যাহ , তাগুত , অন্তর্বর্তীকাল , কল্যাণ - অকল্যাণ ইত্যাদি।

বরং 'ফিতনা' পরিভাষাটির সঠিক সংজ্ঞা না থাকায় সে নিজেই ফিতনায় পতিত হয়েছে !! সুতরাং বুঝার উপায় নেই , কোনটি ওই ফেতনা, যা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি ? আর কোনটি ওই ফিতনা, যার একদম মাঝখানে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শাহাদাতের মৃত্যু আলিঙ্গন করা জরুরি ? আর কোনটি ওই ফেতনা, যা থেকে গা বাঁচিয়ে থাকা বরং ফেতনা ?

এখানে এসে একটি পরিভাষার ব্যাপারে আমাদের সকলের একটু থামা উচিত , যে পরিভাষাটি উম্মাহর পরিবর্তনের যাত্রাপথে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে জড়িয়ে আছে এবং

উম্মাহ যেই অন্ধকার টানেলে প্রবেশ করেছে সেখান থেকে বের করে আনার বিষয়টিও যার সাথে জড়িত। আপনাদের জানা উচিত সে পরিভাষাটি হচ্ছে ‘মাসলাহা-মাফসাদাহ’ বা ‘কল্যাণ-অকল্যাণ’। বাস্তবতার সাথে এই পরিভাষাটি ফিট করার ক্ষেত্রে যে ধরণের হেরফের হয় তা বিশ্লেষণ করার লক্ষ্যে আমরা একটি বিষয় তুলে ধরবো। আর সেটি হচ্ছে ‘মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কল্যাণ-অকল্যাণ’। শেষ দুই শতকে আমাদের ভূমিগুলোর উপর হামলাকারী [আসলী] কুফফার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যেসব ইস্যু নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে এই ইস্যুটি তেমনই একটি চমৎকার বাস্তবসম্মত ইস্যু। এবং এই পরিভাষাটি প্রয়োগ করতে গিয়ে যে ধরণের তাহরীফ হয়েছে তা পরিভাষাটি না বুঝার কারণে এবং সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত না করার কারণে।

বিকৃতকারীরা প্রথমে একটি সুন্দর ও সঠিক ভূমিকা দিয়ে শুরু করে। আর তা হলো- ‘শরীয়তের বিধানাবলী এসেছে যাবতীয় কল্যাণ অর্জন করতে ও তা পরিপূর্ণতায় পৌঁছাতে এবং যাবতীয় অকল্যাণ দূর করতে ও হ্রাস করতে। আর মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নির্দেশটিও এর অন্তর্ভুক্ত’। এ পর্যন্ত তাদের কথা ঠিকই আছে। তবে এরপর তারা মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে জালিম শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদের সাথে তুলনা করে এগিয়েছে। এরপর তারা এমন বক্তব্য প্রদান করে যে, যদি আমরা এর স্বপক্ষে সালাফদের কারো বক্তব্য দেখানোর কথা বলে তাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্তও অপেক্ষা করি তারপরও তারা তা দেখাতে পারবে না। আর তাদের এ ভুলের ফলে ইসলামী অঙ্গনে ব্যাপক মতবিরোধ দেখা যায়। তারা যদি এ বিষয়ে সালাফদের আদর্শের উপর থাকতো তবে এ মতবিরোধ করার কোনই প্রয়োজন ছিল না। তারা তাওহীদ ও জিহাদপন্থীদের সামনেই মানুষকে জিহাদ বিমুখ করতে বিকৃতভাবে ‘কল্যাণ-অকল্যাণ’ এর শ্লোগান তুলে। সংক্ষিপ্তভাবে তাদের ভুলগুলোর বর্ণনা নিম্নরূপঃ

‘মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ’ এটি এমন একটি আত্মরক্ষামূলক জিহাদ যা (শরিয়ত কর্তৃক) নির্দেশিত। আর সেই শাসকের মোকাবেলায় যথেষ্ট জনশক্তি অর্জিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এর ফরজিয়্যাত উম্মাহ‘র প্রতিটি সদস্যের উপর থাকে। এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে হাজার আল-আসকালানী রহ. ইজমা পাওয়া যাওয়ার বিষয়টি তার এ বক্তব্যের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেনঃ

‘কুফরের কারণে ইমাম অপসারিত হবে- এটা সর্বসম্মত মত। সুতরাং এ ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলমানের পদক্ষেপ নেওয়া ওয়াজিব। সুতরাং অপসারণ করতে যে সক্ষম হবে সে সওয়াব লাভ করবে, আর যে অপারগ হবে তার হিজরত করতে হবে, আর যে এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে সে গুনাহগার হবে’।

বরং মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদের বিষয়টি প্রত্যেক সেসব আয়াত এবং হাদিসের ব্যাপকতার অন্তর্ভূক্ত যেসব আয়াত ও হাদিসে (সাধারণ) কুফফার ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে জালিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ‘নির্দেশ’ কোথাও আসেনি। [হ্যাঁ, কোরআন-সুন্নাহ‘র কিছু বক্তব্যের ব্যাপকতায় তার জুলুম প্রতিহত করার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত হয়।] এক্ষেত্রে মৌলিকভাবে যে নির্দেশনা পাওয়া যায় তা হলো, ধৈর্যধারণ করা এবং মুসলিম জালিম শাসকের ওই জুলুমকে প্রতিহত করতে না যাওয়া যেটা করতে গেলে আরও বড় জুলুমের শিকার হতে হবে। তাছাড়া নরমালভাবে জুলুম প্রতিহত করলে আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়াও সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং মুসলিম জালেম শাসকের জুলুম প্রতিহত করা সংক্রান্ত যেসব নীতিমালা ওলামায়ে কেরাম নির্ণয় করেছেন সেগুলোকে কাফের বা মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদের সাথে কিভাবে মিলানো যেতে পারে?

একজন প্রাথমিক পর্যায়ের ছোট তালিবে ইলমও এটা বুঝে যে, জিহাদের ময়দানে প্রাণহানী ঘটা এবং পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকা- এটা কখনোই এমন অকল্যাণ বা সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না যার কারণে জিহাদকে পরিত্যাগ করা যেতে পারে। যখন এ বিষয়টি আমরা বুঝবো, তখন আমরা ধরতে পারবো যে, শরিয়ত এক্ষেত্রে যেসব সমস্যা বিবেচনায়

নেয়নি সেসব সমস্যাকে বিবেচনায় নেওয়ার জন্য লোকেরা কি পরিমাণ প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে।! তারা এ বিষয়টিকে অন্য এমন বিষয়ের সাথে মিলিয়ে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে, যেখানে শরিয়ত এসব সমস্যাকে বিবেচনায় নিয়েছে। সুতরাং যে অকল্যাণ বা সমস্যা পাওয়া যাওয়ার পরও শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে কোনো বিধান প্রমাণিত হয়, বুঝতে হবে সে অকল্যাণ বা সমস্যা শরিয়ার কাছে গ্রহণযোগ্য বা বিবেচ্য নয়।

মুরতাদ সরকারগুলোর শাসনাধীন মুসলিম সমাজগুলো মানব রচিত আইনের অধীনে থেকে যে নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও স্বাচ্ছন্দময় জীবন লাভ করছে (!!) এ প্রসঙ্গে লোকেরা গুঞ্জন তোলে... (তারা বলে যে, যদি এসব শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয় তাহলে এসব সুবিধা বিঘ্নিত হবে)। তারা না বুঝার ভান করছে, অথচ বর্তমান পরিস্থিতিকে যদি সালাফদের মত করে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে আমি বলবো, নিরাপদ পরিস্থিতিতে (মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা) আমাদের উপর বেশি জরুরি ওই পরিস্থিতির চেয়ে যে পরিস্থিতি আমাদের উপর আগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে [আগ্রাসন চলাকালীন পরিস্থিতির সকল চাহিদা পূর্ণ করে] প্রতিরক্ষামূলক জিহাদকে ফরয করে দেয়। আগ্রাসন চলাকালীন পরিস্থিতির সকল চাহিদা পূর্ণ করা বলে উদ্দেশ্য হলো, ‘কোনক্রমেই আত্মসমর্পণ না করে আমৃত্যু আগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া’।[29] এর বিবরণ নিম্নরূপ,

কেউ কেউ নিজস্ব ধ্যান-ধারণার আলোকে মনে করে যে, আগ্রাসী শত্রু যেই মাত্র সদলবলে মুসলিম ভূখন্ডে আগমন করলো কেবল তখনই শুধু তার বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে। পক্ষান্তরে শত্রু যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং তার লক্ষ্য পূরণ হয়ে যায় তখন জনগণ যেই নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার মাঝে জীবন যাপন করছে তা বিনষ্ট করা এক প্রকার ফাসাদ বা অকল্যাণ!!

অথচ বাস্তবে এ স্থিতিশীলতা ধ্বংস করে দেয়াই হচ্ছে প্রকৃত কল্যাণ। কেননা কাফির বা মুরতাদ যদি যেকোনো রাষ্ট্রক্ষমতায় স্থায়ী ও স্থিতিশীল হয়ে যায় তবে কার্যত সে ওই অঞ্চলের মানুষকে বে-দ্বীন বানাতে শুরু করবে। এ প্রেক্ষিতে পাঠক বর্তমান চেচনিয়া এবং দু‘যুগ পূর্বের চেচনিয়ার প্রতি লক্ষ্য করতে পারেন, যেখানে মুসলিম সমাজ নিরাপদেই বসবাস করছিল, কিন্তু কাফির শাসক তাদেরকে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে ফেলে। পরিস্থিতি এ পর্যায়ে গিয়েছে যে, কেউ যদি কুরআন তেলাওয়াতের ইচ্ছা করতো তবে কেউ জেনে যাবে এই ভয়ে তাকে গোপন আন্ডারগ্রাউন্ড কক্ষে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন পড়তে হতো।

পাঠক! আলজেরিয়ায় মুজাহিদীনের প্রায় অর্ধশতাব্দীকালের অব্যাহত জিহাদের কথা ভেবে দেখুন এবং একটু চোখ বন্ধ করে জিহাদ ব্যতীত আলজেরিয়ার কথা একবার চিন্তা করুন এবং এর পাশেই তিউনিসিয়ার কথা ভেবে দেখুন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝতে চায় এবং কুফর ও কুফফারদের চরিত্র সম্পর্কে বুঝতে চায় তাদের জন্য এসবের মাঝেই প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

যখন কোন জাতি (জিহাদ না করার কারণে) তাদের ওপর আসা নানান বিপদ আপদকে (উল্টো) জিহাদ করার জন্য বাধা হিসেবে দাঁড় করায় তখনই এটা স্পষ্ট হয় যে, তারা আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে শাস্তির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছে, ফলে তারা বুঝতেই পারছে না যে, জিহাদ ছেড়ে তাদের এ বসে থাকাটাই হল এসব বিপদাপদের মূল কারণ। তাদের অবস্থা যেন এ কথা বলতে চায় যে, যখন কেউ জিহাদ থেকে বিরত থাকে এবং তার বসে থাকার কারণে আল্লাহর সাহায্য বিলম্বিত হয়ে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হয় এবং ওই ব্যক্তিসহ আরও অন্যান্য বসে থাকা লোকদের উপর বিপদ নেমে আসে- তখন মুজাহিদীনেরও উচিত জিহাদ বন্ধ করে যাদের কারণে আজ এ পরিস্থিতি তাদের সাথে বসে থাকা!!

(তাদের এই পরিস্থিতি দেখে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাদের বিবেক মূলত আল্লাহর আযাবে নিপতিত) কেননা জিহাদ পরিত্যাগকারী এই লোকদের উপর তো মূলত মুরতাদের

বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব ছিল। যেমনটা আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. স্পষ্ট করেছেন এবং তিনি এ ব্যাপারে 'ইজমা' উল্লেখ করেছেন। যেখানে মুসলিমদের সংখ্যা হলো লক্ষ লক্ষ এবং (অনুকুল পরিবেশে থাকার কারণে) বিজয়ের সম্ভাবনাও প্রবল, সেখানে (মুরতাদ সরকারের বিরুদ্ধে) জিহাদের ফরযিয়্যাত উঠে গিয়ে তা মুস্তাহাব পর্যায়ে কোনক্রমেই নেমে আসতে পারে না। সুতরাং (তাওহীদপন্থী জিহাদী ভাইদের সহযোগিতা না করে) জিহাদ ছেড়ে বসে থাকার ফলে যেসব সমস্যা জনসাধারণের উপর নেমে আসে সেগুলোর অজুহাত তুলে মুজাহিদীনকে জিহাদ পরিত্যাগে বাধ্য করার কথা কোনো বিবেকবান ব্যক্তি কি বলতে পারে?! এই স্বাচ্ছন্দময় অনুকূল পরিবেশে এসব লোকদেরকে কি 'অসহায়' (مستضعفين) বলা যেতে পারে, যেখানে শরঈ মানদন্ডে তাদের ব্যাপারে তা প্রমাণিত হয় না? যদি (ধরেও নেয়া হয় যে,) তারা অসহায় অক্ষম (مستضعفين), তবে তো জিহাদের ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে হিজরতের পথ বেছে নেয়ার বা কাফেরদের সাথে তাক্বিয়া তথা কৌশলগত মিথ্যা বলার অবকাশ তাদের জন্য রয়েছেই। আর তারা যদি হিজরতও না করতে পারে এবং তাক্বিয়ার মাধ্যমে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি থেকে নিজেদের আত্মরক্ষাও না করতে পারে, তবে তো যুদ্ধের তোপের মুখে নিহত হলে তারা শহীদ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং যে কোনো ধরণের কষ্টের শিকার হলে সওয়াব প্রাপ্ত হবেই।

সুতরাং (মুজাহিদীনের আক্রমণের ফলে) তাদের উপর আপতিত কষ্টের দায়ভার কোনক্রমেই জিহাদ ও মুজাহিদীনের উপর আসতে পারে না। হ্যাঁ, এর দায়ভার প্রথমত কাফের, মুরতাদ ও জালেমদের উপর আসবে। দ্বিতীয়ত, যারা মুজাহিদীনের সাথে যোগদান করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও বসে থাকার ফলে কষ্টের শিকার হয়েছে তারা এর দায় নিবে। এমনকি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. উল্লেখ করেছেন যে, মুজাহিদীনের সাথে যোগদানকারীদের চেয়ে জিহাদ থেকে পালিয়ে বেড়ানো লোকেরাই হত্যা, নির্যাতনের বেশি শিকার হয়।

আমরা আরও জোর দিয়ে বলতে চাই যে, এটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরণকাল থেকেই জিহাদের বৈশিষ্ট্য যে, যুদ্ধের সারি থেকে এমনকিছু সীমালঙ্ঘনকারীর উদ্ভব ঘটে যারা নিরপরাধ লোকদের রক্ত প্রবাহিত করে এবং এমন এমন ফিতনা ঘটিয়ে থাকে যা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই জানেন। কিন্তু এরপরও এগুলো এমন ক্ষয়ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হয় না যার কারণে জিহাদ বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

এমনিভাবে জিহাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, কিছু লোক যুদ্ধের সারি থেকেই পশ্চাদপসারন করবে। আর এটিও এমন ক্ষয়ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হয় না যার কারণে আমরা জিহাদ মুলতবি করবো।

একবার হযরত আবু বকর রাযি. এর কাছে ফুজাআহ নামক এক ব্যক্তি এসে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সরঞ্জামাদি ও জনবল চাইলো। আবু বকর রাযি. তাকে কিছু সরঞ্জাম দিলেন এবং লোকদের একটি গ্রুপের আমীর বানিয়ে দিলেন। কিন্তু দেখা গেল, সে তাদের নিয়ে দস্যুবৃত্তি শুরু করে দিল। মুসলিম-মুরতাদ নির্বিশেষে সকলকেই হত্যা করে তাদের ধন সম্পদ লুট করতে লাগলো। এমনকি সে এমনকিছু লোকদেরকেও হত্যা করলো যারা আবু বকর রাযি. কে বাইয়াত দেওয়ার জন্য এসেছিল। পরে আবু বকর রাযি. সেই ফুজাআকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেন। কই, কিতালের নামে এসব লুন্ঠনও তো আবু বকর রাযি. কে জিহাদ বন্ধ করতে অনুপ্রাণিত করেনি। বরং কেউ যদি এসব ঘটনাকে দলিল বানিয়ে জিহাদ থেকে ফিরে যায়, তাদের বিরুদ্ধেও জিহাদ করা ওয়াজিব।

হযরত আলী রাযি. এর খেলাফতকালে একদল খ্রিস্টান (ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায়) একথা বলে ইসলাম ত্যাগ করে যে, যে ধর্ম তার অনুসারীদেরকে রক্তপাত ঘটানো ও রাস্তাঘাটে ভীতিসঞ্চার করা থেকে বিরত রাখে না সে ধর্মের চেয়ে আমাদের পূর্বের ধর্মই ভালো। তারপর আলী রাযি. ইসলাম ত্যাগ করার কারণে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। (মোটকথা) আল্লাহ তাআলা কিছু লোকদের অন্তরকে এ উদ্দেশ্যে বক্র করে দেন যাতে করে তাদের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত মুমিনদেরকে রিযিক দান করতে পারেন। যদি আমরা দ্বীন বুঝে থাকি তবে এটিই হচ্ছে জীবনের বাস্তবতা।

আমাদের অবশ্যই জানা উচিৎ যে, জিহাদ ও প্রতিরোধ যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কিতাবুল্লাহর ভাষ্য এমনই এবং সাহাবায়ে কিরামও তাঁদের চারপাশে দুনিয়া ও তার প্রকৃতি এমনই বুঝেছেন। তাঁরা জানতেন যে, যদি কাফিরদেরকে এ ধরাতে স্থির হতে দেয়া হয়, তাহলে এমন বড় ফাসাদ ও বিপর্যয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে যার আশপাশে অন্যান্য যে কোনো ফাসাদকেই তুচ্ছ মনে হবে এবং এর ফলে দুনিয়া ও আখিরাতে এমন আযাব অবধারিত হয়ে যাবে যা বুঝতে পারলে সকলেই কামনা করবে - যত ঝড়ঝাপ্টা আসুক না কেন জিহাদের ঝান্ডাকেই বুলন্দ করতে হবে।

আল্লাহর কাছে কামনা করি, তিনি যেন তাওহীদবাদী মুজাহিদীনকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেন এবং মুশরিক ও ফাসাদকারী যে কোনো শক্তিকে নিবৃত্ত করেন। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।

৭ম প্রবন্ধ

সম্পদের মাধ্যমে মেরুকরণ

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ

অর্থ: নিশ্চয়ই এই কুরআন সর্বাধিক সঠিক পথ দেখায়। [সূরা বনি ইসরাঈল ১৭: ৯]

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ও তাঁর পরিবার পরিজন, তাঁর সাহাবা এবং যারা তাঁর অনুগত তাদের সবার প্রতি।

কাফেরদের যুদ্ধকে প্রতিহত করা এবং তাদের অনিষ্ট থেকে মুসলমাদেরকে রক্ষা করা শরিয়তের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। জিহাদি আন্দোলনগুলোর উচিৎ, এর জন্য বৈধ এমন সকল পন্থা অবলম্বন করা যার মাধ্যমে এ লক্ষ্যে পৌঁছা যাবে। আমরা যখন কাফেরদের যুদ্ধকে শুধুই প্রতিহত করার চেষ্টা না করে বরং তাদের রণশক্তি ও তাদের ক্ষমতাকে উল্টো মুসলমানদের উপকারে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবো তখনই শরিয়ার অনেক লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে এবং আমরা মুমিনদের জন্য -কাফেরদের যুদ্ধকে শুধুই প্রতিহত করার চেয়েও - বেশি উপকার বয়ে আনতে পারবো।

আমরা যদি নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করি, কাফের কিংবা মুরতাদ বাহিনীর সেনা কমান্ডাররা কিসের জন্য আল্লাহর শত্রুদের সাথে মিশে কাজ করে? তেমনিভাবে নেতৃস্থানীয় লোকেরা -যাদের ক্ষমতা ও শক্তিবলয় কিছু সমর্থকদের ঘিরে - তারা কিসের জন্য কুফফার ও মুরতাদ শাসন ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন দেয়? আমরা দেখব যে, সংক্ষেপে এর উত্তর হচ্ছে, তাদের কারও কারও আদর্শিক কারণ আছে, তবে অন্য কিছু কারণও আছে, যেগুলো মুরতাদ সরকারগুলোর প্রতি আনুগত্যের জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কুফফার সরকারগুলোর কাছে সম্পদ থাকার কারণে তারা তাদের জন্য প্রচুর অর্থ সম্পদ, আনন্দ ফূর্তি ও ভোগবিলাসের উপকরণ এবং লোভনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা করে। ফলে মানবাত্মার সহজাত চাহিদা তথা 'ঈমান' এর সামনে কুফরি মতাদর্শ দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও, অন্যান্য দিকগুলো -যা আমরা উল্লেখ করলাম - তাদেরকে পরকাল সম্পর্কে উদাসীন এবং দুনিয়ার (ক্ষণস্থায়ী) চাকচিক্য নিয়ে সন্তুষ্ট করে রাখে।

পূর্ববর্তী কিছু প্রবন্ধে আমি এ বিষয়গুলোর কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করেছি এবং দেখিয়েছি যে, নেতৃবৃন্দ কীভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের অনুসারীরা শত্রুকে সহায়তা করা বন্ধ করতে তাদেরকে কীভাবে চাপ দেয়। পাশাপাশি প্রচন্ড যুদ্ধের উত্তাপ তাদের অন্তরে দুপক্ষের সংঘাতটা আসলে কী জন্য, তা বুঝার জন্য প্রেরণা দিতে থাকে। এ বিষয়গুলোই এক সময় তাদেরকে হকপন্থীদের সাথে যোগ দিতে বাধ্য করে, যেন তারা কাফের

ও জালেমদের সারিতে মৃত্যবরণ করে দুনিয়া-আখেরাত দুটোই বরবাদ করার পরিবর্তে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করতে পারে কিংবা এটি কমপক্ষে তাদেরকে (পক্ষ ত্যাগ করে) পালিয়ে যেতে এবং যুদ্ধের ফলাফল দেখার অপেক্ষায় একটি নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য করে।

আমরা আরও দেখিয়েছি যে, শরিয়ার একটি নীতি হচ্ছে, শক্রকে চাপে ফেলার জন্য তার অর্থনীতিকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানানো। যেন তারা বুঝতে পারে যে, মুসলমানদের সাথে ক্রমাগত লড়াইয়ের ফলে চরম ভাবে তাদের জাগতিক স্বার্থহানি হবে। আর নিজেদের জাগতিক স্বার্থকে নিরাপদ রাখাই হল তাদের মূল লক্ষ্য, যাকে তারা ছলনাময় স্লোগান এবং মিথ্যা আদর্শের আড়ালে ঢেকে রাখে।

এই প্রবন্ধে আমি জনসাধারণকে হকপন্থীদের দিকে মেরুকরণ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব। আর তা হচ্ছে, অর্থের মাধ্যমে মেরুকরণ করা, যেন আমরা শত্রু পক্ষের লোকজন এবং যারা নিরপেক্ষ তাদেরকে আমাদের দিকে আকৃষ্ট করতে পারি। আমরা তাদেরকে জাগতিক কিছু জিনিস দেব যেন আমরা তাদের সমর্থন লাভ করতে পারি।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসহ এই পদ্ধতিটি নিম্নে উল্লেখ করছি,

শরিয়তের বিধানগুলো এসেছে সম্ভাব্য সর্বাধিক কল্যাণ বয়ে আনার জন্য এবং সম্ভাব্য সর্বাধিক ক্ষতি প্রতিহত করার জন্য। সুতরাং এসব বিধান সাধারণভাবে সকল কল্যাণ বয়ে আনে না, আবার সকল ক্ষতি প্রতিহতও করে না। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তাআলা এমন বিধান দিতে অক্ষম যা সকল কল্যাণ বয়ে আনবে এবং সকল ক্ষতিকে প্রতিহত করবে। বরং এটি খোদ মানুষের মধ্যে এবং এই পার্থিব জীবনের মধ্যে থাকা সৃষ্টিগত অসম্পূর্ণতার কারণে। তাছাড়া আল্লাহ তা’আলার হিকমাহ এবং তাঁর আসমা ও সিফাতের পূর্ণতার দাবিই এমন যে, এগুলো কিছু ক্ষতি ও অকল্যাণকে তাঁর সীমাহীন হিকমতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সাব্যস্ত করে, যেসব হিকমাহ অনাদিকাল থেকেই তাকদীরে চূড়ান্ত হয়ে আছে।

যেমনটি আমি আগেই বলেছি যে, কিছু লোক কেবল অর্থের জন্য বাতিলপন্থীদেরকে সমর্থন করে অথচ তারা জানে যে, কোনটি হক। দুনিয়ার ভালোবাসা ও (আখেরাতের উপর) দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়ার মানসিকতা তাদেরকে হকপন্থী মুমিনদের সাথে যুক্ত হতে দেয় না। আমরা যখন তাদেরকে তাদের পছন্দসই জিনিসটি দিব তখন তারা অবশ্যই হকপন্থীদেরকে সমর্থন করবে এবং তাদের অনুগত্যে আসতে রাজি হবে। এরপর তারা যখন হকপন্থীদের সাথে যুক্ত হয়ে তাদের সাথে উঠাবসা করবে, তাদের মাঝে বসবাস করবে, ঈমানের নূর, কারামত ও অলৌকিক ঘটনাগুলো নিজের চোখে দেখবে এবং ঈমানের সজীবতা তাদের অন্তরের সাথে মিশে যাবে তখন তাদের অন্তরগুলো অবশ্যই হক ও সত্যের কাছে অবনত হয়ে যাবে আর তখন তারা একমাত্র দ্বীনের জন্য কাজ করবে এবং নিজেকে দ্বীনের জন্য উত্সর্গ করে দেবে।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে এমন কোনো কল্যাণকর জিনিস নেই যার কথা আমাদেরকে বলে যাননি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সাহাবীগণ তাঁর দেখানো পথে চলেই গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন।

সম্পদের মাধ্যমে যাদের মনোরঞ্জন করা হবে দেখা যাবে তাদের বেশিরভাগই হবে অর্থনৈতিকভাবে পিষ্ট সাধারণ জনগণ ও সাধারণ সৈনিক। আর কিছু হবে সেনাবাহিনীর নিম্ন লেভেলের কর্মকর্তা। আমি বলবো, আমাদের কর্তব্য হবে সকল মুমিনদের পাশাপাশি বিশেষভাবে এসব লোকদের মাথায় এ কথা ঢুকিয়ে দেওয়া যে, আল্লাহর কাছে যে প্রতিদান রয়েছে তা (দুনিয়ার এ তুচ্ছ সম্পদ অপেক্ষা) বহুগুণে উত্তম এবং স্থায়ী। সুতরাং সবাইকে উপদেশ দেয়ার কাজটি যুদ্ধ পরিস্থিতিতেই করে যেতে হবে, যে পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে আপনা আপনিই লোকদের তরবিয়ত হতে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقٰىٓ إِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا .

বানিয়ে সেখানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং আমরা আমাদের অর্জিত শক্তি- সামর্থ দিয়ে -আল্লাহ না করুন- নতুন করে ধর্মত্যাগের ঘটনা ঘটলে তার প্রতিকার করার মত সক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছি।

আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং দ্বীন, দুনিয়া ও আখেরাতে সব ধরণের নিরাপত্তা কামনা করি।

তবে আমাদের (পূর্ব থেকে গড়া) শক্ত ঘাঁটি ও তরুণ মুজাহিদীনের সমন্বয়ে গঠিত হক্বের কাফেলাকে সম্পদের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়কে আকৃষ্ট করার হুকুম-আহকাম স্ববিস্তারে জানতে হবে। তন্মধ্যে কিছু বিধান হলো, (১) যে ব্যক্তি শুধু সম্পদের জন্য যুদ্ধ করবে আখেরাতে সে কোনও প্রতিদান পাবে না (২) আর যার মূল উদ্দেশ্য থাকবে আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করা তবে সাথে গনিমত লাভ করার নিয়তও থাকে কিন্তু সেটি দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে তার প্রতিদান কিছুটা কমে যাবে। (৩) যে ব্যক্তি (যুদ্ধের ময়দান থেকে) নিরাপদে ফিরে আসে এবং গনিমতও লাভ করে তাকে তার প্রতিদানের দুই তৃতীয়াংশ নগদ দিয়ে দেয়া হয় (৪) আর যে ব্যক্তির রক্ত ঝরলো অর্থাৎ যে শহীদ হয়ে যায় এবং সম্পদও ধ্বংস হয়ে যায় সে পূর্ণ প্রতিদান লাভ করে।

(মক্কা বিজয়ের পরপরই হুনাইনের যুদ্ধ হয়।) হুনাইনের যুদ্ধে আনসাররা নিজেদের প্রাপ্য গনিমত ছেড়ে দেন। মক্কা বিজয়ের পর যারা ইসলামে নতুন প্রবেশ করেছে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য তারা সেসব গনিমত ছেড়ে দেন।

হক্বের কাফেলাকে এ কথা ভালোভাবে বুঝতে হবে যে, পরবর্তীতে তাদের হাতে সম্পদ আসার সম্ভাবনা আছে, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের সন্তানাদি ও তাবেয়ীদের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল। তবে এ কথা ঠিক যে, সম্পদের ফেতনা অভাব অনটনের ফেতনার চেয়ে ভয়ংকর। তাছাড়া সম্পদ হাতে পেয়ে আমরা সাহাবায়ে কেরামের মতো দৃঢ় ও স্থির থাকতে পারবো সেই যোগ্যতা তো আমাদের নেই। যেমন হাদিসে এসেছে, আমি তোমাদের ব্যাপারে অভাব অনটনের আশংকা করি না। আমি আশংকা করি, দুনিয়া তোমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়া হবে (আর তোমরা দুনিয়ার পিছনে ছুটবে) পরিণামে দুনিয়া তোমাদেরকে ধবংস করে ছাড়বে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধবংস করে ছেড়েছে।

তাওহীদ ও জিহাদপন্থী ভাইদের মধ্যে যারা গভীর ইলমের অধিকারী তাদের জন্য সম্পদের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়কে আকৃষ্ট করা সংক্রান্ত শরিয়তের হুকুম আহকামকে স্ববিস্তারে বর্ণনা করা এবং এ সংক্রান্ত মূলনীতিগুলোকে একত্রিত করার এখনই সময়। তাদের উচিৎ, প্রথমে এ সংক্রান্ত হুকুম আহকামগুলোর মূলনীতি ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা ফিকহুল জিহাদ ও শরিয়া রাজনীতি বিষয়ক কিতাবাদি থেকে বের করা এবং সমসাময়িক পরিস্থিতির সাথে ওগুলোকে ফিট করা এবং শরিয়তের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন নতুন পরিস্থিতিতে ইজতিহাদ (গবেষণা) এর মাধ্যমে সমাধান বের করা।

বাস্তবে এর প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। ফিকহ শাস্ত্র প্রয়োগ করে (গবেষণার মাধ্যমে) এসব নতুন নতুন পরিস্থিতি থেকে আমরা উপকৃত হতে পারি। আমি বিশ্বাস করি, বর্তমান যুদ্ধের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর আলোকে আমাদের ফিকহকে বাস্তবায়ন করার সময় এসেছে।

উদাহরণস্বরূপ আমরা জানি যে, কোন বাহিনীর আমীর যুদ্ধে নিহত ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত গনিমত তার হত্যাকারীকে দিতে পারে। এখন শত্রুর পক্ষের নেতা, সাধারণ সৈনিক কিংবা তাদের রক্ষীদের কেউ যদি মুজাহিদদের সাথে যোগদান করে এবং যোগদানের পূর্বে তাদের কোন মন্ত্রী বা কোন কমান্ডারকে বা এ পর্যায়ের কাউকে হত্যা করে, তাহলে যাকে সে হত্যা করেছে তার থেকে প্রাপ্ত গনিমত অপেক্ষা তাকে আরও বেশি কিছু দেয়া কি মুজাহিদদের হাইকমান্ডের জন্য বৈধ হবে? যেমন ধরুন, তার গোটা সম্পদের এক দশমাংশ এ কথার ভিত্তিতে দেয়া হলো যে, মুসলমানরা যখন পুরো এলাকা দখল করবে তখন সে এটি পাবে।

অপরদিকে যেই কমান্ডার বা মন্ত্রীকে সে হত্যা করেছে তার অনিষ্ট থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য সম্ভাব্য সব কিছু সে করেছিল এবং হত্যা করার পর মুসলমানদের সাথে যোগদান করার জন্য সুরক্ষিত কোনো জায়গায় পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও সে নিজেই করেছিল।

আমি বলি, এটি একটি উদাহরণ মাত্র, এমন আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে।

এখন আমাদের মধ্যে যারা গভীর ইলমের অধিকারী তাঁদের কাছে আবেদন হল, তাঁরা যেন শরিয়তের আলোকে এ জাতীয় বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করেন (এবং এগুলোর সমাধান বের করেন) যেন ফিল্ড কমান্ডাররা পরিকল্পনা করা ও নীতিমালা প্রণয়ন করার সময় ওগুলোর কিছু কিছু প্রয়োগ করা শুরু করতে পারেন।

তেমনিভাবে তাওহীদ ও জিহাদপন্থী ভাইদের কাছে উত্থাপিত পূর্বের এক গবেষণায় আমি বলেছি যে, তাদের (কাজের) অন্যতম একটি লক্ষ্য হচ্ছে, মুসলমানদের সম্পদের পুনঃবণ্টন। এই কথাটির উদ্দেশ্য কী, তা ব্যাখ্যা করা এবং এর হুকুম আহকাম স্ববিস্তারে বর্ণনা করার এখনই সময়। কারণ, আমাদের যুদ্ধের সামনের পরিস্থিতির সাথে এর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ যখন আল্লাহর ইচ্ছায় একটি আংশিক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয়ত এই প্রবন্ধে জনসাধারণের অর্থ ব্যবহার করে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের অন্তরকে আকৃষ্ট করার বিষয়ে যে আলোচনা হল তার সাথেও এর সম্পর্ক রয়েছে।

অতএব আমাদের ভাইদের মধ্যে যারা গভীর ইলম রাখেন তাদের কর্তব্য, মুসলমানদের সম্পদ বন্টনের ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি কী হবে তা জনগণের সামনে প্রমাণসহ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা। প্রথমত, প্রত্যেক দেশেই এমন এমন (প্রাকৃতিক) সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে যা অন্যান্য দেশ থেকে ভিন্ন। বাস্তবতা হচ্ছে, যদি এসব সম্পদ চুরি ও লুটের শিকার না হতো, তাহলে আমাদের জাতি বিশ্বের অন্যতম ধনী জাতিতে পরিণত হতো। যাই হোক যখন মুসলমানদের সম্পদ ন্যায়সংগত ভাবে বন্টন করা হবে তখন কি (আমাদের অধীনে থাকা) সকল এলাকার সম্পদ সংগ্রহ করে সব এলাকার মুসলমানদের মাঝে বন্টন করা হবে, নাকি প্রতিটি এলাকার সম্পদ ওই এলাকায়ই বন্টন করা হবে?

এর সাথে সম্পর্কিত আরেকটি বিষয় হল, কোন এলাকা থেকে যে যাকাত উসূল করা হবে – আল্লাহর ইচ্ছায় যা অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে হবে এবং বিভিন্ন ধরণের সম্পদে ভরপূর থাকবে- ওই যাকাতগুলো কি দারিদ্র কবলিত অন্যান্য এলাকায় বন্টন করা যাবে?

দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের মধ্যে সম্পদ বন্টনের ধরণটা কেমন হবে, তাও স্পষ্ট করতে হবে। যে সব ব্যক্তি, উপজাতি, দল ও গোষ্ঠী (আমাদেরকে) আনুগত্য প্রদান করেছে, সহায়তা করেছে, আশ্রয় দিয়েছে এবং জান-মাল দিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে, তাদের কি ওই সব সাধারণ মুসলমানদের ওপর কিছুটা অগ্রাধিকার ও বিশেষত্ব থাকবে, যারা এসব করেনি, যারা শুধু জন্মগতভাবে মুসলমান। (না, সবার হুকুম একই থাকবে?)

সারকথা হল, এখানে অনেকগুলো সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর মাসআলা রয়েছে, যেগুলোর মূলনীতি এখনই গবেষণার মাধ্যমে বের করা উচিৎ, যেন এসব ব্যাপারে এমন কোনো ভুলের শিকার আমরা না হই যা আমাদেরকে বড় ধরণের ক্ষতির সম্মুখীন করবে এবং এমন ফিতনার দরজা খুলে দেবে, যা থেকে আমাদের বেঁচে থাকা জরুরি। কিংবা এসব ভুল কারো কারো মনে এমন সংশয় তৈরি করবে যা আমাদের জন্য দূর করা সম্ভব ছিল, যদি এক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক সহীহ ইজতিহাদের মাধ্যমে দলিল নির্ভর সুস্পষ্ট মূলনীতি থাকতো।

يَٰٓأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لِّمَن فِىٓ أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰٓ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِى قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*** *** ***

[1] (Sykes–Picot)

উসমানীয় সাম্রাজ্যের আরব প্রদেশগুলো ভবিষ্যত ব্রিটিশ ও ফরাসি নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবাধীন অঞ্চলে বিভক্ত হয়। ফরাসি পক্ষে কূটনৈতিক ফ্রাঙ্কোস জর্জ পিকট ও ব্রিটিশ পক্ষে স্যার মার্ক সাইকস এতে সমঝোতা করেন। সাইকস পিকট চুক্তিতে রাশিরার জারপন্থী সরকার কম গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ হিসেবে ছিল। পরবর্তীতে ১৯১৭ সালের অক্টোবরে রুশ বিপ্লবের পর বলশেভিকরা চুক্তিটি প্রকাশ করে। ফলে ব্রিটিশরা বিব্রত হয়। অন্যদিকে আরবরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং তা প্রকাশিত হওয়ায় তুর্কিরা আনন্দিত হয়। [অনুবাদক কর্তৃক নেট থেকে সংগৃহীত]

[2] USA- United States of America, (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) যাকে সংক্ষেপে United States বা US বলা হয়ে থাকে।

USSR- Union of Soviet Socialist Republics, সম্মিলিত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র।

[3] যাদের মতবাদ হলো, আমরা সবাই অনেকটা জড় পদার্থের মতই। সৃষ্টিকর্তা যেভাবে চাচ্ছেন সেভাবেই সব হচ্ছে, অতএব এখানে বান্দার কিছুই করার নেই। [অনুবাদক]

[4] একইরকম পরিকল্পনা করা হয়েছিল ৯/১১ এর ঘটনার পূর্বে আফগানিস্তানে তালিবান শাসনামলে, যদিও তার রূপটি ছিল একটু ভিন্ন। এই ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ছিল দীর্ঘ অবরোধ আরোপ করে দেশকে নিঃশেষ করে ফেলা। তারপর সুবিধাজনক সময়ে বিরোধীদের অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ করা এবং প্রতিবেশী দেশ থেকে জনবল পাঠিয়ে বিরোধীদের সাপোর্টের মাধ্যমে তালিবানকে উৎখাত করা।

[5] ‘মাকালাত বাইনা মানহাজাইন’ লেখক, শাইখ ওমর মাহমুদ আবু ওমর (আল্লাহ তাঁকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি করুন)

[6] ‘তিলকা উম্মাতু মুহাম্মাদ (সাঃ) ওয়ালান তামূত’ লেখক, শাইখ ওমর মাহমুদ আবু ওমর (আল্লাহ তাঁকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি করুন)

[7] শাইখ (আবু মুসআব আস-সূরী) ওমর আব্দুল হাকিম হাফি.র গবেষণাসমূহ দ্রষ্টব্য। [ দাওয়াতুল মুকাওয়ামা / The Global Resistance Call ]

[8] মরক্কো, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, আলজেরিয়া ও মৌরিতানিয়া। [অনুবাদক]

[9] ‘মাকালাত বাইনা মানহাজাইন’ শাইখ উমর মাহমুদ আবু উমর (আল্লাহ তাঁকে দ্রুত মুক্তি দান করেন)।

[10] সারকথা হল, এসব ক্রমবর্ধমান হামলার ফলে, বিশেষকরে সেপ্টেম্বরের হামলার ফলে আমেরিকার সামনে দুটি সঙ্কট তৈরি হয়েছে। এক. তাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। দুই. বিশ্বজুড়ে জিহাদী জাগরণ তৈরি হচ্ছে। [অনুবাদক]

[11] প্রথম ফাঁদ হলো, আফগানিস্তানে আক্রমণ। আর দ্বিতীয় ফাঁদ হলো, আক্রমণের পর পুরো দেশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুজাহিদীন ও সাধারণ জনগণের সাথে একটি দীর্ঘ যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়া। [অনুবাদক]

[12] নিজের ভাবমূর্তি রক্ষা করতে এবং ক্ষোভ প্রশমিত করতে গিয়ে যে ফাঁদে সে পা দিয়েছে। [অনুবাদক]

[13] আর সাধারণ মানুষকে মূলত এরাই বেশি বিভ্রান্ত করে। [অনুবাদক]

[14]১৪ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ.; যাদুল মাআদ।

[15] ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ.; আত তুরুকুল হুকমিয়্যাহ।

[16] আধুনিক যুগে শহরগুলোর সিস্টেম এমন যে এগুলোকে গোত্রীয় নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিয়ন্ত্রণ করে না। বরং বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনী সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করে এবং পল্লী ও মরু অঞ্চল ছেড়ে লোকেরা শহরমুখী হওয়ার মধ্য দিয়ে এবং নিজ এলাকা অনেকটা পরিত্যাগ করার মধ্য দিয়ে আধুনিক সভ্যতা সেসব সামাজিক ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত প্রায় করে চলেছে। বরং বর্তমান জাহেলী সরকারগুলো সেসব পল্লী ও মরু অঞ্চলগুলোর গোত্রপ্রীতি চূর্ণ করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, যাতে করে সেখানে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারে বা তাদের সেই গোত্রপ্রীতিকে কাজে লাগিয়ে তারা তাদের জাহেলী টার্গেট উদ্ধার করতে পারে। এরপরও অনেক পল্লী ও মরু অঞ্চল এবং কিছু কিছু শহর অঞ্চল যেখানে ব্যাপক জনসমাবেশ রয়েছে সেখানে তারা তাদের ঐতিহ্য (গোত্রীয় বন্ধন বা গোত্রপ্রীতি) কিঞ্চিত হলেও ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

[17] মাকালাগুলো শায়খ ওমর মাহমূদ আবু ওমর কর্তৃক রচিত। [আল্লাহ তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করুন।]

[18] বর্তমান সময়ে আমি এমন কোনো আলেমের কথা জানি না যিনি ‘তরবিয়ত’ বিষয়ে শায়খ মুহাম্মদ আমীন মিসরী রহ. এর মতো এত গবেষণা ও দক্ষতা অর্জন করেছেন। তিনি ১৯১৪ইং সনে দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৭ইং মোতাবেক ১৩৯৭ হিজরীতে সুইজারল্যান্ডে একটি অপারেশনের পর মৃত্যুবরণ করেন। পরে তাঁর দেহ মক্কায় নিয়ে আসা হয় এবং সেখানেই দাফন করা হয়। আল্লাহ তাঁকে রহমতের চাদরে আবৃত করুন এবং উত্তম প্রতিদান দান করুন।

[19] এটি মিশরের তৎকালিন একটি জিহাদী সংগঠনের নাম। [অনুবাদক]

[20] ‘আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ’ গ্রন্থে এখানে ‘মুসলিম নারীদের’ পরিবর্তে ‘উম্মাহাতুল মু‘মিনীনের’ কথা এসেছে। [অনুবাদক]

[21] ওদের ইসলাম হল সুন্নি ও সুফি ইজমের মিশ্রণ। [অনুবাদক]

[22] বিপরীতগামীতা দু‘ভাবে হতে পারে। এক। রিদ্দাহ তথা ইসলাম ত্যাগের মাধ্যমে। দুই। সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে। সীমালঙ্ঘন এতটাই যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

[23] এটি শায়খদের একজনের বক্তব্য, যা আমরা তাঁর অনুসারীদের বিপক্ষে দলিল হিসাবে পেশ করছি।

[24] আমেরিকা ও তার জোট কর্তৃক ইরাক আগ্রাসনের পূর্বাপর তাদের সৈন্যদের শারীরিক-মাসনিক অবস্থার উপর তৈরিকৃত বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট তাদেরই পত্রপত্রিকা থেকে সংগৃহীত। তারা এমন রিপোর্ট করেছে যে, কতক সৈন্যরা মুর্ছা যাচ্ছে এবং মানসিক রোগে ভুগছে।

[25] আইরিশ রেড আর্মি নামে আসলে কোন সংগঠন নেই। এই লোক – যার কথা এই প্রবন্ধের শুরুতে উল্লেখ করেছি, যিনি নিজেকে এবং তার সমর্থকরাও তাকে মিশরের সালাফী সংস্কারের একজন ইতিহাসবেত্তা হিসেবে মনে করে থাকেন -সম্ভবত তিনি ‘আইরিশ রেড আর্মি’ বলে 'আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি' বোঝাতে চেয়েছেন!

[26] আরও বিস্তারিত জানতে হলে শাইখ ওমর মাহমুদ আবু ওমর (আল্লাহ তাআলা তাঁকে দ্রুত মুক্তি দান করুন) এর লেখা ‘মাকালাত বাইনাল মানহাজাইন’ বা ‘আর্টিকেলস বিটুইন টু মেথডস’ এর ৮৭ ও ৯৭ নম্বর প্রবন্ধ দুটি পড়তে পারেন। আমি আমার এই প্রবন্ধে আলোচিত বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য ওই প্রবন্ধ দুটি থেকে অনেক কথা এনেছি।

[27] সম্ভবত এর মাধ্যমে এটা বুঝানো হয়েছে যে, ইসলামী সমাজে এই বিধানটি গুরুত্ব বিবেচনায় সবার পরে এসেছে। এর বাইরে অন্যান্য নিষিদ্ধ বিধানগুলো আরো আগে এসেছে। সুতরাং সবার পরে আসা বিধানটা দু‘পক্ষের সম্মতিতে হওয়ার পরও মুসলিম সমাজের জন্য এতটাই ভয়ানক যে আল্লাহ তাআলা এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন, তাহলে অন্যান্য গুনাহ যেগুলো ইসলামী সমাজ গঠনে এসেছেও আগে, আবার সংঘটিত হচ্ছেও কোনো এক পক্ষের সম্মতি ছাড়াই, সেগুলোর কারণে সমাজের বিপর্যয় কী পরিমাণ হবে। (অনুবাদক)

[28] গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের শুরুতে যখন মিশরে জিহাদের আগুন জ্বলে উঠে, তখন মুসলিম ব্রাদারহুড- মিসরের খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় গোষ্ঠী ‘অর্থোডক্স’ এর প্রধান ‘শেনুদা’র সাথে হাত মিলায়। শেনুদা ইতিপূর্বে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্পষ্ট ভাষায় গালিগালাজ করে অডিও বার্তা তৈরি করেছিল এবং তা খ্রিস্টানদের মধ্যে বিতরণও করেছিল। আর সত্তরের দশকে তার ব্যাপারে এটা প্রমাণিত যে, ‘আল-যাবিয়াতুল হামরা’ ও তদপরবর্তী ঘটনায় যে ধরণের চক্রান্ত হয়েছিল সেখানে ওগুলোর পরিচালনা সে-ই করছিল এবং অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করছিল। মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ঘটার আগে শেনুদা পত্রপত্রিকায় ইসলামকে নিয়ে কটাক্ষ করেছিল। যেখানে সে ইসলামের কিছু কিছু বিধান নিয়ে বিদ্রুপ করেছিল। যেমন, কাফের রাষ্ট্রনায়ক না হতে পারার বিষয়টি নিয়ে সে সমালোচনা করেছিল। যেহেতু সে ইসলামের উক্ত বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে, তাই সে বলেছিল যে, মিসরে শরিয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। কারণ এর ফলে খ্রিস্টানরা মিসরে দ্বিতীয় সারির নাগরিকে পরিণত হবে। আমি বলি, মুসলিম ব্রাদারহুড এই ক্রিমিনালের সাথে হাত মিলিয়েছিল সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপনের জন্য। তারা যখন শেনুদার সাথে সাক্ষাৎ করতে যায় তখন প্রথম সাক্ষাতেই শেনুদা বলেছিল, সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত লোকগুলো কি মিশরের নীল নদের পানি পান করেনি? তারা কি এই ভূমিতে লালিত পালিত হয়নি?

জবাবে তারা বলেছিল, না! সন্ত্রাসীরা এই ভূমির সন্তান নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। মুসলিম ব্রাদারহুডের এক প্রবীন নেতা ‘হাসান দূহ’ তার এক প্রবন্ধে গর্বের সাথে এই সাক্ষাতকার প্রকাশ করেছিল। তারা ভুলে গিয়েছিল যে, নীলনদ সহ এ ভূখন্ডের আরও যত নিয়ামত নিয়ে তারা গর্ব করে এ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র ‘আল্লাহ তাআলা’ !! এই হচ্ছে ওদের তাওহীদের অবস্থা। খ্রিস্টানদের কুফর আর গাইরুল্লাহর উপাসনার বিষয়গুলো না হয় আলোচনায় নাই আনলাম। আল্লাহর কাছে দু’আ করি, আল্লাহ যেন এদের ওপর যথাযোগ্য শাস্তি নাযিল করেন।

[29] এখানে সম্ভবত উদ্দেশ্য হলো, নিরাপদ পরিস্থিতিতে মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করা ঐ পরিস্থিতির চেয়ে বেশি সহজ যখন বহিরাগত কুফরী শক্তি আগ্রাসন চালানোর ফলে পরিস্থিতি আরও বেসামাল ও অনিরাপদ হয়ে পড়ে। [অনুবাদক]